শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

গোলাঘর

৪র্থ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২

প্রকাশকাল
০১.০৬.২০১৩

সম্পাদক
শরমিন নিশাত
শওকত হোসেন

যোগাযোগ
৩৬২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৫, ৪র্থ তলা, ডানপাশ,
ইস্টার্নপ্লাজা মার্কেটের পেছনে মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭,
ই-মেইল: golaghor@yahoo.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
কাইয়ুম চৌধুরী

পত্রিকার নামলিপি
শরমিন নিশাত

প্রচ্ছদ অংকন
রুবাবা হোসেন নদী

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৩ $ ডলার

শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে সাধারণ মানুষের ঢল কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠিবিশেষের চেষ্টার ফল ছিল না। একজন কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ শাস্তির রায় ট্রাইব্যুনাল থেকে না-আসায়, সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে এই মঞ্চের জন্ম দিয়েছিল। প্রশ্ন এসে যায়, প্রমাণিত যুদ্ধাপরাধীর ক্ষেত্রে কেন সর্বোচ্চ শাস্তির রায় দেয়া সম্ভব হল না? কিংবা বাদী বা রাষ্ট্র-পক্ষের আপিলের সুযোগ না-রেখে ট্রাইব্যুনালের আইন তৈরি হল কেন? তাহলে কি এ-কাজ দুটো করার নেপথ্যে সরকারই সচেতনভাবে থেকেছে? যদি তাই হয়, তাহলে বুঝতে বাকি থাকে না যে, 'গণজাগরণ মঞ্চ' সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সরকারের প্রত্যক্ষ না-হোক, পরোক্ষ হাত অবশ্যই ছিল।

সাধারণ মানুষ যে শাহবাগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুঁসে উঠেছিল তাতে সরকারের ফাঁদ পাতা ছিল; জনগণ সেই ফাঁদে পা দিলেও এই আন্দোলনে সাধারণের পক্ষে অন্তত দুটি বিজয় অর্জিত হয়েছে: ১. কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ সাজার রায় এবং ২. বাদী বা রাষ্ট্র-পক্ষের আপিলের সুযোগ সৃষ্টি। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে সরকার ফাঁদ পেতেছিল তাতে সরকার শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। বরং মানুষের স্বাভাবিক ঢলকে যখন সরকার তথা আওয়ামী লীগ ও তার সমমনা দলগুলো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইল, তখন সেই ঢল কিন্তু শাহবাগে আর দাঁড়ায়নি।

বিএনপি-জামায়াতও কিন্তু গণজাগরণ-কে আওয়ামী লীগ ও তার সমমনা দলগুলোর বিশেষ হাতিয়ার মনে করে ভুল করে বসল; 'গণজাগরণ মঞ্চ'র বিরুদ্ধে নাস্তিক্যবাদের অভিযোগ এনে দেশের মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের একটি বড় অংশকে লেলিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হল। 'নাস্তিক্যবাদ'-এর অভিযোগ একটি পুরনো অস্ত্র, যা ব্যবহার করে বিএনপি-জামায়াত সফল হয়েছে বলে কেউ-কেউ মনে করলেও, আসলে সেটা মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের কোনো অবদানের কারণে ঘটেনি। সেটা ঘটছে আওয়ামী লীগের বেশ কিছু বড়-বড় ব্যর্থতার কারণে। দেশের সাধারণ মানুষ যে-কোনোভাবেই হোক যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি চায়; সেই শাস্তির নামে নতুন কোনো ভোগান্তি তাদের জীবনে নেমে আসুক সেটা তারা চায় না। আসলে একদিকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-কার্য বানচাল করতে জামায়াত সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে; অন্যদিকে নির্বাচনপূর্ব মহড়ার অংশ হিসেবেই আওয়ামী লীগ ও তাদের সমমনা দলগুলো 'গণজাগরণ মঞ্চ'-কে এবং বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলো 'মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের' ব্যবহার করে দলীয় ফায়দা লুটবার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রচলিত দলগুলোর এই যে পাল্টাপাল্টি বিরোধের সংস্কৃতি– এটা কোনো নতুন বিষয় নয়; ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব, "ইংরেজ যেদিন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল,–সেদিন মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে গেলে কংগ্রেস যায় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আর হিন্দু যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে যায় তবে মুসলিম লীগ সেদিন

কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে ছাড়ে না"। অখণ্ড ভারতের মতো অন্তর্দ্বন্দ্ব বিরাজমান বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতেও। তারই ফলে 'গণজাগরণ মঞ্চ'র মতো বিষয়কে বিএনপি সমর্থন দিল না এবং সেটা মূলত আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিরোধকে জারি রাখার প্রয়োজনেই। আবার আওয়ামী লীগ যখন বিএনপির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সংকটে পড়ে তখন পশ্চাৎপদ-ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গেও জোট বাঁধতে দ্বিধা করে না। অথচ জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে দুটি প্রধান দল সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী দেশগুলোর লেজুরবৃত্তিতে কেউ কারও থেকে এতটুকু পিছিয়ে নেই।

ইংরেজসহ আজ আরও অনেকের নিতান্ত হাতের পুতুল আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো দেশের মানুষের আস্থার জায়গা হারাচ্ছে চরমভাবে। আস্থা যে-টুকু এখনো আছে সেটা শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চে আসা ওই 'সাধারণ'-এর ওপর।

শাহবাগ ছেড়ে ওই সাধারণরা বাড়িতে ফিরে গেছে মাত্র কিন্তু বিলীন হয়েছে ভাবা সঠিক নয়। ভবিষ্যতের অন্য কোনো 'বড় প্রয়োজন' অপেক্ষা করছে এদেরই জন্য!

যা হোক; মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকলেও তারা যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যবস্থা না-করে অপরাধীদের হেফাযত করারই চেষ্টা চালিয়েছে। সেই জায়গায় আওয়ামী লীগ ও তার সমমনা দলগুলোর নেতৃত্বাধীন সরকার আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করে, নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকেই বাস্তব রূপ দিচ্ছে; যে-কাজটি সম্পন্ন করা মোটেও সহজ নয়। সেক্ষেত্রে 'গণজাগরণ মঞ্চ' ও 'মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের' মুখোমুখি দাঁড় করানোর কার্যকারণ সকলের কাছেই অত্যন্ত পরিষ্কার।

আমাদের সমস্যা অনেক, কিন্তু সব সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধাপরাধের বিচারকে এক করে দেখে বিচারের এই প্রক্রিয়াকে যাতে আমরা ব্যাহত না-করি সেদিকে সতর্ক হওয়া আমাদের কর্তব্য।

শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত
০১.০৬.২০১৩

সূচি

স্মরণ
ছবি: বিনোদবিহারী চৌধুরী ০৭

ব্যক্তিত্ব / প্রবন্ধ
ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে বিনোদবিহারী
অলকা নন্দিতা ০৯

বিজ্ঞান / প্রবন্ধ
মাতৃভাষা ও বিজ্ঞানচর্চা
জামাল নজরুল ইসলাম ২৪

অন্য ভাষার সাহিত্য/ প্রবন্ধ
ফ্রানৎস কাফকা: ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য
মাসরুর আরেফিন ৩৭

নাটক / প্রবন্ধ
এঁরাই সত্যিকারের ‘ধার্মিক’
হামীম কামরুল হক ৬২

কবিতা
নব্বইয়ের ২১ কবির ২১টি কবিতা ৬৮

কবিতা আলোচনা
নব্বইয়ের ২১ কবির ২১টি কবিতা প্রসঙ্গে ৯৫

দর্শন / প্রবন্ধ
বিশ শতকের দর্শন: মঈন চৌধুরীর ভাবনায়
শওকত হোসেন ১১০

গল্প
ছায়া ও কায়ার মায়া-বিস্তার
অপূর্ব সাহা ১৩০

এই সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পের পাঠ-প্রতিক্রিয়া
গল্প পাঠের অনুভূতি
জাকির তালুকদার ১৩৯

শিল্প/প্রবন্ধ
ভারতীয় শিল্পাদর্শ
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৪০

মুসলমান/প্রবন্ধ
বাংলার মুসলমানগণের মাতৃভাষা
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৪৬

বই/আলোচনা
সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার ১৫৭

ভিন্ন ভাষার কবি ও কবিতা/নিবন্ধ
নিজার ক্বাব্বানি'র কবিতা: সংবেদন ও মননের দ্বন্দ্ব
রথো রাফি ১৬০

প্রবন্ধ/অর্থনীতি
চার দশকের অর্থনীতি
আতিউর রহমান ১৭৪

কবিতা
নব্বই-এর ২১ কবির ২১টি কবিতা ১৯৬

(স্ম র ণ)

বিনোদবিহারী চৌধুরী

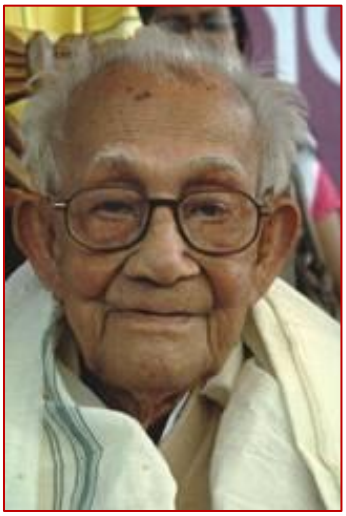

১৯১১ -২০১৩

ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে বিনোদবিহারী

অলকা নন্দিতা

১৯২১-২২ সালে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরীর বয়স দশ কি এগারো। তখন মহাত্মা গঠডন্ধও প্রথম অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাঁর বাবা সেই আন্দোলনে তখন জড়িয়ে পড়েন। পিতৃসঙ্গ এবং সেইসূত্রে অন্য মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগ ধীরে ধীরে বিনোদবিহারীর মধ্যে একটি নবতর চেতনার জন্ম দিতে থাকে। এই চেতনাকে তিনি ধারণ করতে শুরু করেন। মূলত বাবার কাছেই তাঁর বিপ্লবী শিক্ষার হাতেখড়ি।

স্কুলে বিনোদবিহারীর চেয়ে উপরের ক্লাসের ছাত্র রামকৃষ্ণ'র সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে তার সহযোগিতায় মনীষীদের জীবনী পড়তে শুরু করে বিনোদ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় জ্যোতিন্দ্রমোহন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের জীবনী। রামকৃষ্ণ একদিন দিল ক্ষুদিরাম–যে-ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল। তারপর দিল আলীগড় ষড়যন্ত্র মামলার উপর বই, শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী*, *হিতবাণী* পত্রিকার সম্পাদক সখারাম গণেশ দেউসকরের লেখা *দেশের কথা*।

ব্রিটিশ সরকার যে শোষণ অত্যাচার-অনাচার করছে তার বিস্তারিত বিবরণ ছিল *দেশের কথা* বইটিতে। এসব বই পড়ে তাঁর চক্ষু একেবারে খুলে গেল। একদিন রামকৃষ্ণ বিনোদ-বিহারীকে বিপ্লবী দলে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তাব দিল। প্রস্তাবটি তাঁকে উজ্জীবিত করে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ কাজ ছিল না। বিহারীর মনে হল অথর্ব হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বীরের মতো মরা অনেক ভালো। প্রস্তাবে তিনি সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। এটা ১৯২৭ সালের কথা। চারুচন্দ্র দস্তিদার, মধুসূদন দত্ত–যাঁরা তাঁর চাইতে বয়সে অনেক বড়–তাঁদের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসও ছিল এই বিপ্লবী দলের একজন সদস্য। তার কাজ ছিল বিপ্লবের জন্য ভালো ভালো ছেলে রিক্রুট করা। পরবর্তী সময়ে মাস্টারদা সূর্যসেন চাঁদপুরের আইজিপিকে মারার জন্য রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে পাঠিয়েছেলেন। রামকৃষ্ণ

ভুলক্রমে ইন্সপেক্টর জেনারেলকে না মেরে তাঁর দেহরক্ষীকে গুলি করে মারে। সে-ও একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। ওই ঘটনায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয় ১৯৩১ সালে।

মাস্টারদা সুর্যসেনের সঙ্গে

বিনোদবিহারী যখন বিপ্লবী দলে যোগ দেন, মাস্টারদা সূর্যসেন ছিলেন তখন জেলে। ১৯২৪ সালে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন মাস্টারদা। তাঁর সঙ্গে দেখা করা তখন খুব কষ্টকর ছিল। তিনি তখন শুধু নির্বাচিত কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করতেন। তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসার দু'মাস পর একবার দেখা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন বিনোদবিহারী। কিন্তু কোনো একটা কারণে তিনি এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। এই কারণে তাঁর মধ্যে আফসোসের অন্ত ছিল না। কিন্তু হাল ছাড়িনি। অপেক্ষার যন্ত্রণা শেষ হল ১৯২৯ সালে। একদিন বিনোদের এক বিপ্লবী বন্ধু এসে বলল তাঁকে রাত ৮ টায় অভয়মিত্র শ্মশানঘাটে যেতে হবে। সেখানে মাস্টারদা সূর্যসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। মাস্টারদার সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই তাঁর সমস্ত শরীর বারবার শিহরিত হচ্ছিল। সেদিন ছিল শনিবার। অমাবশ্যার রাত। পথঘাট অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাত ৮ টায় ফিরিঙ্গি বাজারের অলিতে গলিতে মানুষের আনাগোনা এমনিতেই কমে আসে। তার মধ্যে দিনের বেলায়ও মানুষ অভয়মিত্র শ্মশানঘাটে যেতে ভয় পায়। মানুষের কাছে এটি ভীতসঙ্কুল জায়গা হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বিনোদকে যেতেই হবে। মাস্টারদার আদেশ অমান্য করার মতো দুঃসাহস তাঁর নেই। তাছাড়া মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করা–তাঁর কাছে ছিল পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

নির্ধারিত সময়ের আগেই বিনোদ সেখানে পৌঁছলেন। শ্মশানে ভূতপ্রেতের কথা শুনে শুনে তাঁর মধ্যে আজন্মলালিত যে সংস্কার ছিল তা যেন দানা বাঁধতে শুরু করল। "তবু সাহস করে আমি এদিক-ওদিক হাঁটছি আর ভাবছি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি একজন ভদ্রলোক। কিছুটা বেঁটে, সাদা ধুতির ওপর সাদা পাঞ্জাবি অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছিল। আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলাম। ইনিই তাহলে সেই বিখ্যাত মানুষ বিপ্লবী সূর্যসেন।

এটাই তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, কিরে, ভয় পেয়েছিস? মাথা নেড়ে নীরবে সম্মতি জানালাম। কারণ সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম।

তিনি আমার কাছে বিপ্লবী দলে যোগদানের কারণ জানতে চাইলেন এবং আমি যাতে এই পথে না আসি সে ব্যাপারে বোঝাতে লাগলেন। অর্থাৎ আমাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন। আমি বিপ্লবী দলে কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। তাই মাস্টারদাকে বললাম, এদেশের একজন সচেতন নাগরিক হয়ে

ইংরেজদের এই অন্যায় অত্যাচার নির্যাতন আমি মেনে নিতে পারি না। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। দয়া করে আমাকে নিরুৎসাহিত করবেন না।
তিনি স্মিত হাসলেন। সেদিনই বুঝেছিলাম এই লোক সাংঘাতিক। অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, ভরাট কণ্ঠ, প্রত্যয়ী তাঁর কথাবার্তা। সেদিন মাস্টারদার এই চরিত্রও আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল; সাহস যুগিয়েছিল।"

মাস্টারদা

মাস্টারদা সূর্যসেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৩ সালে ১৮ অক্টোবর, চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায়। ১৯২৩ সালে মুর্শিদাবাদে বহরমপুর কলেজ থেকে বিএ পাশ করে চট্টগ্রামে আসেন। সে সময় হরিশচন্দ্র দত্ত নামে এক কংগ্রেসভক্ত চট্টগ্রামের নন্দনকাননে ন্যাশনাল স্কুল নামে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সূর্যসেন সেই স্কুলে অঙ্ক পড়াতেন। ছেলেমেয়েদের তিনি খুব আদর করতেন। ভালোবাসতেন। মাস্টার হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। এজন্য সবাই তাঁকে সম্মান করে মাস্টারদা ডাকতেন। তখন সবাই মাস্টারদা বলতে সূর্যসেনকেই বুঝতেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আগেই তাঁর এই নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল ।
সেই বহরমপুর থেকেই আমাদের একজন বিপ্লবী তাঁর সংস্পর্শে আসে। নাম সতীশ চক্রবর্তী। তিনি যুগান্তর দলের একজন নেতা। সেখানে সূর্যসেন, সতীশ চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, জুলু সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, চারুবিকাশ দত্তকে নিয়ে একটা বিপ্লবী চক্র গড়ে তোলেন। বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্রসহ যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহের নেতৃত্ব দেন তিনি। প্রকাশ্য দিবালোকে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কোষাগার লুণ্ঠন করেন তাঁর। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ হয়।
১৯৩৩-এর ২ এপ্রিল পটিয়া থানার গৈরালা গ্রামে আত্মগোপন করে ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর গোপন আস্তানার খবর ফাঁস হয়ে যায়। সে বছর ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তিনি। ১৯৩৪-এর ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলখানায় দেশদ্রোহী হিসেবে এই দেশপ্রেমিকের ফাঁসি হয়।

০২.০১

বিনোদবিহারীর ভাষ্য: সশস্ত্র বিপ্লবের রথে

আমাদের দলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল এদেশ থেকে ব্রিটিশদের তাড়ানো এবং সেটা সহিংস পদ্ধতিতেই। চারদিকে তখন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের হাওয়া। আমরা জানতাম যে গান্ধীজির এই অহিংস আন্দোলনে দেশ স্বাধীনতা পাবে না। আমাদের বিশ্বাস ছিল, যারা অত্যাচার করে তাদের যদি মারতে শুরু করি তাহলে

তারা এ দেশ থেকে পালাবে। এছাড়া হবে না। সহিংস উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে। গান্ধিজীর আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশে বিপ্লবীরা নানা জায়গায় নানান জেলায় অনেকগুলো কাজ করেছে। শাসকগোষ্ঠী টের পয়ে যায় যে চট্টগ্রামে একটা বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছে। তাই তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে আটক করতে শুরু করে। ১৯২৪ সালে অনেক বিপ্লবী ধরা পড়ে গেল।

মাস্টারদার বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পারোয়ানা ছিল। তিনি অজ্ঞাতবাসে চলে গেলেন। কিছুদিন চট্টগ্রামে থেকে তিনি আসামে গেলেন। ওখানে গিয়ে দল করলেন। আসাম থেকে গেলেন বেনাপোল। কলকাতায় শোভাবাজারের এক বাড়িতে ধরা পড়েন মাস্টারদা সূর্যসেন। ১৯২৮ সালে জনমতের চাপে বিনাবিচারে আটক বন্দিদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হল ব্রিটিশ সরকার। সে সুবাদে বিপ্লবীরা তখন জেল থেকে ছাড়া পায়।

মাস্টারদা জেল থেকে ১৯২৮ সালে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন, তিনি যে দল রেখে গিয়েছিলেন তা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। কারণ তিনি দেখলেন যে তাঁর অবর্তমানেও তাঁর কর্মীরা বসে ছিল না। সবাই কাজ করে দলকে বড় করেছে। সবাই যেহেতু সহিংস পদ্ধতিতে দেশ স্বাধীন করার চিন্তাভাবনা করছে, দলকে তো ভারী করতেই হবে। তিনি খুব খুশি হলেন।

গান্ধীজী বলেছেন, 'আমি সত্য এবং অহিংস পথে দেশ স্বাধীন করব'। আমি গান্ধীজীকে অবমূল্যায়ন করছি না। অ্যাই টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, আমি এখন গান্ধীজিকে সমর্থন করি। তাঁর নীতি বিশ্বাস করি। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার আগে আমাদের বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে সভা করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু শুধু নয়, বাংলাদেশে তখন যারা ছিলেন–গোবিন্দকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, অরুণচন্দ্র গুহ, জ্ঞান মজুমদারসহ আরো অনেকের সঙ্গে। বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মিলে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে গান্ধীজী তাঁদের অনুরোধ করে বলেছিলেন, 'আমি যখন এই আন্দোলনটা করব আপনারা তখন কোনো ধরনের সহিংস আন্দোলন করবেন না। একটি বছর আমাদেরকে সুযোগ দিন।'

বিপ্লবীরা তাঁর আহ্বানে সম্মত হয়েছিল। তাঁরা বলেছিল আমরা আপনাকে কেবল সুযোগ দেব তা নয়, আপনাকে সাহায্যও করবো, যাতে আপনার আন্দোলন সফল হয়। আমরা গ্যারান্টি দিলাম এক বছর আমরা কোনো ধরনের হিংসাত্মক কাজ করবো না।

গান্ধীজী তখন আন্দোলন আরম্ভ করলেন। আমাদের বিপ্লবী নেতারাও সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। আন্দোলন যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, ব্রিটিশ সরকার তখন অত্যাচার শুরু করল। উত্তর প্রদেশের একটা গ্রামের নাম চৌরাচৌরি। ব্রিটিশ বাহিনী একদিন এই গ্রামের নিরীহ মানুষদের ওপর আক্রমণ চালায়। দেয়ালে

পিঠ ঠেকে গেলে কেউ আর বসে থাকতে পারে না। সেদিন রাতে চৌরাচৌরি গ্রামের মানুষ থানা ঘেরাও করে অনেককে মেরে ফেলে। এই খবরটা যখন কাগজে বেরোল, গান্ধীজী কারো সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা এতে খুব বিরক্ত হলেন। গান্ধীজী বললেন, 'এই আন্দোলন চলতে থাকলে আরো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকবে। সেই জন্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।'
এখান থেকেও আমরা শিক্ষা নিয়েছি যে, সহিংস পথ ছাড়া দেশকে ব্রিটিশমুক্ত করার কোনো বিকল্প পথ আমাদের সামনে খোলা নেই।

জেল থেকে ফিরে মাস্টারদা বললেন, আমরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া বেসিস-এ যতগুলো কাজ করতে চেয়েছি, সবগুলো ধরা পড়েছে। তিনি বললেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত। সেই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীরা জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। উদ্দেশ্য জার্মানি থেকে অস্ত্র এনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করা। ব্রিটিশবাহিনী তখন জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমরা ভাবলাম, এ সময় আমরা যদি ব্রিটিশ সরকারের উপর আক্রমণ চালাই তাহলে জার্মানি আমাদের সাহায্য করবে। সাহায্য হিসেবে জার্মানি আমাদের কাছে তিন হাজার অস্ত্র পাঠায়। কিন্তু আমাদের সেসব অস্ত্র ধরা পড়ে যায়। এজন্যে অনেকের জেল, অনেকের ফাঁসি হয়েছিল। এর মধ্যে মিলিটারিও আমাদের সাহায্য করেছিল।

মাস্টারদা বললেন, ব্যাপকভাবে যদি আমরা আন্দোলন বা এ ধরনের কিছু করি তাহলে ধরা পড়ে যাব। আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে দেখাব যে ক্ষমতা দখল করা যায়। যদি আমরা মরতে ভয় না পাই, তাহলে আমরা ক্ষমতা দখল করতে পারব। এই হিসেবে মাস্টারদা আর বরিশালের নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, ঢাকার সতীশ পাকড়াশী–এই তিনজনে মিলে ঠিক করলেন, আগে তিন জেলায় ক্ষমতা দখল করা হবে।

সেভাবে সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কলকাতার মেছুয়া নামে একটা জায়গায় মোটামুটি অস্ত্রশস্ত্র যখন জোগাড় হচ্ছিল ঠিক সে মুহূর্তে খবরটা ছড়িয়ে যায়। মাস্টারদা ভাবলেন আর দেরি নয়। আমাদের আরো সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের জন্যে মাস্টারদা একটা কর্মসূচি দিলেন। এই কর্মসূচি সফল করার জন্যে তিনি চট্টগ্রামের একশ ছেলেকে নির্বাচন করলেন, যারা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত; যাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মরে মরে দেশের মানুষকে শেখাবেন দেশাত্মবোধ কাকে বলে, স্বদেশী করা কাকে বলে। ভারতবর্ষের মানুষ যেভাবে নির্জীব হয়ে পড়েছে, ওদেরকে জাগাতে হবে।

ওদের মধ্যে উদ্যোগী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। তা না হলে এদেশ থেকে ব্রিটিশদেরকে উৎখাত করা সম্ভব হবে না।
এই পরিকল্পনার সূত্র ধরে আমরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিলাম।

০২.০২
চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আমার জীবনের প্রথম অপারেশন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের কথা। দলের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা ঐ দিনের জন্য দলকে চার ভাগে ভাগ করেন; চারটি অপারেশন চালানোর জন্য সবাইকে প্রস্তুত করেন। প্রথম দলের দায়িত্ব ছিল ফৌজি অস্ত্রাগার আক্রমণ করা। পুলিশের অস্ত্রাগার দখল করা ছিল দ্বিতীয় দলের কাজ। তৃতীয় দলের দায়িত্ব ছিল টেলিগ্রাফ ভবন দখল করা। রেললাইন তুলে ফেলা ছিল চতুর্থ দলের দায়িত্ব। যে দল পুলিশের অস্ত্রাগার দখল করবে আমি ছিলাম সে দলে।

মাস্টারদা সবাইকে ডেকে যার যা দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। তারপর ছড়িয়ে পড়তে বললেন। আমাদের জনা দশেকের ওপর নির্দেশ ছিল রাত দশটার মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের দামপাড়া পুলিশ লাইনের আশেপাশে উপস্থিত থাকা। আমরা মিলিটারির পোশাক পরে, আলমারি ভাঙার জন্যে সঙ্গে দু'খানা শাবল নিয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হলাম। আমাদের মধ্যে আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে, আমাদের দলের আরেকটি অংশ দামপাড়া পুলিশ লাইনের পাহাড়ে উঠে প্রহরীদের আটক করবে এবং 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি তুলবে। এই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যারা জঙ্গলের আশেপাশে থাকব সকলেই একযোগে বন্দে মাতরম ধ্বনি তুলব।
খুব একসাইটেট ছিলাম সেদিন, না জানি কী হয়। জীবনের প্রথম অপারেশন। যে কোনো মূল্যে আমাদের জয়ী হতে হবে–এরকম একটা মনোভাব ও মনোবল কাজ করছিল আমাদের প্রত্যেকের ভেতর।

অপেক্ষা করছি। হঠাৎ করে বন্দে মাতরম শ্লোগান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। আমরা শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও একযোগে ধ্বনি তুলে পাহাড়ের দিকে উঠতে থাকলাম। শত্রুরা আমাদের আওয়াজ শুনে ভাবল আমরা সংখ্যায় অনেক। বন্দে মাতরম শুনেই অধিকাংশই পুলিশ সদস্য ভয়ে পালাল। আমরা পুলিশ লাইনের ভেতরে ঢুকে শাবল দিয়ে আলমারি ভেঙে হাতের কাছে গোলা, বারুদ, রাইফেল যা যা পেয়েছি সঙ্গে নিলাম। যেগুলো আমাদের কাজে লাগবে না সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

অস্ত্রাগারে আগুন লাগাতে গিয়ে আমাদের সহযোদ্ধা হিমাংশু সেন অগ্নিদগ্ধ হয়। তাকে নিরাপদ স্থানে রাখার জন্যে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল দামপাড়া ত্যাগ করে।

এ ঘটনার পর তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সমুদ্রবন্দরের বিদেশি জাহাজ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে সৈন্য নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে। লোকনাথ বলের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী তার সমুচিত জবাব দেয়। এদিকে অনন্তদা, গণেশদা হিমাংশুকে রেখে ফিরে আসছে না দেখে মাস্টারদা চিন্তিত হন। অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তারপর তিনি দামপাড়া ছেড়ে আমাদের নিয়ে নিকটবর্তী ফতেয়াবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

২১ এপ্রিল পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়ায় ফলে শেষ রাতের দিকে পুনরায় শহর আক্রমণের উদ্দেশ্যে আমরা ফতেয়াবাদ পাহাড় থেকে রওয়ানা হই। সেদিন আমাদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছিল যা আমরা পরবর্তী অপারেশন জালালাবাদ যুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিলাম।

০২.০৩
মুক্ত চট্টগ্রাম: চারদিন

১৯৪৭-এর ভারতভাগ-দেশভাগ কিংবা ৭১-এর ত্রিশ লাখ প্রাণের আত্মাহুতির বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ আমরা আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম। বলেছেন বিনোদবিহারী চৌধুরী। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাতে সংঘটিত হয় চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ। দিনটিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিনও বলা হয়। ব্রিটিশদের মূল ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করলে মাস্টারদার নেতৃত্বে পুরো চট্টগ্রাম শহর বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিপ্লবী নেতাকর্মীরা দামপাড়া পুলিশ লাইনে সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেদিন মাস্টারদাকে প্রেসিডেন্ট ইন কাউন্সিল, ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চিটাগাং ব্রাঞ্চ বলে ঘোষণা করা হয়। রীতিমতো মিলিটারি কায়দায় কুচকাওয়াজ করে মাস্টারদা সূর্যসেনকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

তুমুলভাবে বন্দে মাতরম ধ্বনি তুলে, আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল এই অভিষেক অনুষ্ঠান। মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ছিল চারদিন।
এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন জঙ্গিরূপ ধারণ করে।

০২.০৪
সম্মুখসমর: জালালাবাদ যুদ্ধ

চার দিন পর, ১৯৩০-এর ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে সংঘটিত হয়েছিল মরণপণ যুদ্ধ। সেটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম সম্মুখসমর। আমরা দলে ছিলাম ৫৪ জন। তিনদিন অনাহারে অভুক্ত অবস্থায় আত্মগোপন করে ফতেয়াবাদ পাহাড়ে

আছি। গাছের দু-একটি আম খেয়ে আমরা দিন পার করছি। এই অবস্থায় আমাদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এর মধ্যে অম্বিকাদাদা কীভাবে যেন বড় একহাঁড়ি খিচুড়ি নিয়ে হাজির হলেন। আমরা সবাই অবাক। সেই খিচুড়ি ছিল আমাদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ, স্বাদ ছিল অমৃতের।

খাওয়া শেষ করে মাস্টারদা আমাদের ডেকে বললেন, আমরা যেকোনোভাবে আমাদের কর্মসূচি পালন করব। সিদ্ধান্ত হল ভোররাতে চট্টগ্রাম শহর আক্রমণ করা হবে। কখন যে রাত গড়িয়ে গেল আমরা বুঝতে পারিনি। সময়মতো পৌঁছাতে পারব না ভেবে ভোরের আলো ফোটার আগেই আমরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। ঠিক করা হল রাতের বেলা এখান থেকেই শহরেই ব্রিটিশ শাসকদের অন্যান্য ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সেদিনই পড়ন্ত বিকেলে গরু-বাছুর খুঁজতে আসা একদল রাখাল আমাদের দেখে ফেলে। তখনই মাস্টারদা ধারণা করলেন, এখানে আমাদের ওপর যে কোনো ধরনের আক্রমণ আসতে পারে।

এক সময় মাস্টারদা খবর পেলেন রাখালদের দলটিকে থানার দিকে যেতে দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিপ্লবী লোকনাথ বলকে আসন্ন যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। আমরা দেখলাম লোকদা খুব ঠাণ্ডা মাথায় যুদ্ধের একটা ছক তৈরি করলেন। পাহাড়ের কোন অংশে কারা থাকবেন, কীভাবে থাকবেন, সব ধরনের নির্দেশনা আছে ছকটিতে। তিনি আমাদের যুদ্ধের নানা কৌশল সম্পর্কে ধারণা দিলেন। আমিসহ কয়েকজনের দায়িত্ব ছিল ত্রিশূল আক্রমণের। আমাদের এমন পজিশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হল, যাতে আমাদের প্রতিপক্ষ কোনোভাবেই পাহাড়ের ওপর উঠে আসতে না পারে। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, বেলা ৪ টায় পাহাড় থেকে আমরা দেখলাম সৈন্যবোঝাই একটি ট্রেন জালালাবাদ পাহাড়ের পুব দিকে এসে থামল। ট্রেন থেকে নেমে ব্রিটিশ সৈন্যরা আমাদের অবস্থানরত পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছে। কাছে এসেই তারা বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। একে তো আমরা সংখ্যায় কম, তারপর আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাদের তুলনায় নগণ্য। সেকারণে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গুলি না ছুঁড়ে পাহাড়ে ওঠার সুযোগ দিচ্ছিলাম। যখন তারা পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করছিল, আমরা কি তখন আর বসে থাকতে পারি? আমরাও গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলাম। এ ছিল শক্তির দিক থেকে এক অসমান যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে প্রথম শহীদ হলেন বিপ্লবী হরিগোপাল বল। সে ছিল ১৫ বছরের এক টগবগে যুবক। কিছুক্ষণ পর আরেক বিপ্লবী বিধুর চিৎকার শুনলাম। সে বলছে, নরেশ, আমার বুকেও হান্দাইছে একখান গুলি। তাকিয়ে দেখি তার মুখে হাসি। বলল, তোরা পিছপা হবি না। প্রতিশোধ নিবি। একথা বলার পর সে মারা যায়। বিধুর বুকে গুলি এসে লেগেছিল। মেডিকেল স্কুলের শেষবর্ষের ছাত্র বিধু ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে রসিক মানুষ। সহযোদ্ধার মৃত্যুতে তখন আমাদের শোক

করার অবকাশ নেই। আমরা তখনো আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। একে একে আমাদের বিপ্লবীসজ্জন নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেনও শহীদ হলেন। জালালাবাদ পাহাড় শহীদের রক্তে রঞ্জিত হল। হঠাৎ একটা গুলি আমার গলার বাঁ দিকে ঢুকে ডান দিকে বেরিয়ে গেল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

০২.০৫
নতুন জীবন: নতুন অভিজ্ঞতা

ঘণ্টাখানেক অচেতন ছিলাম। লোকনাথদা, শান্তি নাগ, বনহরি দত্তের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম সৈন্যসামন্ত নেই। গলায় তখনও অসহ্য যন্ত্রণা। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। বিপ্লবীরা পরনের লেঙ্গুট ছিঁড়ে আমার গলায় ব্যান্ডেজ করে দিলেন। আমাদের এক ক্লাসফ্রেন্ড রজত সেন। সে বলল, তোর কষ্ট হচ্ছে খুব, না? তোকে তাহলে গুলি করে মেরে দেই।

শুনছি লোকদা বলছেন–বিপ্লবী লোকনাথ বল–না, ও বাঁচবে। ওকে গুলি করতে হবে না। ওকে আমরা নিয়ে যাব। মাস্টারদা সিদ্ধান্ত নিলেন এই পাহাড়ে আর নয়। আমাদের অন্য কোনো জায়গায় যেতে হবে। ঘন জঙ্গলে রাতটা পার করতে হবে। পরবর্তী কর্মসূচি হবে গেরিলা যুদ্ধ। যে যেভাবে পারি আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। বায়েজিদ বোস্তামির দিকে একটা শনখোলা ছিল। হাঁটতে হাঁটতে আমরা সে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেও হাঁটলাম। তখন বৃষ্টি হচ্ছে, তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজে সবাই শীতে কাঁপছি। এই ভিজে অবস্থায় শনখোলার মধ্যে পড়ে রইলাম কোনোমতে।

ভোর হওয়ার পর দেখি আমরা যেভাবে ছিলাম সেভাবে নেই, দুটি দলে ভাগ হয়ে গেছি। আমাদের দলে আছে সতেরজন, বাদবাকি অন্যদলে। মাস্টারদা, নির্মলদা আগের দলেই চলে গেছেন। আমাদের দলে আছেন লোকনাথ বল। একটু এগোতেই একজন পথচারীর দেখা পেলাম। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম আমরা ফৌজদারহাট এলাকায় আছি।

আমি আমার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছি না। লোকদাকে বললাম, আমি অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছি। আপনারা আমাকে এখানে ফেলে চলে যান। আমাকে সঙ্গে নিলে আপনারাও হাঁটতে পারবেন না। আমার জন্য আপনারা সবাই একসঙ্গে ধরা পড়বেন। ধরা পড়লে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

লোকদা বললেন, সেটা কী করে হয়? আমি বললাম, আমি বাঁচব কি মরব তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আপনারা এতগুলো লোক, আপনাদের কাজ আছে ভবিষ্যতে। আমি কোনো একটা ব্যবস্থা করে নেব। আমাদের একজন কর্মী ছিল বিনয় সেন। লোকদারা সবাই তার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

আমি আস্তে আস্তে হেঁটে ফৌজদারহাট ছেড়ে ভাটিয়ারি, ভাটিয়ারি ছেড়ে ছোট কুমিরায় এসে পৌঁছলাম। ঐ গ্রামে ছিল আমার খুড়তত ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি। জেঠাশ্বশুর ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। আমি সেই বাড়িতে গিয়েই হাজির হলাম।

ততক্ষণে আমার গলা আরও ফুলে গেছে। গায়ে জ্বর। কথা বলতে পারছিলাম না। তারা আমাকে দেখেই চিনল। তারপর বন্যপাতা দিয়ে জখম স্থানে গরম সেঁক দিল। তাদের সেবা-যত্নে আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। ১৪/১৫ দিনের মাথায় আমাকে এই আশ্রয় হারাতে হল।

তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলন দমনের জন্য পুলিশ কুমিরায় একটা ক্যাম্প তৈরি করে। এই ক্যাম্প দেখে আমার সেই আত্মীয়রাও আমাকে নিয়ে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যান। আমি যদি এখানে ধরা পড়ি তাহলে আমাকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে বাড়ির সবাইকে জেলে পচতে হবে। আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেওয়া হল।

এই সময়ে আমার বৌদি বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। তাকে চট্টগ্রামের চাকতাই পাঠানো হবে। ভাবলাম চাঁটগায় ফেরার এইতো সুযোগ। লালপেড়ে শাড়ি, হাতে শাঁখা-পলা, মাথায় সিঁদুর ও টিপ পরে বৌদির সঙ্গে আমিও রওয়ানা দিলাম। পথে আমাদের দুইবার পুলিশের বেষ্টনী পার হতে হয়েছে। আমি দেখতেও ছোটখাট গড়নের; মেয়েদের মতন ফর্সা ছিলাম, তার উপর মেয়েদের শাড়ি-গয়না পরে মেয়ে সেজে আছি। আমাকে কেউ চিনতে পারেনি। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন বেঁচে গেলাম।

০২.০৬
জেল: যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

মেয়ে সেজে আমি ফৌজদারহাট থেকে চট্টগ্রাম পালিয়ে এসেছিলাম। আমি আর বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারিনি। আমার পলাতক জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে ঢাকায়। সেসময় আমাকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার ৫০০ টাকা ঘোষণা দেয়। ফলে একসময় তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম।

এই পর্যন্ত আমি তিনবার জেলে গেছি। প্রথমবার গিয়েছি ১৯৩৩ সালের জুন মাসে। আমাকে ধরার আগে একই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মাস্টারদাও ধরা পড়েন। মাস্টারদা (সূর্যসেন), ফুটুদা মানে তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিরুদ্ধে মামলা ছিল। আমাকে ধরেছে সন্দেহের বশে। চট্টগ্রাম জেলের এক একটা সেলে মাস্টারদা, ফুটুদা, কল্পনা দত্ত ও আমি ছিলাম। যদিও কেউ কাউকে দেখতে পাইনি। তারপরও প্রায়ই কাছাকাছি ছিলাম। একজনের কথা আরেকজন শুনতে পেতাম।

একদিন হল কী, রাত প্রায় ১১/১২ দিকে কল্পনা দত্ত জোরে জোরে চিৎকার করে বলছেন, এই বিনোদ, এই বিনোদ দরজার কাছে আয়। মাস্টারদা গান শুনতে চেয়েছেন।

আমি তাঁকে বললাম, আমি যে গান জানি না মাস্টারদা তা জানেন।
তবুও তিনি বললেন, যা পারিস গা।

আমি রবিঠাকুরের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে' গানটি শোনালাম। পরের গান ধরব। জেলখানার পুলিশ দৌঁড়ে এল। গ্রিলের দরজায় কয়েক ঘা দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিল।

এই সেলে আমি একমাস ১৯ দিন ছিলাম। এরপর আমাকে এসডিও কোর্টে নেয়া হয়। সেখানে আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ অপরাধের কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পারেনি।

আমাকে ছেড়ে দেয়া হল। ছাড়া পেয়ে আমি খুশি। কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হয়নি। যখন নামছি, একজন পুলিশ এসে বলল, বেঙ্গল ক্রিমিনেল ল আমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট-এ আপনাকে আবার অ্যারেস্ট করা হল।

আমি আর বাইরে যেতে পারিনি। আমাকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশের একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে অনেকক্ষণ জেরা করা হলো আমাকে। সন্ধ্যায় আমাকে আবার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আমাকে এবার জেলের যে রুমে রাখা হয়েছে সেখানে ৫০/৬০ জন ডেটিনি থাকত। ডেটিনি মানে বিনাবিচারে বন্দি। তাদের সঙ্গে আমি সাতদিন ছিলাম।
এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন শুনি মাস্টারদা এবং ফুটুদার ফাঁসি হবে। সেদিন সেলে আমরা সবাই অনশন করেছি। কেউই অন্ন স্পর্শ করিনি। দিনটিকে শোকদিবস হিসেবে পালন করেছি। তারপর চট্টগ্রাম জেল থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানে মাসখানেক ছিলাম। তারপর দেউড়ি, রাজস্থান। সেখানে ছিলাম প্রায় পাঁচবছর। সেখান থেকে আমি আইএ পাশ, বিএ পাশ করি এবং ল-এ ভর্তি হই।
১৯৩৮-এর শেষভাগে আমি ছাড়া পেলাম।

এরপর আমাকে আরো দুবার জেলে যেতে হয়েছে। একবার ১৯৪১ সালের মে মাসে গান্ধীজীর ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদানের প্রস্তুতিকালে। জেলে যাওয়ার চার মাস আগে বিয়ে করেছি। সেবার জেল থেকে বের হলাম ১৯৪৫ সালের শেষদিকে। আবার জেলে গেলাম ১৯৬৫ সালে। সেবছর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হল। পাকিস্তান সরকার সিকিউরিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী একবছর আমাকে বিনাবিচারে জেলে বন্দি রাখে। বন্দী-জীবনের কথা বলেছি। মুক্তজীবনে কী করেছি তা-ও বলব। তার আগে মাস্টারদার গ্রেপ্তারের কথা বলি।

০২.০৭
মাস্টারদার গ্রেপ্তার ও ফাঁসি: ইতিহাসের সূর্য অস্তমিত

১৯৩০ সালের পর থেকে মাস্টারদা অজ্ঞাতবাসে গেলেন। কখনো কলকাতায়, কখনো ঢাকায়, কখনো চাঁটগায়। এভাবে ক'বছর পার করার পর ১৯৩৩-এর শুরুর দিকে তিনি পটিয়া থানার গৈরালা গ্রামে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে গোপনে থাকতে শুরু করলেন।

একই গ্রামে বসবাসকারী তাঁর এক আত্মীয়, নাম নেত্রসেন, মাস্টারদার অবস্থান সম্পর্কে জানতেন। তিনি ব্রিটিশ পুলিশকে খবরটা জানিয়ে দিলেন। ২ ফেব্রুয়ারি নেত্র সেনকে সঙ্গে নিয়ে সাদা পোশাকধারী ব্রিটিশ পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে মাস্টারদাকে গ্রেপ্তার করেন। মাস্টারদাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য নেত্র সেন ১০,০০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এই খবর শোনার সঙ্গে আমাদের অন্য বিপ্লবীদের মাথায় রক্ত উঠে গেল। আমাদের নেতা গ্রেপ্তারের পর আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমাদের কোনো প্রস্তুতিও ছিল না। তবে একটা কাজ হয়েছে।

নেত্র সেন মোটা অঙ্কের টাকা পেয়ে খুশিতে শহরে এসে বিশাল একটা মাছ কিনেছিল। ভেবেছিল আরামে-আনন্দে খাবে।

সে খেতে বসেছে। এমন সময় আমাদের এক কর্মী তার বাড়িতে হাজির হয়। সেই বিপ্লবী খাবার পিঁড়ির উপর এক কোপে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে। ভাতের থালায় মাছের মাথার সঙ্গে তার মাথাটাও পড়ে থাকে।

এভাবেই আমরা প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আমাদের দলের আরেক নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার মাস্টারদাকে ছাড়িয়ে আনার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের শকুনের চোখ তিনি এড়াতে পারেননি।

অবশেষে ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি ইতিহাসের রক্তিম সূর্য মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি হয়।

০২.০৮
মুক্তজীবন: আমার মুক্তি আলোয় আলোয়

বিনোদবিহারী ১৯৪৫ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন। তাঁরা দশ/বারো জন বন্ধু কমিউনিস্ট হলেন না। একসঙ্গে তাঁরা ভাবছিলেন কী করা যায়। একসময় তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দিলেন। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরপরই রাজনীতি থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়ে বিনোদবিহারী কলকাতায় গেলেন। সেখানে এমএ এবং ল ফাইনাল পরীক্ষা দিলেন। তারপর ফিরে এলেন চট্টগ্রামে।

তখন চট্টগ্রামে কংগ্রেসের আইন পরিষদের সভাপতি ছিলেন মহিমচন্দ্র দাশ। তিনি মারা যাওয়ার পর নির্বাচন হল। ওই পদে দাঁড়ালেন নেলী সেনগুপ্তা। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন বিপ্লবী কল্পনা দত্ত। নেলী সেনগুপ্তা দেশপ্রিয় জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী। জ্যোতিন্দ্রমোহন ছিলেন কংগ্রেসের একজন বড় নেতা। মহাত্মা গান্ধীর সবগুলো আন্দোলন তিনি চট্টগ্রামে সফল করেছিলেন।

স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নেলী সেনগুপ্তা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। আন্দোলনের সময় রাস্তায় রাস্তায় পিকেটিং করে তিনি অনেকবার জেল খেটেছেন।

বিনোদবিহারীসহ ৭/৮ জন যুবক তিনমাস পরিশ্রম করলেন নেলী সেনগুপ্তাকে জিতিয়ে আনতে। তিনি পাশ করলেন। হেরে গেলেন কল্পনা দত্ত।

কল্পনা দত্তেরও একটা রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। ত্রিশের দশকে তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি মিস্টার যোশীকে বিয়ে করে কল্পনা দত্ত হয়ে যান কল্পনা যোশী।

০২.০৯
'৪৭-এর দেশভাগ: আমার অবস্থান

১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষের নৌসেনারা বিদ্রোহ করলেন। ব্রিটিশের কথা মানলেন না। এদিকে যেসমস্ত সৈন্যকে বিশ্বযুদ্ধের জন্য জাপানে পাঠানো হয়েছিল, যুদ্ধশেষে সবাই নেতাজীর পক্ষে চলে আসেন। এসব কারণে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারল যে, এখানে তারা আর থাকতে পারবে না। তাই দেশটা ভাগ করার জন্য তারা উঠে-পড়ে লাগল। শেষপর্যন্ত এই বাংলা ভাগ হয়ে গেল। এই ভাগ আমরা চাইনি।

কংগ্রেস নেতারা বাংলার এই বিভক্তি মেনে নিলেন। তাঁরা ভাবলেন পাকিস্তান টিকবে না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কূটবুদ্ধির কাছে তাঁরা হেরে গেলেন। কেননা ব্রিটিশরা পাকিস্তানকে এমনভাবে সাহায্য করতে লাগল যাতে ভারত বড় হতে না পারে; এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে না পারে। আজকে পাকিস্তানের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তারা ব্রিটিশ ও আমেরিকার সাহায্য পেয়ে একটা বড় মিলিটারি জাতি হয়েছে। ভারত পাকিস্তানের সীমান্তে কাশ্মীরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান তিনবার লড়াই করেছে। তিনবারই পরাজিত হয়েছে।

কাশ্মীরটা যুদ্ধের জন্য বেশ স্ট্রাটেজিক পয়েন্ট। আমেরিকা এবং ব্রিটিশ সরকার চেয়েছে কাশ্মীর পাকিস্তানের দখলে থাকলে ওখানে তারা ঘাঁটি করতে পারবে। চীন ও রাশিয়াকে চোখ রাঙাতে পারবে। ভারতের কাছে থাকলে এটা সম্ভব হবে না।

বাংলাভাগের সময় আমাদের পাড়াপড়শি অনেকেই ভারতে চলে যান। আমাদেরও সেসময় অনেকেই চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি তাদের কথা

শুনিনি। আমি তাদের বোঝালাম, আমার জন্ম এখানে, আমি এখানকার আলো-বাতাসে বড় হয়েছি, আমার মা-বাবা-নিজ গ্রাম-আমার শহর–এগুলো ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না।

তাঁরা গেছেন। তাই দেশ ছাড়িনি। পূর্ববাংলায় রয়ে গেছি। এখানকার অনেক এমএলএ (মেম্বার অব লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি) ওই বাংলায় চলে গেলেন। কিরণশঙ্কর রায় ঢাকা থেকে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তিনিও ভারতে চলে যান। ফলে তার আসনটি শূন্য হয়। আমার পার্টি থেকে আইনসভার সে আসনে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলা হয়। সেই আসনের মধ্যে ছিল সাতটা জেলা– ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, সিলেট, ফরিদপুর ও বরিশাল। আমাকে এই সাতটা জেলায় ঘুরতে হবে। কারণ আমার ভোটাররা হচ্ছে তারাই, যারা এই সাত জেলার মিউনিসিপ্যালিটির ভোটার। তাদের ভোট যে বেশি পাবে সেই জিতবে। মিস্টার ব্যানার্জীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আমি জিতলাম। জিতলাম প্রায় ৩০০০ ভোটের ব্যবধানে।

ভোটযুদ্ধে জেতার পরে অ্যাসেম্বলিতে আমার কাজ করতে হয়। সেসময় অর্থাৎ দেশভাগের পরে নেহেরু-লিয়াকত একটা প্যাক্ট হয়। নেহেরু হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর লিয়াকত হল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তারা সিদ্ধান্ত নেন যে উভয় দেশে মাইনরিটি বলে একটা বোর্ড থাকবে। যদি কোনো মাইনরিটি অত্যাচারিত হয় তাহলে এই বোর্ডেই বিচার হবে। সেই হিসেবে মাইনরিটি বোর্ডের সেক্রেটারি হিসেবে আমি কাজ করেছি।

আমার এই অবস্থান দেশের জন্যে কল্যাণকর কাজের প্রতি স্পৃহা শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

০২.১০
ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ: আমি তোমাদেরই লোক

ভাষা আন্দোলনের সময় আমি কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে আইনসভার সদস্য ছিলাম। থাকতাম ঢাকার ফরাশগঞ্জে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিল কারফিউ। ছাত্ররা এই কারফিউ ভঙ্গ করে ভাষার দাবি আদায়ে রাজপথ দখল করে আছে। মিছিলে উত্তাল সেই এলাকার দৃশ্য আমি আজো ভুলিনি।

সেদিন ফরাশগঞ্জ থেকে বেলা ২টার দিকে আইনসভার অধিবেশনে যোগদানের জন্যে রিকশা করে যাচ্ছি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন ছেলে আমাকে রিকশা থেকে নামিয়ে দিল। আমি তাদের কাছে আমাকে নামিয়ে দেয়ার কারণ জানতে চাইলে তারা বললেন, আপনাকে আমরা যেতে দেব না। দেখে যান আমাদের লোকজনদের তারা কিভাবে পাখির মতন গুলি করে মারছে।

তারা আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে লাশ দেখিয়ে বলল এটা বরকতের লাশ। রক্তে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারাটা। আমি বিচলিত হলাম খুব, খুব খারাপ লাগছে। আমি তাদের বললাম, আমি তোমাদেরই লোক। দেশে এখন মুসলিম লীগের রাজত্ব চলছে, তাঁরা তাদের শাসন কায়েম করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। আমি অ্যাসেমব্লিতে যেতে না পারলে ওদেরই লাভ। সেখানে গিয়ে এসব ঘটনা তুলে ধরলে সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পারবে।

তারা বিষয়টি বুঝলেন এবং আমাকে ছেড়ে দিলেন। সেদিন অ্যাসেমব্লিতে এসে ধীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন এই বর্বরতার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছি। আমাদের কয়েকজন নেতাও এই ভাষা আন্দোলনের সময় জেল খেটেছেন। আমাকেও ধরে নেয়ার কথাও শোনা যাচ্ছিল। আমি গা-ঢাকা দিলাম। তবে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রচারকাজে কখনো বিরত থাকিনি।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তির জন্যে যুদ্ধ শুরু হয়। দেশে চলছিল মার্শাল। খোলামেলাভাবে কিছু করতে পারছি না। মে মাসে আমি আর গ্রামে থাকতে পারলাম না। আমাদের গ্রামের চেয়ারম্যান আমাকে এসে বললেন, 'দাদা আপনি দেশ ছেড়ে চলে যান। যদি না যান আপনাকে আমরা বাঁচাতে পারব না। যদি চলে যান কোনো মিলিটারি আমাদের গ্রামে আসতে পারবে না, সে ব্যবস্থা আমরা করতে পারব।'

গ্রামে একবার মিলিটারি ঢুকলে সবার সর্বনাশ করে ছাড়বে। তাদের কথা বিবেচনা করে আমি প্রায় দুইশ মাইল হেঁটে ভারতে আসামে গিয়ে উঠি। আসাম থেকে মিজোরাম। এরপর কলকাতায়। সেখানে গিয়ে দেখলাম আশেপাশে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী–এসব এলাকায় অনেক শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। আমি ওখানে তাদের নিয়ে স্কুল দিলাম। প্রাইমারি স্কুল। ভারত সরকার আমাকে সহায়তা দিয়েছিলেন। আমি ওই স্কুলে ১৫-১৭ বছর বয়সের তরুণদের রিক্রুট করতাম। তাদের ট্রেনিংয়ে পাঠাতাম, যাতে বাংলাদেশের যুদ্ধে অংশ নিতে পারে। আর ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতাম।

রাইফেল হাতে নিয়ে যুদ্ধ করা আমার আর হয়ে ওঠেনি। সেই খেদ আমাকে মেটাতে হয়েছে তরুণ মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করে আর আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে।

০২.১১
একাত্তরের পর: স্বপ্নভঙ্গ

যে স্বপ্ন নিয়ে মাস্টারদা সূর্যসেন কাজ করেছেন, আমরা কাজ করেছি, যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, সে স্বপ্ন এখন সুদূরপরাহত। তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এটি একটি গণতান্ত্রিক

দেশ হবে। এখানে সমাজতন্ত্রের হাওয়া বইবে। আমরা সকলেই একভাই একজাতি হব। হব অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু ১৯৭৫-এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সেই হত্যাকারীরা আমাদের স্বপ্নকেও পুঁতে ফেলেছে।

আজকের এসবের জন্য দায়ী বঙ্গবন্ধু নিজে। সেসময় যে সমস্ত লোক মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তাদের মেরে ফেলা উচিত ছিল। তা না করে তিনি রাজাকার আলবদর আলশামস বাহিনীর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তাঁর এই উদারতার সুযোগ নিয়ে আগাছাগুলো আজকে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধের পর এক একটা জেলায় অন্তত ৪/৫ জন করে রাজাকার যদি আমরা মেরে ফেলতে পারতাম তাহলে আজ আমাদের এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হত না।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সময় লাগবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা নানাভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে। ২০০২ সালটি শুরু হয়েছে এক বীভৎসতার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন জেলায় জেলায় তখন হিন্দুদের উপর নেমে এসেছে অমানুষিক নির্যাতন–কখনো ধর্ষণ, কখনো বা-খুন। এরা কি এদেশের মানুষ নয়? গোপাল মুহুরির মতো সৎ শিক্ষক, মানিক সাহার মতো সাহসী সাংবাদিকের কী অপরাধ ছিল যে তাদের একেবারে মেরে ফেলতে হবে?

সামরিক বাহিনী, পুলিশ কিংবা সচিবালয়ে কোনো উচ্চপদে হিন্দুদের চাকরি হয় না বললেই চলে। কারণ হিন্দুদেরকে তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। এটা কি গণতন্ত্রের নমুনা? আজ তারা ভারতকে শত্রু বলে বলছে। ভারত আমাদের শত্রু না মিত্র একথা তারাই বলতে পারবেন যারা সত্যিকার অর্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করেন। যারা করেন না তারাতো শত্রুই বলবেই। '৭১-এ ভারত যদি তার সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধ না করত, বাংলাদেশের এককোটি মানুষকে আশ্রয় না দিত, যুদ্ধে বিধ্বস্ত মানুষকে যদি সেবা না দিত তাহলে নয়মাসের মধ্যে এ যুদ্ধ শেষ হত কিনা সন্দেহ আছে। আমাদের জনবল যেমন কম ছিল ঠিক তেমনি অস্ত্রবলও ছিল কম। ফলে স্বাধীনতা অর্জন করতে আরও সময় লাগত, আরও রক্ত লাগত। তখন দেশের আর কিছুই থাকত না।

স্বাধীনতার মাধ্যমে আমরা রাজনৈতিক মুক্তি পেয়েছি। তার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের উছিলায় থাকা ব্রিটিশদের সমূলে তাড়াতে পেরেছি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা দেশকে ভালোবাসি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমার মনে হয় প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার মধ্য দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। হিংসা করে কিছু হয় না। বরং হিংসায় হিংসা বাড়ে আর সেটা রক্ত টানে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে কোনো দেশ কখনো উন্নতি করতে পারে না।

শেষ কথা

বিপ্লবী বিনোদবিহারী চান এদেশের মানুষের কল্যাণ হোক, এদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক, দেশের জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রকৃত গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে থাকুক। তিনি বলেছেন এই আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে চান। *গীতায়* একটা শ্লোক আছে–'দুখেষু উদ্বিগ্ন মনা, সুখেশু বিগত স্পৃহ, ভীত রাগ ভয় ক্রোধ, শীতনি মনিরজ্জুতে'। এর অর্থ–'দুঃখে আমি ম্রিয়মাণ হই না, সুখেও উচ্ছ্বসিত হই না, ভয়-ক্রোধ এসব আমি জয় করে চলতে চেষ্টা করি এবং ধীরস্থিরভাবে জীবনযাপন করি।' যে মানুষ জীবনকে এভাবে গ্রহণ করতে পারতেন, *গীতায়* তাঁদের মুনি বলা হয়েছে। বিনোদবিহারী মুনি নন, কিন্তু গীতায় উক্ত জীবনের ওই ধরন ও ধারণা তাঁকে উজ্জীবিত করেছে। ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা সেভাবেই চলার চেষ্টা করেছেন। আর তিনি যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন, তা আমাদের মধ্যেও প্রজ্বলিত হোক, সংক্রমিত হোক, প্রতিবিম্বিত হোক– এটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া।

বি জ্ঞা ন / প্র ব ন্ধ

মাতৃভাষা ও বিজ্ঞানচর্চা

.....

জা মা ল ন জ রু ল ই স লা ম

বায়ান্নের, একাত্তরের এবং এর মধ্যবর্তী ও পরবর্তীকালের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে আন্তরিক এবং গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এবারের একুশের অনুষ্ঠানে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে অমর একুশে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ করে আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন, তার জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি– যদিও আমি এই সম্মানের উপযুক্ত নই। আমি দ্বিধা এবং বিনয়ের সঙ্গে এই আমন্ত্রণটি গ্রহণ করেছি

মূলত এই কারণে যে, আমার মনে হয় আমাদের দেশের উন্নয়নের বর্তমান পর্যায়ে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার সীমিত চিন্তার এবং ধারণার পরিসরে আপনাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখলে তা আপনাদের ভাবনার জগৎকে সামান্য হলেও আলোড়িত করতে পারে। তাছাড়া আমার গবেষণাকর্মের একটা অংশে বিশ্বের নিয়তি অথবা পরিণতি সম্বন্ধে যে চিন্তা-ভাবনা করেছি সে সম্বন্ধে স্বল্প পরিমাণ বৈজ্ঞানিক ও দর্শনগত ধারণা পেশ করতে চাই এ প্রত্যয়ে যে, তা আপনাদের মনে প্রণিধানযোগ্যও হতে পারে। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা।

এটা বলা বাহুল্য যে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ও প্রয়োগ বাংলাদেশে সঠিকভাবে চালু হয়নি, সকলেই স্বীকার করবেন। না হওয়ার কারণ নানাবিধ এবং জটিল। দেশের প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, সুপরিকল্পিত এবং উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ দেখানো যায় যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অবশ্য এই কারণগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে দেশের এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যাদি। তবুও এমন কিছু পদক্ষেপ নেয়া যায় যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-চর্চার সমস্যার সমাধানে কিছুটা হলেও সহায়তা করতে পারে।

প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, আমরা কতটা পরীক্ষামূলক ও কতটা ব্যবহারিক বিজ্ঞানচর্চা করব, এবং কতটা করব তত্ত্বীয় ও মৌলিক বিজ্ঞানচর্চা। আমার মতে, উভয় ধরনের বিজ্ঞানই প্রয়োজনীয় কারণ এদুটি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। আসল কথা হল, বিজ্ঞানচর্চার মান উন্নয়ন করা– পরীক্ষামূলক এবং মৌলিক বিজ্ঞান, উভয়েরই। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন কিছু ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি। একটি কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে কতকগুলো নির্দিষ্ট দামি যন্ত্রপাতি রাখা হবে, যেমন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি, যেগুলো সকলের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে। সব ল্যাবরেটরিতে সব ধরনের যন্ত্রপাতি রাখা সম্ভব নয়। এক-একটি ল্যাবরেটরিতে এক-এক ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি থাকবে। এই ধরনের প্রস্তাব আগেও করা হয়েছে, এবার বাস্তবায়নের কথা চিন্তা করা যায়। একই সঙ্গে বর্তমান ল্যাবরেটরিগুলোর সুযোগ-সুবিধার উন্নতি করতে হবে। এ কাজে বিদেশি অনুদানের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি এই খাতে জাপান সরকার বেশ কিছু অনুদান দিয়েছেন। এই ধরনের অনুদানের সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং যন্ত্রপাতি আসার পর সেগুলো যেন দীর্ঘদিন ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় তার সুব্যবস্থা। আমি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বেশি জানি না, কিন্তু বিদেশে সামান্য অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, যাঁরা পরীক্ষামূলক গবেষণা করেন, তাঁরা যথাসম্ভব যন্ত্রপাতিগুলো নিজেরাই তৈরি এবং মেরামত করেন, প্রয়োজন হলে 'হাত ময়লা' করেও। এ সম্বন্ধে অনেকে সচেতন আছেন। কিন্তু এই

ধরনের অভ্যাস ও মনোভাব আরও জোরদার করলে যন্ত্রপাতি মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, (যেটা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ও সমস্যার দিক) তা কিছুটা সহজ হতে পারে।

তত্ত্বীয় ও মৌলিক বিজ্ঞানের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে বিজ্ঞান-শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা। অল্প বয়স থেকেই বিজ্ঞানের চিন্তাগুলো সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন। এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ভাষা হল মাতৃভাষা। এ কথা বহু বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং মনোবিজ্ঞানী বলেছেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সত্যেন বসুও একই কথা বলতেন। সবাইকে বিজ্ঞানী হতে হবে এমন কথা কেউ বলে না। তবে একটি ন্যূনতম পরিমাণ বিজ্ঞানশিক্ষা সবার জন্য প্রয়োজন। যাঁদের বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক এবং বিজ্ঞান চর্চার দক্ষতা আছে তাঁরা বিজ্ঞানী হবেন। কিন্তু মূলত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যাপক বিজ্ঞানশিক্ষার দ্বারাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে উঠবে এবং ব্যাপক বিজ্ঞান-সচেতন জনমণ্ডলী গড়ে উঠবে। বিজ্ঞানচর্চায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অপরিহার্য। সাধারণত জনসাধারণ যা চায় সরকার শেষপর্যন্ত তাই করেন। যদি জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট চেতনা না থাকে তাহলে সরকারও সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানচর্চার উন্নয়নে মনোযোগ দিতে পারেন না। বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতি করতে হলে আরও প্রয়োজন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অজানাকে জানার উৎসাহ এবং স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার আগ্রহ সৃষ্টি করা। মুখস্থ করার যে প্রবণতা আমাদের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে, তাই এ পথে এক বড় বাধা। আমি বহু শিক্ষক এবং বিজ্ঞানীর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমি যে সামান্য সাফল্য অর্জন করেছি তার একটা কারণ হল অল্প বয়স থেকে কোনো বই অথবা বিষয়বস্তু নিজে থেকে পড়ে বুঝবার অভ্যাস। একেবারে কম বয়সে দু-এক বছর ছাড়া আমার কখনও গৃহশিক্ষক ছিল না। অবশ্য আজকাল বিশেষ কারণে গৃহশিক্ষকের প্রচলন এবং ভূমিকা বেড়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সুচিন্তিত পরিকল্পনা করতে হবে। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনীয়তা থাকে। তবে এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবক সকলেরই সচেতন থাকা প্রয়োজন। বিদেশের স্কুলগুলোতে এমনভাবে পড়ানো হয় যে, সাধারণত গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। এ সূত্রে প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের দেশে এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পরীক্ষার মেরিট লিস্ট সাড়ম্বরে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। যাঁরা পরীক্ষার খাতা দেখেন তাঁরা জানেন নম্বর দেওয়াতে কিছু কমবেশি সবসময় হয়, তাই কয়েক নম্বরের তফাতে, বিশেষ করে মোট নম্বরের ক্ষেত্রে এই তফাতে বা পার্থক্যে বিশেষ তাৎপর্য নেই। এই অবস্থায় মেরিট লিস্ট কি অনেকটাই অর্থহীন নয়? যদিও এ ব্যাপারটি মাঝে মাঝে নিরর্থক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কারণে মেরিট লিস্টে থাকে না যার ফলে তারা হতাশ হয়,

আর অপরদিকে যারা থাকে তারা যে প্রচার পায় সেটা তাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এই ব্যাপারটির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মা-বাবা এবং অভিভাবকেরা যথেষ্ট সচেতন নন বলে মনে হয়। যুক্তরাজ্যে সর্বস্তরে, বিশ্ববিদ্যালয়েও, মেরিট লিস্টের ব্যাপারটিই বহু বছর আগে বাতিল করা হয়েছে। আমার মতে, ক্লাশ অথবা ডিভিশন, লেটার এবং স্টার মার্ক বজায় রাখলেই যথেষ্ট। তবে এ বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করলে সবচেয়ে ভালো হয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ছোটদের জন্য বাংলায় সু-চিন্তিত, সুলিখিত এবং সুন্দরভাবে প্রকাশিত উন্নত মানের বিজ্ঞানভিত্তিক বই বের করা এবং এই বইগুলো স্বল্প দামে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে, (গ্রামাঞ্চলেও) সরবরাহের ভালো ব্যবস্থা করা। বাংলা একাডেমী এই ক্ষেত্রে অনেকটা উদ্যোগ নিয়েছেন, কিন্তু আরও অনেক করা প্রয়োজন। এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আরও আন্তর্জাতিক মানের বই অনুবাদ করা। এ কাজে দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে; সরকারের আর্থিক সাহায্যও এখানে নিতান্ত প্রয়োজন। আমার যতদূর মনে পড়ে, প্রায় নয়-দশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় 'বিশ্বপরিচয়' বইটি পড়েই আমার বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ শুরু হয়। এদিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল বই সুলভ করে তোলা। দেখা গেছে ভালো বই প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সহজে পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। উন্নত মানের বই সর্বত্র, বিশেষ করে আমাদের অবহেলিত গ্রামাঞ্চলে, পাওয়া গেলে প্রত্যেকটি অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের এবং জনসাধারণের চিন্তার প্রসার ঘটবে এবং তার সাথে জীবনপদ্ধতির উন্নতি ঘটতে পারে। এ বিষয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিজ্ঞানচর্চার আর একটি দিক হল– যদিও প্রাথমিক-মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চতর পর্যায়ে ইংরেজিতে বিজ্ঞানশিক্ষার বিকল্প নেই। যদিও সত্যেন বসু বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষার ওপর জোর দিতেন, কিন্তু তাঁর শুধু ইংরেজিতেই নয়, ইউরোপের অন্য দু-একটি ভাষায়ও বেশ দখল ছিল। কোনো সাধারণ বিষয়ে, যেমন সাহিত্য, রাজনীতি অথবা সমাজতত্ত্বে, একটি বই, প্রবন্ধ অথবা আলোচনায় কোনো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করার পেছনে যুক্তি আছে। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ অথবা বইতে বাংলা পরিভাষার সঙ্গে সংশিষ্ট ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করার যুক্তি আমি দেখি না। বরঞ্চ ছোটদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক বইগুলোতে বাংলা পরিভাষার সাথে ইংরেজি প্রতিশব্দগুলো দিলে পরবর্তীকালে উচ্চ পর্যায়ে এটা বেশ কাজে লাগতে পারে।

বিজ্ঞানশিক্ষার মান-উন্নয়নের অনেকগুলো দিক আছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বেতনের স্কেল ভালো হলে, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ এবং অন্যান্য অবস্থার উন্নতি হলে, এ কাজে উচ্চতর মানের বিজ্ঞানশিক্ষকেরা আকৃষ্ট হবেন, এবং

তাঁদের বর্তমানে যতটা গৃহশিক্ষকতা করতে হয় তার প্রয়োজন হবে না। একই সঙ্গে এদেশেই এই শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন কারণে সবার জন্য পিএইচ.ডি করা সম্ভব নয়। কিন্তু এম.ফিল ডিগ্রি নেওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব এবং এতে এমন কিছু গবেষণা কাজ হয় যা পরবর্তীকালে শিক্ষকদেরকে স্বাধীনভাবে পড়াশুনা করতে এবং সেই সঙ্গে তাঁদের শিক্ষকতার মান উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। এর প্রভাব মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় পড়বে বলে আমার বিশ্বাস। তাছাড়া আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এম.ফিল ডিগ্রির ব্যবস্থা করা তত কঠিন নয়, বরং এ ব্যবস্থা গবেষণার মানও উন্নত করে। এম.ফিল ডিগ্রি কিছুটা প্রচলিত আছে ; এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ ব্যাপারে আরও উদ্যোগ নিতে পারেন। আমাদের ব্যবসায়ীমহলও উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করে এই বিষয়ে (এবং বিজ্ঞানশিক্ষার অন্যান্য বিষয়েও) উদ্যোগ নিতে পারেন।

আমাদের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এক্ষেত্রে বিরাট একটি অবিচার চলছে এবং এতে দেশের ক্ষতি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমি গত শতাব্দীর একজন প্রতিভাবান গণিতবিদের অত্যন্ত বেদনাদায়ক কাহিনী আপনাদেরকে বলি। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের গণিতজ্ঞ এভারিস্ট গ্যালোয়া যিনি ১৮১১ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং একুশ বছর বয়সে একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা যান। তিনি তখনকার বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একোল্ পলিটেকনিকে ভর্তি হতে অক্ষম হন এবং অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেও রাজনৈতিক কারণে বহিষ্কৃত হন। তাঁর প্রতিভা কেউ বুঝতে পারেনি ; এমনকি ফরাসি একাডেমি তাঁর প্রবন্ধ প্রত্যাখ্যান করে। এই সব হতাশার কারণে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে যান। তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা এবং আচরণ প্রতিক্রিয়াশীল মহল সহ্য করতে না পারার কারণে তিনি একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা যান। সকালে মারা যাবার আগের রাত্রে তিনি একষট্টি পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ লিখে রেখে যান। এই প্রবন্ধটি পরে ঘটনাক্রমে আবিষ্কৃত হয়। এটি গণিতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম অবদানের মধ্যে গণ্য। এই একুশ বছর বয়সের তরুণের একষট্টি পৃষ্ঠার প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে এখনও প্রায় একশত ষাট বছর পরেও, বিশিষ্ট গণিতবিদেরা প্রবন্ধ এবং বই লিখছেন। এমন অসাধারণ প্রতিভার এমন অবহেলার উদাহরণ আর বোধহয় নেই। এটা অবশ্য একটা চরম উদাহরণ, এবং গ্যালোয়ার প্রতিভাও অত্যন্ত বিরল। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী অবহেলিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয় এবং সমাজ তাদেরকে হারিয়ে ফেলে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে, সে দরিদ্র হোক বা ধনী, আমাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের বিকাশের সুব্যবস্থা করতে হবে।

দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা দেশের বৃহত্তর দারিদ্র্যের সমস্যার একটি অংশ। প্রায় আশি বছর আগে দারিদ্র্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কথা লিখেছিলেন, সেটি এই উপমহাদেশে আজও প্রযোজ্য :

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

এটা সর্বসম্মত যে, এদেশে দারিদ্র্য একটি বিপুল সমস্যা। তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যের সমস্যা নিয়ে বহু অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ মাথা ঘামিয়েছেন। সুইডেনের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল তাঁর বিশাল 'এশিয়ান ড্রামা' পুস্তকে এই সমস্যার বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে অত্যন্ত সীমিত গণ্ডীতে দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই। প্রায়ই বলা হয় যে আমাদের সীমিত সম্পদ আমাদের দারিদ্র্যের কারণ। এ কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু যে মূল কথাটা আমি বলতে চাই, সেটা হল, যদি ব্যক্তিগতভাবে এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা উদ্যোগ নেই, তাহলে আমাদের বর্তমান সম্পদেই অন্ততপক্ষে দরিদ্রতম শ্রেণির অনেকটা উন্নতি করা সম্ভব। বেশ কয়েকটি দুর্ভিক্ষের কারণ বিশেষণে দেখা গেছে যে খাদ্যের অভাব অনেক ক্ষেত্রে প্রধান কারণ নয়, মূল কারণটি হল খাদ্য সরবরাহের সুব্যবস্থার অভাব। যখন অভাব একটি মাত্রা অতিক্রম করে, সেটাকে আমরা দুর্ভিক্ষ বলি। কম পরিমাণে অভাব অনেক ক্ষেত্রে এবং অনেক অঞ্চলেই থাকে। এখানে একটি পদক্ষেপ কাজে লাগতে পারে, সেটা হল সবসময় খবর রাখা সারা দেশের কোনো অঞ্চলে, অথবা কোনো গোষ্ঠীতে অতিরিক্ত অভাবের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এবং অভাবের মাত্রাটা যেন একটি ন্যূনতম পরিমাণের নিচে না যায়, সেটার ব্যবস্থা করা। আমার ধারণা যে দেশে বহু বিত্তবান ব্যক্তি আছেন এবং ব্যবসায়ী এবং অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে যাঁরা এ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দিতে এগিয়ে আসবেন। যদি তাঁদের সঠিকভাবে অবহিত করা হয় যে অভাবের মাত্রাটি কোথায় দাঁড়িয়েছে তাহলে তাঁদের পক্ষে সত্যি সত্যি কিছু করা সম্ভব হতে পারে। খাদ্যের অভাব ছাড়াও সুচিকিৎসার অভাব একইভাবে দারিদ্র্যের কারণ এবং ফলাফল দুই-ই। অনুরূপভাবে আমরা চেষ্টা করতে পারি যেন কোথাও সু-চিকিৎসার অভাব ন্যূনতম পর্যায়ের নিচে না যায়। আমরা জানি যে, বিভিন্ন হাসপাতালে দরিদ্র রোগীদের ওষুধপত্র কিনতে অসুবিধা হয়। যাঁরা দূর থেকে আসেন, তাঁদের আত্মীয়স্বজনকে সাথে আসতে হয়, এতে আসা-যাওয়ার খরচ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ব্যয় বেড়ে যায় যা দরিদ্র শ্রেণির জন্য মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, সমাজসেবকরা ওয়ার্ডে গিয়ে সেবামূলক সহায়তা দিতে পারেন। সঠিকভাবে উদ্যোগ নিলে এখানেও আমাদের বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসতে রাজি হবেন। দারিদ্র্যের আর একটি দিক হল গ্রামাঞ্চলের দুরবস্থা। শোনা যায় যে গ্রামে যাঁরা একটু অবস্থাপন্ন হয়ে যান, তাঁরা

শহরে চলে যান, কারণ গ্রামে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার সঠিক ব্যবস্থা নেই, এমনকি নিরাপত্তারও সমস্যা আছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটছে। কিন্তু অবস্থাপন্ন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই তো সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রামে সুযোগসুবিধার উন্নতি ঘটাতে পারেন। এটা একটা 'ভিশ্যাস সার্কল' বা বিষচক্র। অথচ গ্রামাঞ্চলে অন্য ধরনের সুবিধা রয়েছে, যেমন জমির প্রাচুর্য, দূষণমুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি। এসব সমস্যা একাধিক নির্দলীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা যায়। অবশ্য উদ্যোগ যে নেওয়া হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু আরও নেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন বিদেশি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে সাহায্য করছেন। তাঁদের প্রতি আমরা খুবই কৃতজ্ঞ, কিন্তু এই কাজগুলো আমাদের নিজেদেরই করা উচিত। এই প্রসঙ্গে একটি দুঃখজনক প্রবণতার কথা বলতে হয়, যেটা সবার জানা, তা হল এই যে, একটি ভালো কাজ করবার জন্য বেশ আয়োজন করে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, কিন্তু কিছুদিন পরে সেখানে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, এবং মূল উদ্দেশ্যটি ভুলে আমরা কতগুলো তুচ্ছ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব-বিবাদে জড়িত হয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া, ঘুরে মরি পলে পলে।" একটি দেশ পরিবারের মতো সমন্বয়ের মনোভাব নিয়ে প্রত্যেকটি পেশার সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদেরকে এগোতে হবে, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাধ্যমে কোনো সমস্যা সঠিকভাবে সমাধান হয় না।

যদিও দেশের বর্তমান সম্পদ দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, তবুও আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করা অবশ্যই প্রয়োজন। এ কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহায়তা করতে পারে। মৎস্যচাষ, বস্ত্রশিল্প, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। ধরে নেওয়া ভালো যে, সব ধরনের প্রযুক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, এবং তার প্রয়োজনও নেই। সম্ভবত আমাদের জন্য হালকা শিল্পই বেশি উপযুক্ত, যেমন ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য মাইক্রো শিল্প। ইলেকট্রনিকসের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের সূক্ষ্ম কাজগুলোতে আমাদের মহিলাকর্মীরা অবদান রাখতে পারেন, যেমন পোশাকশিল্পে তাঁরা করছেন। এতে শুধু নারী সমাজেরই নয়, দেশের সার্বিক উন্নতি হবে। মাঝে মাঝে কয়েকটি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের দ্রুত শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। যদিও আমরা তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি, তবুও আমার মনে হয় না এই দেশগুলোকে আমাদের 'মডেল' হিসেবে নেওয়া উচিত। আমাদের জনসংখ্যা এই দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি এবং আমাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি ভিন্ন ধরনের। আমাদের দেশের শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল আমাদের জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি করা উচিত। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে দারিদ্র্যের মাত্রা বেশি হলে অথবা দেশের পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে অনেকে ভিন্ন জীবনধারা মেনে নিতে রাজি হবেন। যাঁরা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁরা হয়তো এই কারণেই গেছেন।

১৯৯০ সনের শেষের দিকে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা প্রসঙ্গে আমি ও আমার স্ত্রী একটি পত্রিকায় লিখেছিলাম, "প্রত্যেকটি ধর্ম শান্তির বাণী বয়ে আনে। একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনও অন্য ধর্মের প্রতি হিংস্রতা দেখাতে পারেন না। যে ব্যক্তি হিংস্রতা পোষণ করেন, তিনি নিজের ধর্মের মূলে আঘাত করেন। অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধা প্রকৃত ধর্মের এবং মানবতার লক্ষণ। এই সহিষ্ণুতা দেয় সমাজকে স্থিতিশীলতা এবং শান্তি। ..... হিন্দু-মুসলমানে বিরোধিতা আমাদের উপমহাদেশে একটি অভিশাপ স্বরূপ বিরাজমান রয়েছে। যতদিন-না আমরা পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু এবং শ্রদ্ধাশীল হতে শিখব ততদিন উপমহাদেশে শান্তি আসবে না।" এই প্রসঙ্গে পুনরায় আমি কিছু বলতে চাই, কারণ এটা উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে আমি মনে করি। উপমহাদেশে শান্তি আনতে হলে এই অঞ্চলের সব দেশকেই সুদূরপ্রসারী চিন্তা করতে হবে এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। আমার বিশ্বাস এতে বাংলাদেশ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে আমরা দুই মহান সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করছি, প্রাচীন ভারত এবং ইসলামে। আমাদের ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে জড়িত। এ ভাষার অন্যতম ব্যাখ্যাকার পাণিনি। পাণিনির ব্যাকরণ রচিত হয় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এবং এটি সেই সময়ের অসাধারণ রচনার মধ্যে অন্যতম রূপে গণ্য। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবনধারা এই দুটি সভ্যতার সমন্বয়ে গঠিত এবং এদের প্রভাব পরস্পরের সম্পূরক। ইসলামের সভ্যতা সম্পর্কে উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লিখেছেন : "আমি জিজ্ঞেস করি, পৃথিবীটা কেমন হত, আধুনিক সভ্যতা কোথায় যেত, যখন ইউরোপের ক্ল্যাসিক জগৎ বর্বরদের আক্রমণে অন্ধকারের অতল গহ্বরে অমোচনীয় হতাশায় ডুবেছিল, যদি-না ইসলাম সেই পতন রোধে এগিয়ে আসত, এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেই ক্ল্যাসিক জ্ঞানের বীজগুলোর সত্য এবং মুক্তির প্রাণদায়ী পরিবেশের বিকাশ না ঘটাত।" এই কথাগুলো ১৯২৩ সনে আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন। তিনি আরও বলেন, "আমার এশীয় মন গর্বে এবং আনন্দে ফুলে ওঠে যখন সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের বিজয়ের কথা মনে করি।" এই ভাষণে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে এবং উপমহাদেশে ইসলামের বিভিন্ন অবদানের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। ১৯৩৮ সনে পবিত্র হাদিসের কতগুলো বাণীর একটি সংকলণ প্রকাশিত হয়, যেটার সূচনায় মহাত্মা গান্ধী বলেন যে বাণীগুলো মানবজাতির ঐশ্বর্যের মধ্যে গণ্য। এই বাণীতে নম্রতা, ভদ্রতা এবং উদারতা লক্ষণীয়। আলামা সোহরাওয়ার্দী ১৯০৫ সনে এটার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। শোনা গেছে যে যখন টলস্টয় মারা যান (১৯১০ সনে) এই বইটি তাঁর পকেটে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করা যায় রবীন্দ্রনাথের শতাব্দীর গোড়ায় রচিত কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি:

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন-
শকহুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
... ...
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।"

বিভিন্ন কারণে উপমহাদেশটি বিভক্ত হল। এটার ভালোমন্দ বিশেষণ করে লাভ নেই ; এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। এই নতুন বাস্তবতায় এবং অনেকটা ব্যাপ্ত অর্থে প্রফুলচন্দ্র রায় ও রবীন্দ্রনাথ যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন সেটা উপমহাদেশবাসী সকল মানুষের জন্যে প্রযোজ্য এবং অর্থবহ। উপমহাদেশের দেশগুলোর নিজ নিজ সার্বভৌমত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে শ্রদ্ধাশীল, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমাদের ভাষাসমূহ, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস এবং ব্যক্তি ও সমাজমানস পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। আপনাদের অনেকের হয়তো অভিজ্ঞতা হয়েছে, বিদেশে যখন উপমহাদেশের ভিন্ন দেশের ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন ভাষা-ধর্ম নির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যেও এর প্রতিফলন হওয়া প্রয়োজন– সার্কের চেতনায় যার সুযোগ রয়েছে। যদি আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিই, তাহলে উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে আমরা সেতুস্বরূপ হতে পারি– এই দেশগুলো এবং ইসলামি দেশসমূহের মধ্যেও।

আমাদের উপরোলিখিত দুটি দিকের ঐতিহ্য থেকে আমরা কিছু 'নীরব অনুপ্রেরণা' নিতে পারি। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের এমন ঐতিহ্যের সৌভাগ্য নেই। আমার মনে হয় তাঁদের জন্য এতে বিশেষ কিছু আসে-যায় না। তখন দেশ ও সংস্কৃতি গড়ে তুলবার পূর্ণাঙ্গ চ্যালেঞ্জ থাকে, যেটাকে একটি অভিযানস্বরূপ দেখা যায়। আমাদেরকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে, বাইরের আলো-বাতাস দেশে আনতে হবে। এ-ব্যাপারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিছুটা পথ দেখাতে পারে। ১৯৪০ সনে কাজী নজরুল ইসলাম এক বক্তৃতায় বলেন, "এই সৃষ্টির সকল কিছুকে বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাকে উপভোগ করতে হবে। এই জন্যই শ্রদ্ধা হয় এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের প্রতি। তাঁরা চেয়েছেন সৃষ্টি রহস্য– আবিষ্কার করতে। কী দুর্জয় তাঁদের প্রতিজ্ঞা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। সকল বিশ্বকে সকল সৃষ্টিকে জানব, বুঝব ও উপলব্ধি করব– এই আত্মবিশ্বাস আমাদের তরুণদের জীবনে রূপায়িত হোক। ..... আলাহ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। প্রকাণ্ড তাঁর সৃষ্টি। সে সৃষ্টির পশ্চাদভূমিতেই জন্ম নিয়েছে চন্দ্র-সূর্য-তারকা সৃষ্টির ঐশ্বর্য। এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের

সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এজন্য চাই সেই মুক্ত ও বিরাট জীবন।" কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে আরও দু' একটা কথা বলি। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর স্পর্ধা যার চরম উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাতে :

"বল বীর, বল উন্নত মম শির,
শির নেহারি' আমারি নত-শির
ওই শিখর হিমাদ্রির।"

এই স্পর্ধা এবং বিগত সময়ের লাঞ্ছনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে:

"মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে
ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে
রণিবে না—"

একই সঙ্গে তাঁর মনে জেগেছে নিজের এবং বাঙালির সম্ভাবনা সম্বন্ধে চেতনা:

"আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া
গিয়াছে সব বাঁধ।"

এই স্পর্ধা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রকাশিত হয়েছিল ত্রিশ দশকের গোড়ায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে এবং একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে। আমাদের সচেতন হতে হবে, এই স্পর্ধা যেন অহংকার এবং ধৃষ্টতায় পরিণত না হয় ; যার ইঙ্গিত আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখছি। আর নিজের ওপর যে আস্থা কাজী নজরুল ইসলাম এবং শহীদরা দেখিয়েছিলেন, সেটাও আমরা যেন হারিয়ে না ফেলি। স্বাধীনতাকে দেশের চেয়ে বেশি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা, রাতারাতি সাফল্য অর্জন করার প্রবণতা, পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস, বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরতা, এগুলো নিজের উপর আস্থার অভাবের লক্ষণ। আমাদেরকে আরও বুঝতে হবে যে, আলোচনা এবং বক্তৃতা যথেষ্ট নয়। দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, যাকে ইংরেজিতে বলে 'ব্যাক-ব্রেকিং ওয়ার্ক'। আর আমাদের এই অপূর্ব সুন্দর বাংলা ভাষা, এটাকে প্রকৃত অর্থে দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করতে হবে, এটাকে শোগানে পরিণত করে এর অপব্যবহার আমরা যেন না করি।

ভাষা এবং সংস্কৃতির বিকাশ যে কোনো সভ্যতার অপরিহার্য অংশ। ইউরোপীয় ভাষাসমূহ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে 'জুডেও-খ্রিস্টিয়ান' সভ্যতা, যেটা প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে (মধ্যযুগে কিছু বিচ্ছিন্নতা ব্যতীত) তার খ্রিস্ট-পূর্ব 'গ্রিকো-রোমান' উৎস থেকে চলে এসেছে; যেখানে ইসলামের সভ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ

অবদান রেখেছে। সম্ভবত এটি জগতের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা। এই সভ্যতাটিকে উদাহরণস্বরূপ রেখে আমি সভ্যতার বিবর্তন সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে চাই। সক্রেটিস, পেটো, অ্যারিস্টট্‌ল, লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেলেঞ্জেলো, দান্তে, শেক্সপিয়র, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন প্রমুখ এই বিস্তারিত সভ্যতার সদস্য ছিলেন, এবং একে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্যে, দর্শনে, চারুকলায়, সঙ্গীতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এই সভ্যতার অবদান প্রায় অতুলনীয়। কিন্তু একই সঙ্গে, এই সভ্যতার অন্তর্গত দেশগুলোই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, যেখানে অনেক ক্ষেত্রে তারা চরম বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে। মূলত এ দেশগুলোর পরস্পরের বিবাদের কারণেই এই শতাব্দীতে দুইবার সমগ্র বিশ্ব মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, যার পরিণাম হয়েছে অসংখ্য নিরীহ লোকের দুঃখ ও কষ্ট। এই সভ্যতাই আণবিক বোমা তৈরি করেছে। যেটা এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে, এখন এর দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করা যায়। এই সভ্যতাটি যে অশুভ সে কথা আমি বলছি না; বরঞ্চ আমার ধারণা প্রত্যেকটি সভ্যতার দুটি দিক আছে, শুভ এবং অশুভ। যে কোনো সভ্যতা কিছুটা যেন একটি জীবের মতো, যাকে ইংরেজিতে 'অরগ্যানিজ্‌ম' বলা হয়। বাংলায় এটার সঠিক প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন; অভিধানে বলা হয় 'সমস্ত অঙ্গ লইয়া সক্রিয় কিছু (যেমন, প্রতিষ্ঠান বা সৃষ্টি)'। এটার একটা মোটামুটি 'মডেল' চিন্তা করা যায়, যেটাকে কিছু বিকৃতি ঘটতে পারে, কিন্তু কিছু বাস্তবতা থাকবে। এটার প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি অথবা একাধিক মতবাদ, ধার্মিক অথবা দার্শনিক। বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিবর্গ এর সঙ্গে জড়িত থাকেন। কিছু ব্যক্তি মতবাদগুলোকে বিশুদ্ধ এবং বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। এক ধরনের ব্যক্তিবর্গ সাধু ধরনের, যাঁরা সমাজে সহনশীলতা, সৌহার্দ্য এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করেন। আরও রয়েছেন আইনকানুন-রক্ষাকারী, ব্যবসায়ী মহল, বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, সামরিক বাহিনী ইত্যাদি। এগুলোর আবির্ভাব কোনো সভ্যতার বিবর্তনে অত্যন্ত স্বাভাবিক, এতে অশুভ কিছু নেই। কিন্ত কোনো ক্ষেত্রে, যখন সভ্যতাটি একটু উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে, সেই সভ্যতার কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি হয়। তাঁরা মনে করতে আরম্ভ করেন যে, তাদের মতবাদ অথবা ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতিও সর্বশ্রেষ্ঠ। অনেকে আবার ভালো মনেই চিন্তা করেন যে, অন্যান্য অনুন্নত জাতিগুলোকে তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি ও মতবাদ দ্বারা সভ্য করে তুলবেন। যদি এই ধরনের দুই সভ্যতার মোকাবেলা এবং অবশেষে সংঘর্ষ হয়, তখন দুই দিকের মতাদর্শ, সংস্কৃতি ও জীবনধারার যে সুন্দর দিকগুলো আছে, সেগুলো নেপথ্যে চলে যায়, বেরিয়ে আসে বর্বরতা। আগের কালে এই ধরনের মোকাবেলার সমাধান হয়েছে একপক্ষের পরাজয়ের মধ্যে। আধুনিক জগতে এমন একটি বৃহৎ সংঘর্ষের কারণে মানবজাতি বিলুপ্ত হতে পারে। এটা এড়ানোর জন্য প্রয়োজন সভ্যতার বিবর্তন এবং একাধিক সভ্যতার মোকাবেলার কারণ বিশে-

ষণ করা। সম্ভবত এই ধরনের মোকাবেলা এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষের কথা চিন্তা করেই যুগে যুগে মুনিঋষিরা, মহাপুরুষেরা বলে এসেছেন সহনশীলতা ও ভালোবাসার কথা, প্রতিবাদ করেছেন অবিচারের বিরুদ্ধে। এই ধরনের বাণী 'জুডেও-খ্রিস্টিয়ান' সভ্যতায়ও অনেকে দিয়েছেন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ সহনশীলতা এবং শান্তির বাণী দিয়ে গেছেন। সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ডের আগে শিষ্যরা তাঁর পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে তিনি রাজি হননি, যদিও সেই মৃত্যুদণ্ডটিকে তিনি ভুল বিবেচনা করেছিলেন, কারণ সেই আদালতটি তৎকালীন এথেন্সের নিয়মানুযায়ী গঠিত হয়েছিল, সেটার রায় তিনি অমান্য করতে চাননি। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে যখন অ্যারিস্টট্‌লের বিরুদ্ধে অনুরূপ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়, তিনি এথেন্স ত্যাগ করে চলে যান ; বলা হয় তিনি এথেন্সবাসীদেরকে দ্বিতীয় বার সত্যের বিরুদ্ধে পাপ করার অবকাশ দিতে চাননি। বিভিন্ন ধর্মে এবং দার্শনিক মতাদর্শে, বিভিন্ন রূপে এই ধরনের বাণী দেওয়া হয়েছে। যিশুখ্রিস্ট সহনশীলতা এবং ক্ষমার একটি বিরল দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারীদের সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "এদেরকে ক্ষমা করে দিও, এরা জানে না এরা কী করছে"। ইসলামে বলা হয়, একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির মনে বিন্দুমাত্র অহংকার থাকা উচিত নয়। এই সূত্রে হাফিজের অমর পঙ্‌ক্তি ক'টি স্মরণ করা যায় :

"আজ দম্ সুবহ্ অজল্ তা আখের্ শাম্ অবদ্
দোস্তী ও মহ্‌র্ বর্ য়ক্ অহদ্ ও য়ক্ পায়মান্ বুদ"

অর্থাৎ "সৃষ্টির আদিকালের প্রথম প্রভাতের সূচনা থেকে অনন্তকালের সন্ধ্যার বিদায়লগ্ন পর্যন্ত ভালোবাসা ও প্রীতির বন্ধন একই প্রতিজ্ঞা একই প্রতিশ্রুতিতে অবিচল রয়েছে।" বেথোফেন তাঁর নবম সিম্‌ফনিতে শিলারের কবিতা ব্যবহার করেছেন, সেটার মূল কথা হল মানবজাতির ভ্রাতৃত্ববোধ। মানুষের এবং সভ্যতার যে অশুভ দিক আছে, বেথোফেন সেটার সম্বন্ধেও তাঁর পঞ্চম সিম্‌ফনিতে ভাব ব্যক্ত করেছেন, এবং এটায় আশার ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে"।

আমাদের চারিদিকে প্রাকৃতিক জগৎ কত বিচিত্র। প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগতের এই বৈচিত্র্যও দেয় প্রাকৃতিক জগৎকে সৌন্দর্য এবং স্থিতিশীলতা। অনুরূপভাবে, মানুষের মন ও চরিত্রও বিচিত্র। মানুষের চরিত্রের এবং মনের এই বিচিত্রতা দেয় সমাজকে সৌন্দর্য এবং স্থিতিশীলতা। মানুষের মন ও চরিত্রকে কোনো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, ধার্মিক অথবা দার্শনিক মতবাদের কাঠামোতে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। যদি বলপূর্বক সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়, তবে তার পরিণাম হয় অত্যন্ত দুঃখজনক।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাপক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব সর্বত্র চোখে পড়ে। কিন্তু আধুনিক মানুষের চিন্তা এবং চেতনায় এর যে গভীর প্রভাব ঘটেছে, সেটার বিস্তার বিজ্ঞানীরাও সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেন না। শিল্পকলায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চারুকলায়, জীবনের বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং চেতনা যেমন আগেরকালে ছিল, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন তথ্য, তত্ত্ব এবং প্রয়োগের কারণে আধুনিক মানসে তার বহুল বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে। একজন বিশিষ্ট কবির মানসে এর প্রভাব কেমন হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষের সূক্ষ্ম আবেগগুলো, যেমন ভালোবাসা ও সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় ভাষায় অনেক কিছু লিখেছেন, যেমন :

"জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।"

অথবা "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।" শেষ জীবনে তাঁর মনে কিছুটা বিষাদ ও নৈরাশ্যের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। আবু সয়ীদ আইয়ুব এ সম্পর্কে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। এই বিষাদের কারণ কিছুটা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রলয়কাণ্ড এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগমনের ইঙ্গিত। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন। তাঁর 'বিশ্ব পরিচয়' এই পর্বেই লেখা। সারাজীবন তিনি মানবজাতির প্রগতির কথা চিন্তা করেছিলেন, যেন মানবজাতি কোনো একটি অজানা আদর্শের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের বিস্তারিত পড়াশুনার পর হয়তো ক্রমশ তিনি এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হলেন যে মানবজাতি অবশেষে ধ্বংস হতে পারে। তিনি লেখেন :

"আজ ভাবি মনে মনে, মরীচিকা-অন্বেষণে–
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই– মনে ভয় লাগে সেই
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে"।

এই সূত্রে বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব অনুসারে বিশ্বের ভবিষ্যৎ ও পরিণতি সম্বন্ধে কিছু বলব। একটি আণবিক মহাযুদ্ধের কারণে মানবজাতি বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু এমন যুদ্ধ অথবা অন্য সামাজিক কারণ না থাকলেও বিশ্বের বিবর্তনে মানবজাতি যে অনির্দিষ্টকালের জন্য বেঁচে থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের সূর্য ও পৃথিবী একটি নীহারিকাতে অবস্থিত, যেটাকে ছায়াপথ বলে। একটি নীহারিকাতে সূর্যের মতো গড়ে প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র থাকে। ছায়াপথের বাইরে অগণ্য নীহারিকা আছে। এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকে মার্কিন জ্যোতির্বিদ ই.পি. হাব্‌ল্ আবিষ্কার করেন যে নীহারিকাগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটাকে বিশ্বের সম্প্রসারণ বলে। অনুমান করা হয় প্রায় এক থেকে দুই হাজার কোটি বছর আগে বিশ্বব্যাপী একটি মহাবিস্ফোরণ ঘটে যখন বিশ্বের বস্তুসমূহ প্রচণ্ড বেগে চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হয়। বিশ্বের বর্তমান সম্প্রসারণ এই মহাবিস্ফোরণের

জের মাত্র। সম্প্রসারণটি ভবিষ্যতে সর্বদা চলবে, না সম্প্রসারণ থেমে সংকোচন ঘটবে, তা সঠিকভাবে জানা নেই ; এটি বিশ্বতত্ত্বের অন্যতম সমস্যা। যদি সম্প্রসারণ সর্বদা বজায় থাকে তাহলে সমগ্র বিশ্ব ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে থাকবে, অবশেষে সব নক্ষত্রই তাদের আলো হারিয়ে অন্ধকার হয়ে যাবে। আমাদের সূর্য প্রায় হাজার কোটি বছরের মধ্যে নিভে যাবে। অবশেষে সব নীহারিকা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন এবং বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটা ঘটতে চিন্তাতীত, কল্পনাতীত সময় লাগবে। যদি আমরা 'কোটি' শব্দটি পনের বার বলি, তাতে যে সংখ্যাটি দাঁড়াবে, নীহারিকাগুলো বিলুপ্ত হতে তত বছর লাগবে। ভবিষ্যতে মানবজাতির অচিন্ত্যনীয় বিবর্তন ও পরিবর্তন হতে পারে। আগেই বলেছি, মানবজাতি যে সর্বদা বেঁচে থাকবে এটার নিশ্চয়তা নেই। পক্ষান্তরে, যদি সম্প্রসারণ থেমে সংকোচন হয়, তাহলে অবশেষে মহাবিস্ফোরণের উল্টো প্রক্রিয়া, মহাসংকোচন হবে– যেন মহাবিস্ফোরণের একটি চলচ্চিত্র নিয়ে সেটাকে বিপরীত দিকে চালানো হচ্ছে। সেই মহাসংকোচনে বিশ্বপ্রকৃতির ভয়াবহ চূড়ান্ত অগ্নিকাণ্ডের লীলাখেলা এবং তাণ্ডবনৃত্যে কোনো প্রকার প্রাণীর বেঁচে থাকার খুব কমই সম্ভাবনা থাকবে। তারপরে কী হবে, এই পরের কথা আদৌ বলা যায় কিনা, সেটা কারও জানা নেই। অবশ্য মহাসংকোচন হতে, আদৌ যদি হয়, অন্ততপক্ষে ত্রিশ-চলিশ হাজার কোটি বছর লাগবে। আমাদের এ বিষয়ে চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই।

এটা আশ্চর্যজনক এবং রহস্যজনক বিষয় যে যদিও একদিন মানবজাতির অবসান ঘটতে পারে, এই নিরেট এবং আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ঠুর জড়প্রকৃতি থেকেই কিন্তু উদ্ভব হয়েছে উদ্ভিদজগৎ, প্রাণিজগৎ এবং মানবজাতির। প্রকৃতিতে, মানুষের চরিত্রে, সভ্যতার সৃষ্টিতে, যেমন চারুকলা, সঙ্গীত এবং সাহিত্যে, কত সৌন্দর্য রয়েছে। বিশ্বের সম্ভাব্য ভাবী ধ্বংসের চিন্তা এই সুন্দরকে আরও সুন্দর ও উপভোগ্য করে তোলে। দুঃখ ও কষ্ট অবশ্যই আছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা অনেকাংশে এড়ানো যায় এবং তার দায়িত্ব মানুষেরই।

আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে এর আরও চর্চা প্রয়োজন। আমার মনে হয় না বিদেশি ভাষার শিক্ষায় বাধা দিয়ে বিশেষ লাভ হবে কারণ বিভিন্ন বিদেশি ভাষার প্রচলন হয় বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী, এবং এগুলো আমাদের ভাষাকে এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারে। আমাদের ভাষার উন্নতি হবে যদি আমরা এতে কবিতা লিখি, গান করি, প্রবন্ধ লিখি, এতে আলোচনা করি, এবং ব্যাপকভাবে একে ব্যবহার করি। একুশের এবং বাংলা একাডেমীর বিভিন্ন কর্মসূচি এতে অবশ্যই অবদান রেখেছে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরও ব্যাপকভাবে রাখবে। সত্যেন বসু লিখেছিলেন, "যাঁরা শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করবেন তাঁদের সারাজীবন চেষ্টা করা দরকার মনের সমস্ত কথা কী করে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা যায়।" আমার সীমিত জ্ঞানের পরিধিতে কতকগুলো ধারণা বাংলায় ব্যক্ত করার এই সামান্য প্রচেষ্টা– এটাই

হল বাংলা ভাষার প্রতি এবং বায়ান্নর ও একাত্তরের শহীদদের স্মরণে আমার আন্তরিক ও বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি ।

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা? বিশ্বের ভাণ্ডারী
শুধিবে না এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?"

কিছুটা দিনের আলো দেখা দিয়েছে । আমি আশাবাদী । আমার বিশ্বাস রাত্রির তপস্যা অবশেষে দিনের উজ্জ্বল আলো বয়ে আনবে ।

অন্য ভাষার সাহিত্য / প্রবন্ধ

ফ্রানৎস কাফকা: ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য

.....

মাসরুর আরেফিন

ব্যক্তিগত জীবন ও কাফকা-সাহিত্যে যৌন অনুষঙ্গ

কাফকার যৌনজীবন ছিল বেশ সক্রিয় । ম্যাক্স ব্রডের ভাষায়, কাফকা যৌনকামনার হাতে 'উৎপীড়িত' হতেন । কাফকার অন্যতম প্রধান জীবনীকার রাইনার স্টাখের মতে, কাফকা জীবনভর 'অবিরাম মেয়েদের পেছনে ছুটেছেন', আর তাঁর মধ্যে সবসময় কাজ করত 'বিছানায় ব্যর্থ হওয়ার ভয় ।' কাফকা অনেকবার পতিতাসংসর্গ করেছেন; আর পর্নোগ্রাফিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল । তাঁর জীবনে প্রেম এসেছে মোট ছয় বার – একেকবার একেক রূপে ।

কাফকার ডায়েরি ও চিঠিগুলো পড়লে এরকম মনে হয় যে, বিয়ে করাকে তিনি জীবনের মুখ্যতম ব্যাপার বলে ভাবতেন ।

বিয়ে করা, পরিবার গড়ে তোলা, যতগুলো সন্তান ঘরে আসে তাদের গ্রহণ করা, এই
অনিশ্চিত পৃথিবীতে তাদের পাশে দাঁড়ানো, এমনকি অল্পস্বল্প পথ দেখানো, আমার হিসেবে
এই-ই হচ্ছে মানুষের পক্ষে অর্জনযোগ্য সবচেয়ে বড় সফলতা।

*বাবাকে লেখা চিঠি*তে কাফকার এই ঘোষণা তিনি নিজের জীবনে বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি কোনোদিন। তাঁর সঙ্গিনী নির্বাচনে সবসময়ই সমস্যা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল বিয়ে করে সংসার শুরু করলে, ঘরে সন্তান এলে, সাহিত্যচর্চায় ব্যাঘাত ঘটবে – এই ভয়।

কাফকার প্রথম প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ারের কথা বলা যাক। বন্ধু ম্যাক্স ব্রডের বাসায় ১৯১৩ সালের ১৩ আগস্ট কাফকার সঙ্গে ফেলিসের দেখা হয়। ফেলিস বয়সে ছিলেন তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোট এক বুদ্ধিদীপ্ত, অল্পবিস্তর পড়ালেখা করা, অনাকর্ষণীয় চেহারার, ভালো চাকরি-করা বার্লিনের মেয়ে। কাফকা তাঁকে ভক্তি করতেন, কিন্তু তাঁর প্রতি কামনা-বাসনা বোধ করতেন না। ১৯১৫ সালে ফেলিসের সঙ্গে সময় কাটানোর পরে কাফকা ডায়েরিতে লেখেন: 'চিঠির ভুবনে ছাড়া বাস্তবে আমি কখনো ফেলিসের সঙ্গে সম্পর্কের সেই মধুরতাটুকু অনুভব করিনি, যেটা মানুষ প্রেমিকার সঙ্গে করে; তাঁর প্রতি আমার শুধু অসীম ভক্তি।' এই স্মার্ট ও আত্মবিশ্বাসী ফেলিসের সঙ্গে কাফকার যখন বিয়ের কথা শুরু হয়, তিনি বোধ হয় নিজের অসম্পূর্ণতাগুলো নিয়ে ভয় পেয়ে যান, সঙ্গে তো সাহিত্য ও বিয়ের মধ্যেকার বৈসাদৃশ্য ঘিরে দুশ্চিন্তা এবং নিজের জীবনে বাবার সংসারেরই পুনরাবৃত্তি ঘটানোর ভয় ছিলই। ফেলিস তাঁকে নিয়ে বাসার আসবাব কিনতে গেলে, কাফকার কাছে সেগুলো মনে হয় 'কবরফলক'; আর ফেলিস যখন বলেন যে তাঁদের দুজনের বাসায় থাকবে তাঁর (ফেলিসের) পছন্দের ছোঁয়া, কাফকার কাছে খুব অসহ্য লাগে কথাটা। ফেলিসের সঙ্গে বাগ্‌দানের অনুষ্ঠানে কাফকার নিজেকে মনে হয় 'কোনো আসামির মতো হাত-পা বাঁধা'। ফেলিসকে লেখা ৫০০ চিঠির মধ্যে (*খবঃঃবৎং ঃড় ঋবষরপব* নামে কাফকার বেস্টসেলার বইটি বাজারে সহজলভ্য) আমরা পাই কাফকার মানসিক ও আবেগগত চাহিদার এক রক্তাক্ত ছবি; ফেলিসের জীবনযাপনের প্রতিটি খুঁটিনাটি জানতে চাওয়ার মধ্যে আমরা দেখি হবু বধূর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কলাকৌশল-আঁটা এক চতুর কাফকাকে, আর সবচেয়ে বেশি দেখি দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতার এক প্রগাঢ় অভাব। ফেলিসের চিঠিগুলো যদিও পাওয়া যায়নি, তবু এটুকু নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়, তিনি কাফকা নামের ৬ ফুট লম্বা, সুদর্শন ও আকর্ষণীয় যুবকের খামখেয়ালি, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও তাঁর প্রতি অবিশ্বস্ততার কারণে মানসিকভাবে যথেষ্ট বিরক্ত ছিলেন। ১৯১৪-র ১২ জুলাই ফেলিস নিজেই

তাঁদের প্রথম বাগ্‌দান ভেঙে দেন; পরে অবশ্য তাঁরা আবার যোগাযোগ শুরু করেন – দ্বিতীয়বারের মতো বাগ্‌দান হয় ১৯১৭-র জুলাইতে, পরে সে-বছরেরই ডিসেম্বরে এটিও ভেঙে যায়।

ফেলিসের সঙ্গে সম্পর্ক চলাকালীন কাফকা গোপনে ফেলিসের প্রিয়তম বান্ধবী গ্রেটে ব্লখের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গ্রেটে বার্লিনেরই এক ইহুদি পরিবারের মেয়ে। ম্যাক্স ব্রড দাবি করেন যে গ্রেটের গর্ভে কাফকার একটি পুত্রসন্তান হয়, যার কথা কাফকা কখনো জানতেন না। যদিও সবচেয়ে বিখ্যাত দুই কাফকা-জীবনীকার পিটার-আন্দ্রে অল্ট ও রাইনার স্টাখের মতে এ দাবি সত্য নয়; গ্রেটের সঙ্গে কাফকার ওরকম ঘনিষ্ঠতা কখনোই হয়ে ওঠেনি। গ্রেটে ও কাফকার মধ্যেকার গোপন সম্পর্কের কথা গ্রেটেই বান্ধবী ফেলিসকে জানিয়ে দেন। ফেলিস গ্রেটেকে লেখা কাফকার চিঠিগুলো পড়ে চরম প্রতারিত বোধ করেন।

১৯২০ সালে, অসুস্থ অবস্থায়ই, কাফকা প্রেমে পড়েন চেক সাংবাদিক ও লেখক, সুন্দরী মিলেনা য়েসেন্স্‌কার। মিলেনাকে লেখা তাঁর চিঠিগুলো *Letters to Milena* নামের আরেক বেস্টসেলিং বই। এই চিঠিগুলো ফেলিসকে লেখা চিঠিগুলো থেকে অনেক বেশি আন্তরিকতা ও উষ্ণতায় ভরা। এঁদের মূল বৈশিষ্ট্য নিরাপত্তাহীনতার বোধ, তাঁর ভীতি ও নিজের প্রতি ঘৃণার অনুভূতি। তিনি নিজেকে তুলনা করেন 'নোংরা বিছানায় শোয়া, মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা এক লোক, যাঁকে দেখতে এসেছে মৃত্যুর ফেরেশতা' হিসেবে। এই দফায় আমরা কাফকার প্রতি তাঁর প্রেমিকার অনুভূতির কথাগুলোও জানতে পারি। ম্যাক্স ব্রডকে লেখা মিলেনার অসংখ্য চিঠির মধ্যে দিয়ে জানা যায়, কাফকার ছোটখাটো বিষয়গুলো সামলানোর (যেমন পোস্টঅফিসে যাওয়া) অপারগতা দেখে মিলেনা বিস্মিত; আর অন্যান্য লোকদের স্মার্টনেস দেখে (যেমন ফেলিসের, সেই সঙ্গে মিলেনার মেয়েবাজ স্বামী আরনস্ট্ পোলাকের) কাফকা কীভাবে হীনম্মন্যতায় ভুগতেন তা বুঝতে পেরে তিনি কাফকার প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র। মিলেনা লেখেন:

> সে (কাফকা) ভাবে যে সে অপরাধী ও দুর্বল, তার পরও এই পৃথিবীতে তাঁর মতো বিশাল
> শক্তির আর কেউ নেই; আর কারো নেই উৎকর্ষের পূর্ণমাত্রা অর্জনের, শুদ্ধতা ও সত্য অর্জনের
> এরকম পরম ও তর্কাতীত প্রয়োজন।

মিলেনাকে কাফকা লেখেন: 'আমি নোংরা, মিলেনা, আমার ভেতরকার নোংরার কোনো শেষ নেই, সে কারণেই আমি শুদ্ধতা নিয়ে এত জোরে চিৎকার করি।' (২০ আগস্ট, ১৯২০)।

১৯২০-এর আগস্টে মিলেনা ব্রডকে আরো একটি চিঠি লেখেন, যেটি কাফকার অপাপবিদ্ধ, সাধু-সন্তের ইমেজ (বা মিথ) আরো গাঢ় করে তোলে।

> তাঁর [কাফকার] কাছে জীবন অন্যদের কাছে যেমন সেরকম মোটেই নয়...সে একদম সাধারণ
> জিনিসগুলোও বুঝতে পারে না...এই পুরো পৃথিবীই তাঁর কাছে একটা ধাঁধা...আমি যখন তাকে
> আমার স্বামীর কথা বললাম, আমার স্বামী যার আমার প্রতি অবিশ্বস্ততার ঘটনা বছরে শতবার
> ঘটছে, তাঁর মুখটা [আমার সেই স্বামীর প্রতি] সেরকম শ্রদ্ধায়ই উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেমনটা
> হয়েছিল সে আমাকে তার অফিসের বস্ নিয়ে বলার সময়... তাঁর বস্ দ্রুত টাইপ করতে
> পারেন, আর সেকারণেই [কাফকার হিসেবে] কী চমৎকার একজন মানুষ তিনি... সে [কাফকা]
> মিথ্যা বলতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

মিলেনার সঙ্গে সম্পর্ক চলার সময়েই কাফকা প্রাগের এক গরিব অশিক্ষিত হোটেল পরিচারিকা ইউলি ওরিৎসেকের প্রেমে পড়েন। ১৯১৯ সালের এক ছুটিতে তাঁদের পরিচয়। ইউলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি। এ দুজনের মধ্যে বিয়ের জন্য বাগ্‌দান হয়, দুজনে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেন, বিয়ের তারিখও ঠিক করেন। ইউলির সামাজিক অবস্থান ও জায়োনিস্ট আন্দোলনের (ইহুদিদের স্বাধীন আবাসভূমি ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন) প্রতি সমর্থনের কারণে কাফকার বাবা খেপে যান। এ ঘটনা থেকেই জন্ম হয় কাফকার বিখ্যাত *বাবাকে লেখা চিঠির*। একসময় ইউলিকে ছেড়ে মিলেনার দিকেই কাফকা বেশি ঝুঁকে পড়েন, ইউলির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন; ইউলি বলেন: 'তুমি কি সত্যিই আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?'

ইউলির চেয়ে অনেক বেশি গাঢ় ও সম্ভাবনাময় ছিল কাফকার শেষ প্রেম। প্রেমিকার নাম ডোরা ডিয়ামান্ট। কাফকার অন্য দুই মূল প্রেমিকা ফেলিস ও মিলেনার পাশাপাশি ডোরাও এখন অনেক বিখ্যাত এক নাম। ১৯২৩-এর আগস্টে মৃত্যুর মাস দশেক আগে ডোরার সঙ্গে কাফকার পরিচয় হয় এক অবকাশযাপন কেন্দ্রে। ডোরার বয়স তখন ২৫, কাফকার চেয়ে ১৫ বছরের ছোট; বার্লিনে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একা বাস-করা এক মেয়ে সে। ডোরা কাফকার কাছে জায়োনিজম ও ইহুদি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অগাধ আগ্রহ প্রকাশ করেন; পরে দুজনেই পরিকল্পনা করেন যে তাঁরা প্যালেস্টাইনে গিয়ে সংসার পাতবেন, সেখানে তাঁরা একটা রেস্টুরেন্ট খুলবেন – ডোরা হবেন সেটার পাচক, কাফকা ওয়েটার। তা আর হয়ে

ওঠেনি; কাফকা মারা যান এর ক'মাস পরেই, কিন্তু ডোরা কাফকাকে জীবনের শেষ ক'মাস – প্রাগ ও পরিবারের শৃঙ্খলমুক্ত অবস্থায় – বার্লিনে সম্ভবত কাফকার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু উপহার দেন। ডোরা এর পরে বেশ নামকরা এক অভিনেত্রী হন, কম্যুনিজমে সক্রিয় হয়ে ওঠেন (মিলেনার মতোই), প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পরে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান। লন্ডনে ১৯৫২ সালে ডোরার মৃত্যু হয়। ১৯২৪ সালে কাফকার মৃত্যুর সময় ডোরা তাঁর পাশে ছিলেন।

কাফকার লেখার কোনো কোনো অংশ এমন ধারণারও জন্ম দিয়েছে যে তিনি সম্ভবত সমকামী ছিলেন। তবে গবেষকরা এখন একমত যে, তা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক এক অনুমান। কাফকার সময়টা ছিল ইউরোপে পুরুষবাদী সংস্কৃতির তুমুল জোয়ারের সময়; সব ছেলে একসঙ্গে মিলে ব্যায়াম, সাইক্লিং, সাঁতার, দীর্ঘ পথ হাঁটা, পুরো জার্মানি জুড়ে হাইকিং করতে বেরোনো – এসব নতুন ফ্যাশন তখন তুঙ্গে। কাফকার তিন-চারটে লেখায় তথাকথিত সমকামী যৌনতার ইঙ্গিত খুব বেশি হলে এসবেরই উদ্‌যাপন – এমনটাই এখন এ বিষয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত উপসংহার।

এর বিপরীতে, নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্ক কাফকার হাতে সবসময়ই অদ্ভুত ও কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়েছে। কাফকার লেখায় এই সম্পর্কগুলো সব সময় আতঙ্ক-জাগানো ও নোংরা। *আমেরিকা* উপন্যাসে ক্লারা যখন কার্লের দিকে যৌনমিলনের জন্য এগিয়ে আসে, সে কার্লকে পেড়ে ফেলে কুংফু স্টাইলে। *বিচার* উপন্যাসের লেনি তো মনে হয় কোনো জন্তু, তার আঙুলগুলো বাদুড়ের মতো, জোসেফ কে.-কে ভুলিয়েভালিয়ে সে মেঝেতে টেনে আনে, বলে: 'তুমি এখন আমার।' আরো খারাপ *দুর্গ* উপন্যাসের সেই দৃশ্য যখন কে. ও ফ্রিডা সরাইখানার মেঝেতে জমে থাকা নোংরা ময়লা কাদাপানির মধ্যে মিলিত হয় (যদিও এ সময়ে কাফকার বর্ণনা কিছুটা লিরিক্যাল, অর্থাৎ তিনি সম্ভবত বলতে চাইছিলেন যে, সেক্স একটা নোংরা বিষয় হলেও এর মধ্য দিয়ে ভালোবাসা ও আত্মহারা হওয়ারও প্রকাশ ঘটে)। কাফকা মিলেনাকে লিখেছিলেন, সেক্সের জন্য তাঁর তাড়নার কারণে তাঁর নিজেকে পৃথিবীর পথে ঘুরে বেড়ানো ইহুদি (Wandering Jew) বলে মনে হয়: 'অর্থহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি অর্থহীন, নোংরা এক পৃথিবীর পথে।' কিন্তু একই সঙ্গে সেক্সের মধ্যে আছে 'স্বর্গ থেকে পতনের আগে স্বর্গের যে হাওয়ায় আমরা শ্বাস নিতাম সে রকম হাওয়ার কিছু একটা।'

আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, যৌনতার বেলায় কাফকার ওপর সবসময় ভর করে সমাজের একেবারে নিচু স্তরের, গরিব, কাজের মেয়েরা। *আমেরিকা* উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় 'দি স্টোকার'-এ আমরা দেখি কাজের মেয়ের গর্ভে বাচ্চা জন্ম দিয়ে আমেরিকায় নির্বাসিত হয়েছে কিশোর কার্ল রসমান; *বিচার* উপন্যাসে জোসেফ কে.-র নারীরা হয় সামান্য টাইপিস্ট, ধোপানি, না-হয় উকিলের কাজের মেয়ে; *দুর্গ* উপন্যাসের ফ্রিডা পানশালায় কাজ করা নগণ্য এক মেয়ে, আর পেপি (প্রথম দিকে)

আরো নিচু শ্রেণির এক কাজের মেয়ে; 'রূপান্তর' গল্পে কমবয়সী চুলে বেণি করা কাজের মেয়েটা পোকা-গ্রেগরকে কত ভয় পায় (কিন্তু বয়স্কা ঝি-টা এই পোকাকে একটুও ভয় পায় না); 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পে ঘোড়ার আস্তাবল থেকে উদয় হওয়া দানবীয় সহিস যৌনবাসনা পূরণের জন্য ডাক্তারের কাজের মেয়ে রোজের ওপর এমনভাবে চড়াও হয়, যেন মনে হয়, সে নরমাংসভোজী, রোজকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে; আর 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন' গল্পের নায়ক পুরুষ শিম্পাঞ্জি রট্‌পিটারের জন্য সঙ্গী হিসেবে মেলে এক আধা-বশমানা মেয়ে শিম্পাঞ্জি, 'শিম্পাঞ্জিদের মতো করেই তার সঙ্গসুখ ভোগ করে রট্‌পিটার'।

কাফকা-সাহিত্যের যৌন বিষয়গুলো যাঁরা 'অপার্থিব' বলেন (এবং কাফকা মিথে নতুন পালক যোগ করেন), তারা কোন যুক্তিতে তা বলেন জানি না; আমার বরং *Excavating Kafka* বইয়ের জেমস হয়েসের মতো করেই মনে হয় যে, কাফকা সাহিত্যে (এবং কাফকার ব্যক্তিজীবনেও) যৌনতা খুব উদ্ভট, প্রথাবিরুদ্ধ ও নোংরা-কাদায় ভরা পার্থিব এক সত্য। 'রূপান্তর' গল্পের মানুষ-পোকা গ্রেগর যেভাবে তার বোনের গলায় চুমু খেতে চায়, কিংবা 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পে রোগীর উরুতে যে রকম গোলাপ-রঙের ক্ষত আমরা দেখি, তার নানা রূপক অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু তা সাধু-সন্ন্যাসীর চোখে দেখা কোনো 'অপার্থিব', বৈরাগ্যময় যৌনতা নয়।

ব্যক্তিত্ব

কাফকা ভয়ে থাকতেন যে অন্য মানুষের কাছে তিনি বোধহয় বিরক্তিকর এক চরিত্র – শারীরিক ও মানসিক, দুই দিক দিয়েই। তবে তাঁর সঙ্গে যারা মিশেছেন তাঁদের সবার কাছেই তিনি ছিলেন চুপচাপ ও ঠাণ্ডা মাথার, যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ও শুষ্ক রসবোধসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব; কিশোরসুলভ হ্যান্ডসাম, কিন্তু পোশাকে-আশাকে অনাড়ম্বর এক মানুষ। ব্রডের হিসেবে কাফকা তাঁর দেখা অন্যতম মজার এক মানুষ, যিনি বন্ধুদের সঙ্গে সবসময় হাসি-তামাশা করতেন, তাঁদের কঠিন সময়ে তাঁদের ভালো উপদেশ দিতেন। ব্রড আরো বলছেন, কাফকা ছিলেন খুব আবেগে পূর্ণ একজন আবৃত্তিকার, বক্তৃতার সময়ে তিনি কথা সাজাতেন গানের মতো গুছিয়ে। ব্রডের হিসেবে, কাফকার ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় দুটো দিক ছিল: তাঁর 'পরম সত্যবাদিতা' (Absolute Wahrhaftigkeit) এবং 'সূক্ষ্ম বিবেকবোধ' (präzise Gewissenhaftigkeit)। তিনি বিষয়ের এমন খুঁটিনাটি গভীরে চলে যেতেন, এতখানি ভালোবাসা নিয়ে ও নিখুঁতভাবে তা যেতেন যে, আগে চোখে না-পড়া অনেক বিষয়ও তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসত, 'সেগুলো হয়তো অদ্ভুত শোনাত, কিন্তু সেগুলো সত্য ছাড়া আর কিছুই হত না (nichts als wahr)।'

কাফকা নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধুলা ভালোবাসতেন, ভালো সাইকেল চালাতেন, সাঁতার পছন্দ করতেন, নৌকার দাঁড় টানায় দক্ষ ছিলেন। সাপ্তাহিক ছুটির

দিনে কাফকাই পরিকল্পনা করতেন বন্ধুরা মিলে কোথায় দীর্ঘ পদযাত্রাতে যাবেন। তাঁর অন্যান্য আগ্রহের মধ্যে ছিল বিকল্প বা প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতি, অ্যারোপ্লেন ও সিনেমা। লেখালেখি তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তিনি বলতেন যে লেখালেখি 'প্রার্থনার মতো' একটা কাজ। কোলাহল তিনি খুব অপছন্দ করতেন, এর পরিচয় পাওয়া যায় এ বইতে অন্তর্ভুক্ত তাঁর প্রথম দিককার ছোট রচনা 'বিরাট শোরগোল'-এ। কাফকা সিগারেট খেতেন না; মদ, কফি, চা, চকলেটও না। তিনি জীবনের দীর্ঘ অনেকগুলো বছর শুধু শাকাহারীই ছিলেন না, কীভাবে খেতে হবে তার নিয়মও ছিল তাঁর জন্য ধরাবাঁধা। খাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি 'fletcherize' করতেন – আমেরিকার হোরেস ফ্লেচার উদ্ভাবিত খাবার চিবানোর তখনকার দিনের এক ফ্যাশন, যেখানে খাবার মুখে নিয়ে এত বেশি সময় ধরেই চিবানো হত যে তা তরল স্যুপের মতো হয়ে গলা দিয়ে নেমে যেত। কাফকা বিশ্বাস করতেন, এতে হজমের ওপর সবচেয়ে কম চাপ পড়ে আর খাবার থেকে সবচেয়ে বেশি পুষ্টি পাওয়া যায়।

পেরেজ আলভারেজের দাবি, কাফকার ছিল একধরনের split personality – ভগ্নমনস্ক (schizophrenic) বিভাজিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'রূপান্তর' গল্পসহ অন্য আরো কিছু লেখার বিস্ময়কর অদ্ভুত ব্যাপারগুলো তাঁর ওই বিভাজিত ব্যক্তিতার কারণেই লেখা সম্ভব হয়েছে – এমন দাবি এই 'ক্লিনিক্যাল' ব্যাখ্যাদাতাদের। ১৯১৩-এর ২১ জুনের ডায়েরিতে কাফকা লিখছেন:

> আমার মাথার মধ্যে কী ভয়ংকর এক পৃথিবী। মাথা ছিঁড়ে-ফেঁড়ে না ফেলে আমি কী করে নিজেকে মুক্ত করব, ওই পৃথিবীকে [মাথা থেকে] মুক্ত করে আনব! আর মাথার ভেতরে ওগুলোকে ধরে রাখার বা কবর দেওয়ার চেয়ে হাজার গুণে ভালো মাথা ছিঁড়ে-কেটে টুকরো করে ফেলা। আমি যে সে কাজের জন্যই এখানে [এ পৃথিবীতে] আছি, তা আমার কাছে একদম পরিষ্কার।

যৌনবিষয়ে কাফকার ঘৃণা, অপরাধবোধ এবং একই সঙ্গে তার অনেকবার পতিতালয়ে যাওয়া, পর্নোগ্রাফির প্রতি আগ্রহ – এসব নিয়েও কম গবেষণা হয়নি। পাশাপাশি অনেকে এমন দাবিও করেছেন যে কাফকার খাওয়া-সংক্রান্ত অসুখ ছিল। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মানফ্রেড ফিখ্‌টার তো 'প্রমাণ হাজির করেছেন যে...কাফকা anorexia nervosa-র (খাদ্যভীতির মানসিক অসুখ, যার পরিণতিতে বিপজ্জনকভাবে মানুষ শুকিয়ে যায়) ব্যতিক্রমী এক লক্ষণে' ভুগতেন। তাঁর আরো দাবি, কাফকা শুধু 'নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্নতার রোগেই ভুগতেন না', মাঝেমধ্যে 'আত্মহত্যাপ্রবণও' ছিলেন। অনেক গবেষকেরই দাবি, কাফকা ছিলেন 'হাইপোকন্ড্রিয়াক' (কোনো আপাত-কারণ ছাড়াই যে মানুষ তার অসুখ আছে বলে কল্পনা করে ও অহেতুক উৎকণ্ঠায় ভোগে)। অন্তত একবার যে কাফকা আত্মহত্যা করার সংকল্প করেছিলেন, ১৯১২ সালে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কাফকার এই বিষণ্ন, মলিন চেহারাটি প্রতিনিধিত্ব করছে বিশ শতকের (এবং একুশ শতকেরও) আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষের, যেমনটি উনিশ শতকের জন্য করেছিলেন ম্যানিক ডিপ্রেশন ও বাইপোলার ডিজঅর্ডারে ভোগা ব্রিটিশ কবি, অসুখী লর্ড বায়রন। 'কাফকায়েস্ক' বিশেষণটি 'বায়রনিক' বিশেষণের মতোই অকাট্য ও জোরালো। তবে বায়রনের অভিজাত, অনিষ্টকর ইমেজের (যা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারগুলোকে তাচ্ছিল্য করছে) চেয়ে কাফকার ইমেজটি অনেক বেশি সর্বজনীন। কাফকার অতি মামুলি জীবনীর দিকে তাকালেই মনে হয় যে তিনি আমাদেরই একজন: অতি সাধারণ এক জীবনের বৃত্তে বন্দি থেকে তিনি অনুভব করে গেছেন সাধারণ সব ভয়, দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা ও হতাশা; আমরা তাঁকে সহজেই বুঝতে পারি, কারণ তাঁর অনুভবগুলো আমাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি খাপে খাপে না-ও মেলে, তবু আমাদের ভয়-শঙ্কা ও দুঃস্বপ্নগুলোর সঙ্গে মেলে তো বটেই।

কাফকা নিয়ে যা কিছু মিথ (বায়রনকে নিয়ে মিথের মতোই), তা কাফকার নিজেরই গড়ে তোলা। ওই মিথগুলোর পেছনে কাফকার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভূমিকা না থাকলেও, তিনি তাঁর চিন্তার মধ্যে তাঁর রোজকার অভিজ্ঞতার যেভাবে রূপ দিয়েছিলেন, তারপর লেখনীতে সেগুলো যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন (প্রথমত তাঁর নিজের জন্য, আর পরে সবার পড়ার জন্য), তাতেই দাঁড়িয়ে গেছে মিথগুলো। সে কারণেই কাফকার গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলো থেকে তাদের লেখককে আমরা আলাদা করতে পারি না। তাঁর উপন্যাসের নায়কদের নামগুলোও (লেখার তারিখের ক্রম মেনেই) ধাপে ধাপে ছোট হয়ে আসে: *আমেরিকা* উপন্যাসের কার্ল রসমান থেকে *বিচার* উপন্যাসের জোসেফ কে. থেকে *দুর্গ* উপন্যাসের কে.। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল একবার: ১৯২২-এর জানুয়ারিতে কাফকা একটা হোটেলে চেক-ইন করছেন, দেখলেন যে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাঁর বুকিং ভুলভাবে পড়ে, তাঁর নামের জায়গায় লিখে রেখেছে 'জোসেফ কে.' (Joseph K[afka])। কাফকা ডায়েরিতে লিখলেন: 'আমার কি ওদেরকে ঠিক করে দেয়া উচিত, নাকি ওরাই আমাকে ঠিক করুক'। এখানে বাক্যের দ্বিতীয় অংশে কাফকা তাঁর সহজাত কূটাভাস (paradox) করছেন: অর্থাৎ আমিই হয়তো ভুল, আমার নাম আসলেই হয়তো জোসেফ কে., অতএব হোটেল কর্তৃপক্ষই আমাকে, আমার নামটাকে, ঠিক করুক, অর্থাৎ জোসেফ কে.ই রেখে দিক।

যেহেতু সাংস্কৃতিক আইকন 'ফ্রানৎস কাফকা' শেষ বিচারে তাঁর নিজেরই সৃষ্টি, সেহেতু এর বাইরে গিয়ে সত্যিকারের কাফকার ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ অনেক কঠিন এক কাজ। গল্প-উপন্যাসের আর ফেলিস ও মিলেনাকে লেখা অসংখ্য চিঠির সেই যন্ত্রণাকাতর কাফকা তাঁর বাস্তব জীবনের দক্ষ অফিস কর্মকর্তা, স্পোর্টসম্যান ও প্রাগের মোটামুটি খ্যাতিমান লেখকে পরিণত হওয়া কাফকার মতোই সত্য। বিষয়টি আসলে কাফকার প্রতিমাসুলভ ইমেজকে ঠিক করা বা না করার নয় (অর্থাৎ তাঁর

বাস্তব ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের নয়), বরং আসল অর্থপূর্ণ কাজ হচ্ছে তাঁর লেখার মধ্যে ফেরত গিয়ে, ওগুলোর মধ্যেই দেখা যে, কীভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতাগুলো ভেঙে ওই ইমেজ দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। তবে সচেতন পাঠককে সবসময় মাথায় রাখতে হবে, এভাবে কাফকার জীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতাগুলোর সমান্তরালে তাঁর সাহিত্যকর্ম পড়ে যাওয়ার বিপদও আছে। মনে রাখতে হবে, তাঁর সাহিত্য তাঁর নিজের জীবন, সময় ও সমাজকে অনেক-অনেক বেশি গুণে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল বলেই কাফকা এখনো পৃথিবীতে বেস্টসেলার, এখনো এই ১০০ বছর পরেও, মানুষ তাঁর লেখা পড়ে আর এখনো প্রতি ১০ দিনে তাঁর ওপর একটি করে নতুন বই বের হয়।

কাফকা ও রাজনীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে। ১৯১৪ সালের ২ আগস্টে কাফকার সেই কিংবদন্তিতুল্য ডায়েরি এন্ট্রি: 'জার্মানি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে – বিকেলে সাঁতার।' এত বড় বৈশ্বিক ঘটনায়, যেখানে তাঁর নিজের দেশও যুদ্ধের অংশ, কাফকার কী নিরাসক্ত, উদাসীন, নিস্পৃহ উক্তি। একদিকে বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে সাঁতার – কিসের সঙ্গে কী? পড়তে গিয়ে মনে হয় হোরহে লুইস বোরহেসের সম্ভবত শ্রেষ্ঠতম গল্প 'ট্‌লন, উকবার, অরবিস, টারটিয়াস'-এর শেষ অংশটুকুর কথা: ট্‌লন গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে এবং পৃথিবীর মাটিতে ট্‌লনের বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী উড়ে এসে পড়তে থাকার কারণে পৃথিবীর সর্বব্যাপী ধ্বংস নেমে আসছে; এমনকি পৃথিবীর স্কুলগুলোতে মানুষের ইতিহাসের জায়গায় ট্‌লনের ইতিহাস পড়ানো শুরু হয়েছে; ওষুধশাস্ত্র ও প্রত্নতত্ত্ব পড়ানোর বিষয়বস্তু বদলে গেছে, সামনে বদলে যাবে জীববিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র। এমন এক চরম ও চূড়ান্ত বিপদসংকুল মুহূর্তে বোরহেস গল্পটি শেষ করছেন এভাবে:

> এরপর পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে ইংরেজি, ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষা। পৃথিবী হয়ে যাবে ট্‌লন। তবে আমার এসবে কোনো মনোযোগ নেই; আমি আদ্রোগের হোটেলে বসে, শান্ত-স্থির দিনগুলোয়, ব্রাউনের *Urn Burial* বইটির...অনুবাদের (যা আমার প্রকাশ করার ইচ্ছা নেই) কাজ সংশোধন করে যেতে লাগলাম।

কাফকার মতোই আরেক মহান লেখক বোরহেসেরও রাজনীতি বিষয়ে কী নিরাসক্ত ভঙ্গি! পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আর উনি কোথাকার সতেরো শতকের এক লাশের আচার-সংস্কারের ওপরে লেখা বই অনুবাদ করে যাচ্ছেন, তাও কিনা যে অনুবাদ তাঁর প্রকাশ করার ইচ্ছা নেই। চারপাশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, আর কাফকা বিকেলে সাঁতার নিয়ে ব্যস্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে কাফকা ক্লাব স্লাদিচ্ নামের চেক এক নৈরাজ্যবাদী, সামরিকতন্ত্র-বিরোধী সংগঠনের বেশ কিছু মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন। হুগো বার্গম্যান, যিনি কাফকার সঙ্গে একই স্কুলে গেছেন, ১৯০১ সালে কাফকার থেকে আলাদা হয়ে যান। তিনি লিখেছেন: 'কাফকার সমাজতন্ত্র আর আমার জায়োনিজম – দুটোই খুব কড়া ধাঁচের।...জায়োনিজম ও সোশ্যালিজমের মিশেল করে কোনোকিছু এখনো উদ্ভাবিত হয়নি।' চেক নৈরাজ্যবাদীদের (anarchist) বিষয়ে কাফকা পরে ডায়েরিতে লিখেছেন: 'এরা সবাই মানুষের সুখ আদায় করার সংগ্রাম করছে, এজন্য এরা কোনো ধন্যবাদও পাবে না। আমি এদের বুঝি। কিন্তু...এদের পাশে দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে আর মিছিল করে যাওয়া সম্ভব নয়।'

চেকোস্লোভাকিয়ায় কম্যুনিস্ট শাসনের সময় (১৯৪৮ থেকে ১৯৮৯) কাফকার সাহিত্যকর্ম পুরো ইস্টার্ন ব্লক বা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট ব্লকের দেশগুলোতে নিষিদ্ধ করা হবে কি হবে না, তা নিয়ে বিরাট বিতর্ক ছিল। যখন শাসকেরা ভেবেছেন যে কাফকা তাঁর সাহিত্যে পতনশীল অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখেছেন, তখন কাফকা পড়া গেছে। যখন তারা এর উল্টোটা ভেবেছেন, কাফকা তখন নিষিদ্ধ হয়েছে। আরনস্ট্ পয়েলের বিখ্যাত কাফকা জীবনীগ্রন্থ *A Nightmare of Reason* (১৯৮৪) বইটির একেবারে শেষে পয়েল লিখছেন: 'মৃত্যুতেও কাফকা তাঁর বাবা-মায়ের কাছ থেকে পালাতে পারেননি। তাঁরা তার সঙ্গে আছেন একই কবরে, কবরফলকও একটিই। এই বিড়ম্বনা অবশ্য অবাক করে না, কারণ আমরা দেখি যে তাঁর নিজের শহরেই কাফকার কবরকে কীভাবে সম্মান করা হয়েছে, ওদিকে তাঁর লেখা কীভাবে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে।'

কম্যুনিস্ট চেকোস্লোভাকিয়ার জন্য কাফকা-সাহিত্যের আরেক বড় উপাদান 'বিচ্ছিন্নতাবোধ' (alienation) তাদের বড় ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিল। কম্যুনিস্টরা ভাবত, কাফকা তাঁর লেখায় যে অ্যালিয়েনেশনকে চিত্রিত করে গেছেন তা কম্যুনিস্ট সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে; কারণ কম্যুনিস্ট সমাজে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ বা নিরাসক্তির কোনো জায়গাই নেই, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে। কাফকার আশিতম জন্মদিনে, ১৯৬৩ সালে, তাঁরা মনস্থির করলেন, অতএব, কাফকার লেখার আমলাতান্ত্রিক চিত্রণ নিয়ে কথা বলতে হবে। কাফকার মূল লেখাগুলোর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিস্তর হয়েছে, কিন্তু তিনি আদতে কোনো রাজনৈতিক লেখক কি না তা নিঃসন্দেহে একটি বিতর্কিত বিষয়।

ইহুদিত্ব ও জায়োনিজম

ইহুদি ধর্মের সঙ্গে কাফকার সম্পর্ক – তা ইদ্দিশ নাটক দেখে তাঁর মোহগ্রস্ত হওয়ার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ হোক কিংবা মার্টিন বুবারের 'সাংস্কৃতিক জায়োনিজম'

আন্দোলনে বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই হোক কিংবা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাক্স ব্রড ও হুগো বার্গম্যানের সরাসরি জায়োনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়েই হোক – ইদানীংকালের কাফকা-গবেষণার অন্যতম বড় একটি বিষয়। কাফকার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই চালাতেন প্রাগের জায়োনিস্ট সংবাদপত্র *Selbstwehr* (Self-Defence বা আত্মরক্ষা)। এঁদের সঙ্গে কাফকা জায়োনিস্ট মিটিংয়ে অংশ নিয়েছেন অনেকবার; ১৯১৩ সালে ভিয়েনায় এগারোতম জায়োনিস্ট কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, হিব্রু পড়েছেন, এমনকি ডোরাকে নিয়ে প্যালেস্টাইনে গিয়ে বাস করার স্বপ্নও দেখেছেন। কাফকার অনেক লেখায়, যেমন *গল্পসমগ্র*-এর এই প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 'শিয়াল ও আরব', 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন' ও 'গায়িকা জোসেফিন অথবা ইঁদুর-জাতি' গল্পে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের 'একটি কুকুরের তদন্তমালা' ও 'চীনের মহাপ্রাচীর' গল্পে তখনকার জায়োনিস্ট মহলে চলমান বিতর্কগুলো আমরা দেখতে পাই, আর ওগুলো মূলত (প্রাথমিক অর্থে) জায়োনিস্ট পাঠকদের জন্যই লেখা হয়েছিল মার্টিন বুবারের সাময়িকী *Der Jude* (The Jew বা ইহুদি)-এর কাফকা একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন এবং ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে এই পত্রিকায় তিনি বেশ কটি গল্প প্রকাশ করেন।

কাফকার 'যন্ত্রণা', তাঁর লেখায় নিজেকে পীড়িত করার, কষ্ট দেওয়ার শ্লেষাত্মক বর্ণনা, তাঁর 'বিভাজিত' ব্যক্তিত্ব, এই সবকিছু তখনকার দিনের মধ্য ইউরোপের ইহুদিদের 'আত্মসমালোচনা' ও 'আত্ম-ঘৃণার' যে সংস্কৃতি চালু ছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। ১৯১০ সালের *Selbstwehr* পত্রিকা ঘেঁটে দেখা গেছে, কাফকার অঞ্চলের (বোহেমিয়া রাজ্যের – প্রাগ ছিল এর রাজধানী) ইহুদিদের প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে: 'আপনি যদি শোনেন যে তারা তাদের সঙ্গী ইহুদিদের নিয়ে কী বলছে, আপনার মনে হবে আপনি পৃথিবীর এক নম্বর ইহুদিবিদ্বেষী (anti-semitic) কারো সঙ্গে আছেন।' কাফকার মধ্যেও যে একই প্রবণতা ছিল, তা তাঁর লেখা ও ডায়েরির পাতায় স্পষ্ট। তখনকার পশ্চিম ইউরোপীয় ইহুদিরা সবাই 'দলগত সংশয়'-এ ভুগতেন – চেক জাতীয়তাবাদী সংখ্যাগুরুরা ইহুদিদের মনে করত তারা ধর্মাচার মেনে গোপনে মানুষ খুন করে; এই সংখ্যাগুরুরা মাঝেমধ্যে ইহুদিদের মেরেও বসত (কাফকার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু তার ছোটবেলায় ইহুদিবিদ্বেষী এক আক্রমণে চোখের দৃষ্টি হারান); ইহুদিদের ব্যঙ্গ করে বলা হত 'ছারপোকা', 'কুকুর', 'শিম্পাঞ্জি', ও 'ইঁদুর' (লক্ষণীয় যে এই চারটি প্রাণী নিয়েই কাফকা তাঁর বিখ্যাত চারটি গল্প লিখেছেন, যদি আমরা 'রূপান্তর' গল্পের অনিশ্চিত প্রজাতির পোকাটিকে ছারপোকা হিসেবে ধরি)। সংখ্যাগুরুদের হাতে এসব লাঞ্ছনার জবাব দেওয়ার জন্য ইহুদিদের কোনো শক্ত ধর্মীয় প্ল্যাটফর্ম ছিল না। প্রাগের ইহুদিদের তখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ কিংবা আত্মহত্যা করা ছিল অনেক নৈমিত্তিক ঘটনা। কাফকা ডায়েরিতে লিখেছেন 'আমার

ক্লাসে সম্ভবত মাত্র দুজন সাহসী ইহুদি ছেলে ছিল, এরা দুজনই স্কুলে থাকতেই কিংবা স্কুল ছাড়ার কিছুদিন পরে গুলিতে আত্মহত্যা করে।'

ইহুদিত্ব ও জায়োনিস্ট আন্দোলন নিয়ে কাফকার মুগ্ধতার পাশাপাশি, আমরা তাঁর ডায়েরিতে অন্য রকম কথাও দেখতে পাই: 'আমার সঙ্গে ইহুদিদের কোনো মিল আছে কি? আমার নিজের সঙ্গেই আমার কিছুর মিল নেই; আমি যে শ্বাস নিতে পারছি এটুকু ভেবেই তো আমার উচিত খুব চুপচাপ এক কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।'

Excavating Kafka বইতে হয়েস বলছেন, কাফকা তাঁর নিজের ইহুদিত্ব বিষয়ে খুব সচেতন থাকলেও, তাঁর লেখার ইহুদি ব্যাখ্যা করা ভুল হবে, কারণ, হয়েসের মতে, তাঁর লেখায় ইহুদি চরিত্র, দৃশ্য বা থিম অনুপস্থিত। প্রখ্যাত সাহিত্যবোদ্ধা হ্যারল্ড ব্লুম এ কথার বিপরীতে বলেন যে, যদিও কাফকা তাঁর ইহুদি উত্তরাধিকার নিয়ে বিব্রত ছিলেন, তবু তিনি 'মূলত একজন ইহুদি লেখক'। পাভেল আইজ্‌নার, কাফকার প্রথম দিককার অনুবাদকদের একজন, তাঁর *বিচার* উপন্যাসকে বলছেন যে এটি 'প্রাগে ইহুদিদের ত্রিধারা অস্তিত্বের এক মূর্ত প্রকাশ...নায়ক জোসেফ কে. এখানে (রূপকার্থে) গ্রেপ্তার হলেন একজন জার্মানের (রাবেনস্টাইনার), একজন চেকের (কুলিচ) এবং একজন ইহুদির (কামিনার) হাতে। আধুনিক পৃথিবীর ইহুদিদের 'অপরাধহীন অপরাধবোধের' (guiltless guilt) প্রতিমূর্তি জোসেফ কে., যদিও উপন্যাসটির কোথাও এমন কোনো প্রমাণ নেই যে জোসেফ কে. একজন ইহুদি।'

মৃত্যু

১৯১৭ সালের আগস্টে কাফকার স্বরযন্ত্রের ক্ষয়রোগ (যক্ষ্মা) ধরা পড়ে। ১৯১৮-এর অক্টোবরে তিনি স্প্যানিশ ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর একদম কাছাকাছি চলে যান। উল্লেখ্য, স্প্যানিশ ফ্লুতে সে সময় শুধু জার্মানিরই আড়াই লাখ লোক মারা গিয়েছিল। টানা কয়েক সপ্তাহ ১০৬ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় কাটে তাঁর। আমরা তাঁর যক্ষ্মার প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। ১৯১৭-র আগস্টের পর কাফকা তাঁর বাবা-মায়ের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসেন, এরপর বোন ওট্‌লার কাছে, গ্রামে, গিয়ে থাকেন আট মাস। আবার ফিরে আসেন বাবা-মায়ের কাছে, এরপর প্রাগ ও আধা-স্বাস্থ্যনিবাস ধরনের নানা হোটেলের (যক্ষ্মা উৎপীড়িত পুরনো ইউরোপে ওরকম হোটেলের কমতি ছিল না) মধ্যে বারবার আসা-যাওয়া; তারপর সত্যিকারের ডাক্তারি স্বাস্থ্যনিবাস হয়ে বার্লিনে ডোরা ডিয়ামান্টের সঙ্গে কয়েক মাস।

১৯২৪-এর মার্চে তিনি খুব অসুস্থ অবস্থায় বার্লিন থেকে প্রাগে ফিরে আসেন। এখানে পরিবারের সবাই, বিশেষ করে তাঁর প্রিয়তম ছোট বোন ওট্‌লা, তাঁর দেখভাল করেন। ১০ এপ্রিল কাফকাকে নেওয়া হয় ভিয়েনার কাছে কিয়েরলিংয়ে

ডক্টর হফমানের স্যানাটোরিয়ামে। কাফকার সঙ্গে ছিলেন প্রেমিকা ডোরা ও রবার্ট ক্লপ্স্টক (১৯২১-এ চেকোস্লোভাকিয়ার মাতলিয়ারি স্যানাটোরিয়ামে কাফকার চেয়ে ১৬ বছরের ছোট মেডিক্যাল ছাত্র রবার্টের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। রবার্ট ওখানে নিজের যক্ষ্মা সারাতে এসেছিলেন। ম্যাক্স ব্রডকে লেখা কাফকার চিঠিতে জানা যায়, কাফকা এই ছেলেটির মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহিত্যিক ফ্রানৎস ভেরফেলকে খুঁজে পেয়েছিলেন। কাফকা, ডোরা ডিয়ামান্ট ও রবার্ট ক্লপ্স্টক – এই তিন মিলে আমাদের 'ছোট পরিবার'; তিনি জীবনের শেষ বছরে এ রকমই বলতেন। রবার্ট ক্লপ্স্টক ১৯৭২ সালে আমেরিকায় মারা যান)। এই স্যানাটোরিয়ামেই ১৯২৪-এর ৩ জুন কাফকা মৃত্যুবরণ করেন। না খেতে পারাই ছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ: গলার অবস্থা ক্ষয়রোগে এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি দীর্ঘদিন কোনোকিছু গলা দিয়ে নামাতে পারেননি, আর অন্য কোনোভাবে শরীরে খাবার ঢোকানোর পদ্ধতিও তখনো আবিষ্কার হয়নি। তাঁর মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণটি এরকম:

> সোমবার ২রা জুন, কাফকার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি 'এক অনশন-শিল্পী' বইটির প্রুফ দেখে কাটান।...কিন্তু পরদিন ভোর চারটার দিকে ডোরা লক্ষ করেন, কাফকা ঠিকভাবে শ্বাস নিতে পারছেন না। ডোরা তখন ক্লপ্স্টক ও ডাক্তারকে খবর দেন; ডাক্তার কাফকাকে কর্পূরের ইনজেকশন দেন।

কাফকা খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তিনি ক্লপ্স্টককে বকতে থাকেন, জানতে চান তাঁকে কেন সেই প্রতিশ্রুত মরফিন দেওয়া হচ্ছে না: 'তুমি আমাকে সবসময় কথা দিয়েছ। গত চার বছর ধরে তুমি আমাকে কথা দিয়ে আসছ। আমাকে তুমি জ্বালাচ্ছ, সবসময় তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ে আসছ। তোমার সঙ্গে আমি আর কথা বলব না। তাহলে তা-ই হোক, ওটা [মরফিন] ছাড়াই আমি মারা যাব।' তাঁকে তখন মরফিনের দুটো শট দেওয়া হয়, কিন্তু তখনো তিনি বলছেন: 'আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কোরো না। তুমি আমাকে রোগ সারানোর ওষুধ [অ্যান্টিডোট] দিচ্ছ।' এরপর শেষ একটা স্বচ্ছতার খিঁচুনি, তিনি রবার্ট ক্লপ্স্টকের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন: 'আমাকে হয় মেরে ফেল, না হলে তুমি খুনি' (Kill me, or else you are a murderer)|

শরীরে মরফিনের কাজ শুরু হলে কাফকা ক্লপ্স্টককে তাঁর বোন এলি বলে ভাবা শুরু করেন, ভয় পান যে এলির মধ্যেও এই অসুখ ছড়িয়ে যাবে: 'বেশি কাছে এসো না এলি, বেশি কাছে না... হ্যাঁ, ওখানে থাকো, ওটাই ঠিক আছে।'

২ তারিখেই, অমানুষিক কষ্ট করে কাফকা তাঁর বাবা-মায়ের কাছে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন, চিঠিতে তাঁর শারীরিক অবস্থার নিখুঁত বিবরণ দেন, তাঁরা তাঁকে দেখতে আসবেন কি না, এলে লাভ কী আর ক্ষতি কী, এ দুয়ের যুক্তি-তর্ক তুলে ধরে শেষে

তাদের না আসতে বলেন। চিঠিটি তাঁর হয়ে লেখা শেষ করেন ডোরা, যোগ করেন: 'আমি ওর হাত থেকে কলম নিয়ে নিলাম...'।

৩ জুন, রবার্ট ক্লপ্স্টকের দিকে তাঁর চিরাচরিত ঢঙে ঐ প্যারাডক্সিকাল চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার পরে, ক্লপস্টক যখন ইনজেকশনের সিরিঞ্জ সাফ করতে যাচ্ছেন, কাফকা মিনতি জানান: 'আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।' ক্লপস্টক বলেন: 'আমি যাচ্ছি না।' কাফকা উত্তরে বলেন: 'কিন্তু আমি যাচ্ছি'; তারপর তাঁর চোখ বন্ধ করেন।

৩ জুন, মঙ্গলবার, দুপুরের দিকে, তাঁর একচল্লিশতম জন্মদিনের এক মাস আগে, কাফকা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ডোরা তখন প্রচণ্ড ভগ্নহৃদয়, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থা, কাফকার মৃত শরীর ছেড়ে যাবেন না; ক্লপ্স্টক একসময় ডোরাকে বিশ্রাম নিতে যাওয়ার জন্য জোর করতে থাকেন। 'শুধু ডোরাকে যারা চেনে, তারাই জানবে ভালোবাসার অর্থ কী,' এর কয়েক ঘণ্টা পরে ম্যাক্স ব্রডকে লেখেন ক্লপ্স্টক।
এই দফায় মাত্র এক সপ্তাহ লাগল কাফকাকে প্রাগে ফিরিয়ে আনতে। ১১ জুন তাঁকে সমাধিস্থ করা হল প্রাগের জেলিভ্স্কেহো রেলস্টেশনের পাশে নতুন ইহুদি কবরস্থানে। প্রায় ১০০ লোক জড়ো হয়েছিল তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। ম্যাক্স ব্রড সেখানে মৃত্যুর গাথা পাঠ করেছিলেন, আর যখন শবাধারটি কবরে নামানো হচ্ছিল, ডোরা নিজেকে কবরের মধ্যে বারবার ছুড়ে ফেলতে চাইছিলেন।

প্রাগের যে ছোট পৃথিবীতে কাফকা জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন, সেখানে তাঁর মৃত্যু নিয়ে শোক করা হল। সবচেয়ে বড় দৈনিক *Prager Presse*-এ ৪ জুন ম্যাক্স ব্রডের লেখা শোকগাথা ছাপা হল। জার্মান ভাষার পত্রিকাগুলোতে দীর্ঘ শোকসংবাদ বেরোল। ১৯ জুন প্রাগের জার্মান চেম্বার থিয়েটারে ৫০০-এর মতো লোক জড়ো হল কাফকার স্মৃতিসভায়। ৫ জুন কাফকার প্রাক্তন প্রেমিকা, চেক ভাষায় তাঁর অনুবাদক, মিলেনা য়েসেন্স্কা প্রাগের চেক রক্ষণশীল দৈনিক *Narodny Listy*-তে কাফকার উদ্দেশে বিদায়বার্তা লিখলেন:

> ডক্টর ফ্রানৎস কাফকা, প্রাগে বাস করা জার্মান লেখক, গত পরশু মারা গেছেন ভিয়েনার কাছে ক্লস্টারনুবার্গের কিয়েরলিং স্যানাটোরিয়ামে। অল্প মানুষই তাঁকে চিনতেন, কারণ তিনি চলতেন একা, সন্ন্যাসীর মতো – পৃথিবীর রীতিনীতি বিষয়ে সচেতন কিন্তু ওগুলোতে ভীত। কয়েক বছর ধরেই তিনি ভুগছিলেন ফুসফুসের অসুখে, অসুখটি তিনি সযত্নে লালন করতেন...এই অসুখ তাঁকে অনুভূতির এমন এক সূক্ষ্মতা দিয়েছিল, যাকে অলৌকিকের কাছাকাছি

কিছু বলতে হবে, আর দিয়েছিল এমন এক আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা যার আপসহীনতার ব্যাপারটি ভয়-জাগানোর মতো কিছু হয়ে পড়েছিল... । আধুনিক জার্মান সাহিত্যের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লেখাগুলো তিনি লিখেছেন; এদের নগ্ন সত্যের কারণে, এমনকি যখন রূপক অর্থেও বলা হচ্ছে, তখনো মনে হয় সবকিছু কত স্বাভাবিক । এদের মধ্যে আছে এমন একজন মানুষের বক্রাঘাত (irony) ও ভবিষ্যদ্বক্তার অন্তর্দৃষ্টি (prophetic vision) যিনি দণ্ডিত ছিলেন পৃথিবীকে এতখানি এক চোখ-ধাঁধানো স্পষ্টতা নিয়ে দেখার কাজে যে, তিনি আর তা সইতে পারেননি, তাই মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিলেন ।

কাফকাকে কবর দেওয়া হল সেই প্রাগেই, যেমনটা তিনি জানতেন ও ভয় পেতেন যে একদিন হবে । 'ছোট মায়ের থাবা' (কাফকা এভাবেই বলতেন প্রাগ সম্বন্ধে) একদম তিক্ত এক শেষপর্যন্ত তাঁকে ধরে রাখল । এখন প্রাগের নতুন ইহুদি কবরস্থানে পাঁচ ভাষায় কাফকা-তীর্থযাত্রীদের তাঁর কবরে পৌঁছানোর রাস্তা দেখানো হচ্ছে । তিনি তাঁর বাবা-মায়ের কাছ থেকেও ছাড়া পেলেন না, এমনকি মৃত্যুতেও না; তাঁরা আছেন তাঁর সঙ্গে একই কবরে, একই কবরফলকের নিচে ।

তিন.

ফরাসিরা কেন কাফকা পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল?

১৯৪৬ সালে ফরাসি কম্যুনিস্টরা এক জরিপ চালিয়েছিল: 'কাফকা কি অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলা উচিত?' – এই শিরোনামে । তাদের যুক্তি ছিল, কাফকা 'অন্ধকারের সাহিত্যের' বিপজ্জনক প্রতিনিধিত্ব করছেন, সমাজে কাফকার খুব বাজে প্রভাব পড়তে পারে । খ্রিস্টানরাও একই রকম কথা বললেন, এমনকি এরিখ হেলারের মতো পণ্ডিত মানুষও । গুন্টার অ্যান্ডার্স তাঁর আলোচনার উপসংহার টানলেন এই কথা বলে: 'পৃথিবীর যে ছবি কাফকা এঁকেছেন, সে রকম পৃথিবী বাস্তবে হওয়া উচিত নয়; তাতে মানুষের যে রকম আচরণ, সে রকম আচরণ হওয়া ঠিক নয়...ইতিবাচক কিছু হিসেবে তাঁর সাহিত্য কখনোই তাঁর নিজের বা অন্যদের কাজে আসবে না; তবে "সতর্কবাণী" হিসেবে আমাদের জন্য তা কাজে লাগতে পারে ।'

ইতির বিপরীতে কাফকার এই নেতিবাচকতার কথা বলতে গেলে সেই ক্লিশে 'কাফকায়েস্ক' প্রসঙ্গই বারবার চলে আসে । আমরা যদি ১০০ রকমের ও-ধরনের কাফকা-ব্যাখ্যা পাশে সরিয়ে রাখি, এ কথা তো অগ্রাহ্য করা যাবে না যে কাফকার লেখার একেবারে মূলে আছে আধুনিক পৃথিবীতে ব্যক্তির একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং অনাত্মীয় পরিবেশে 'এই পৃথিবীতে, এই শহরে, আমার পরিবারে পা রাখার ব্যাপারে পুরোপুরি অনিশ্চিত' (দেখুন 'যাত্রী' গল্পটি) মানুষদের কথা ও কাহিনী । কাফকা তাঁর পাঠকের মধ্যেও এই বিচ্ছিন্নতার বোধ জারিত করেন কী সুন্দরভাবে – তাঁর লেখায় কোনো দেশ, সময় বা স্থানের নাম থাকে না; এমনকি প্রকৃতির আইনও কাজ করে

না (মানুষ পোকা হয়ে যায়), সামাজিক রীতিও মানা হয় না ('এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের বুড়ো ডাক্তার শীতের নগ্ন পৃথিবীতে 'এই সবচেয়ে অসুখী সময়ের তুষারের সামনে অনাবৃত হয়ে' অনন্তকাল ঘুরে বেড়ান); পারিবারিক নিয়মও শ্রদ্ধা করা হয় না (ছেলে বিয়ে করবে তাই বুড়ো বাবা 'রায়' গল্পে ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন)। আরো বেশি স্তম্ভিত হতে হয় তাঁর নিজের লেখা থেকে তাঁর দূরত্বের ব্যাপারটি দেখলে। তাঁর উদ্ভট, নিষ্ঠুর, অবিচারের ঘটনাগুলোয় আমরা দেখি লেখক কত নিস্পৃহভাবে অনুপস্থিত, কখনোই তিনি কোনো পক্ষ নিচ্ছেন না, কখনোই কোনো কিছুতে একটুও অবাক হচ্ছেন না; এর বদলে, সবসময় পক্ষপাতশূন্য, নৈর্ব্যক্তিক এক ভঙ্গিতে গল্প বলে যাচ্ছেন। তাঁর লেখা কেন প্রাসঙ্গিক, কেন আমরা তা পড়ব, এর উত্তরে কাফকার বিখ্যাত ডায়েরি এন্ট্রির কথাটাই মাথায় আসে। আমরা তা পড়ব, কারণ এতে ধরা আছে 'Das Negative meiner Zeit' – 'তাঁর সময়ের নেতিবাচকতা।' কাফকা ডায়েরিতে লিখছেন:

> আমি প্রচণ্ডভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছি আমার সময়ের নেতিবাচক বিষয়গুলো। এমন এক সময়ে আমি বাস করছি যা, অবশ্যই আমার অনেক কাছের, যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আমার কোনো অধিকার নেই, তবে – যেন-বা – এই সময়টার প্রতিনিধিত্ব করার আমার অধিকার আছে।

কাফকার পৃথিবী এ রকম অ্যান্টি-পৃথিবী বলেই, তা ইতিহাসের নেতিবাচক দর্পণ বলেই ফরাসি কম্যুনিস্টরা কাফকা নিয়ে ওরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

'আমি সাহিত্যে গড়া'

আমরা ফ্রানৎস কাফকার *গল্পসমগ্র* পড়ব আর সাহিত্যচর্চা তাঁর কাছে কত বড় পূজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ এক এবাদত ছিল তা জানব না, তা হয় না।

কাফকার ডায়েরিতে ও চিঠিতে আমরা দেখি, যতবারই কাফকা বিয়ের চিন্তা করেছেন, ততবারই তাঁর সাহিত্যচর্চাই তাঁর কাছে প্রধান বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। কোনো ভাষাই নেই এটুকু সত্য বোঝানোর জন্য যে, সাহিত্য তাঁর কাছে তার বেঁচে থাকার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ার একবার যখন বার্লিনে কাফকার চিঠিগুলো এক হাতের-লেখা-বিশারদকে দেখতে দিলেন, সেই লোক বলেছিলেন, এই হাতের লেখা যার, তার 'সাহিত্যে আগ্রহ' আছে। ফেলিসকে কাফকা উত্তরে বলেছিলেন: 'আমার সাহিত্যে আগ্রহ নেই, আমি সাহিত্য দিয়েই গড়া; আমি আর অন্য কিছু না, অন্য কিছু হতেও পারব না।' তিনি মনে করতেন, বিয়ে করলে তাঁর জীবন থেকে সাহিত্যের জন্য প্রয়োজনীয় নির্জনতাটুকু তিনি হারাবেন। কিন্তু সেই নির্জনতা তিনি যখন খুঁজে পেতেন, তখনো সাহিত্য তাঁর কাছে কঠিন ও হতাশাজনক কিছুই হয়ে থাকত। কাফকার ডায়েরি তাঁর লেখার অক্ষমতা নিয়ে নিজেকে ভর্ৎসনায় ভরপুর। শুধু একবারই তিনি কোনো সচেতন চেষ্টা ছাড়া,

স্বাচ্ছন্দে লিখতে পেরেছিলেন। সেই রাতটা ছিল ১৯১২ সালের ২২-২৩ সেপ্টেম্বর রাত; ২২ তারিখের রাত ১০টা থেকে ২৩ তারিখ সকাল ৬টা পর্যন্ত একটানা আট ঘণ্টায় তিনি লিখে ফেলেছিলেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'রায়' এবং এটি লেখার মধ্য দিয়েই নিজের লেখনীশক্তি তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন – কাফকা কাফকা হয়ে উঠেছিলেন। পরদিন তিনি ডায়েরিতে লিখলেন: 'একমাত্র *এভাবেই* সম্ভব লেখালেখি, একমাত্র এরকম প্রাঞ্জলভাবেই, শরীর ও আত্মা এরকম সম্পূর্ণ খুলে দেওয়ার মাধ্যমেই।' তাঁর এই প্রথম সাহিত্যিক সাফল্য আসে ফেলিসের সঙ্গে পরিচয়ের মাত্র এক মাসের মধ্যে। তিনি ম্যাক্স ব্রডকে বলেন, গল্পের শেষ লাইনটি লেখার সময় – অর্থাৎ 'সে সময় সেতুটার উপর দিয়ে পার হচ্ছে রীতিমতো অফুরন্ত স্রোতে যানবাহন' – এই বাক্যের শেষ শব্দটি 'Verkher' (অর্থাৎ traffic বা যানবাহন) লেখার সময় তিনি ভেবেছিলেন 'শক্তিশালী এক বীর্যপাতের' কথা। 'Verkher' শব্দের জার্মান অর্থ একই সঙ্গে 'যানবাহন' ও 'বীর্যপাত' বা 'যৌনমিলন'। এখানে শব্দটি 'যানবাহন' অর্থে ব্যবহৃত হলেও, কাফকা যেহেতু ব্রডকে এরকম কথা লিখেছেন, তাঁর মানে কি এই যে তাঁর যৌনকামনা, ফেলিস তা জাগ্রত করার পর, তাঁর লেখালেখির মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছিল?

সফল সার্থক লেখার অনুভূতি কাফকার জন্য শুধু ওরকম চূড়ান্ত আনন্দের কিছু ছিল, কেবল তা-ই নয়; সার্থক কোনোকিছু লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর জীবনের দুঃখ-কষ্ট থেকেও দূরে সরতে চাইতেন। প্রায়ই দেখা যেত কষ্টের কোনো ঘটনার পরেই কাফকার সৃজনীশক্তি জেগে উঠত। ফেলিসের সঙ্গে বাগ্‌দান ভেঙে যাওয়ার পরে, ফেলিসের বান্ধবী গ্রেটে ব্লখের সঙ্গে গোপনে প্রেম করবার শাস্তিস্বরূপ বন্ধুদের সঙ্গে হোটেলে 'বিচারপর্বে' (tribunal) বসার পরেই, তিনি লিখলেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস *বিচার* ও মারাত্মক গল্প 'দণ্ড উপনিবেশে' – দুটি কাহিনীই ন্যায়বিচারের মেটাফর (রূপক)। *দুর্গ* উপন্যাসটিও তেমন – এটি তিনি শুরু করেন মিলেনার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে হবে এমন সময়ে। লেখার মাধ্যমে জীবনের উচ্চতর দৃষ্টিকোণ অর্জন করে কাফকা তাঁর অর্থহীন আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মগ্লানি থেকে কিছুটা হলেও বাঁচবার পথ খুঁজে পেতেন। ১৯২২ সালে তিনি লিখলেন, লেখালেখির সান্ত্বনা এটাই যে এর মাধ্যমে 'খুনিদের লাইন' থেকে তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন, আর সৃষ্টি করতে পারেন 'আরো উচ্চতর ধরনের এক দেখার চোখ, উচ্চতর, ধারালোতর নয়; আর সেটা যত বেশি উঁচু হয়, খুনিদের লাইন থেকে (আমার অস্তিত্ব) তত দূরে সরে যায়; সেটা যত তার নিজের গতির আইন মেনে চলে, ততই তার পথ হয়ে ওঠে আরো অগণনীয়, আনন্দময় ও ঊর্ধ্বগামী।'

একই সঙ্গে কাফকা ভাবতেন যে, লেখালেখি তাঁর কাছে নিজের 'মনশ্চিকিৎসা'র চেয়ে অনেক বেশি কিছু। লেখালেখির মধ্য দিয়ে 'নবযুগের' সূচনা হয় বলে ভাবতেন তিনি। ১৯১৬ সালে কাফকা তাঁর প্রকাশকের কাছে স্বীকার করলেন, 'দণ্ড

উপনিবেশে' গল্পটি আসলেই বেদনাদায়ক একটি গল্প; ব্যাপারটা তিনি ব্যাখ্যা করলেন এভাবে: 'আমাদের ইতিহাসের এই যুগ, বিশেষ করে আমার এই সময়টি, সত্যিই অনেক বেদনাদায়ক।' পরের দিকে এসে তিনি তাঁর লেখালেখিকে বললেন 'ধাঁধায় ভরা এক মিশন'।

> *এক গ্রাম্য ডাক্তার*-এর মতো লেখা লিখে আমি এখনো খুব বেশি হলে ক্ষণস্থায়ী একধরনের তৃপ্তি পেতে পারি, এ ক্ষেত্রে ধরে নিচ্ছি যে ওরকম আরো লেখা আমার পক্ষে সম্ভব (যদিও খুবই অসম্ভব ঠেকছে ব্যাপারটা); কিন্তু সুখ পেতে পারি কেবল তখনই যখন আমার পক্ষে সম্ভব হবে
> পৃথিবীকে তার শুদ্ধ, সত্য ও পরিবর্তনের-অতীত রূপে তুলে ধরা।

এ কথার কী অর্থ (...'raise the world into the pure, the true, the unchangeable') তা বোঝা দুরূহ; তবে এটুকু পরিষ্কার যে লেখালেখি তাঁর কাছে ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ছিল। তিনি পৃথিবীর মূল সত্য, আদি ও অপরিবর্তনীয় মূল রূপটিকে – তা শুভ হোক আর অশুভ হোক, কিছু যায়-আসে না; অন্তত তাঁর কাছে সত্য রূপ বলে মনে হলেই হল – তাঁর লেখালেখির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাইছিলেন। তিনি যখন একই প্রসঙ্গে বলেন, লেখালেখি তাঁর কাছে 'প্রার্থনা'র মতো, তখন হঠাৎই বিভ্রম বোধ হয় যে (যেমনটা কাফকার লেখার ধর্মীয় ব্যাখ্যাদাতারা বলেন), সত্যিই কি কাফকা নিজেকে 'পয়গম্বর' বলে মনে করতেন?

কাফকা-ব্যাখ্যা – ধর্মীয় ব্যাখ্যা

আগেই বলেছি, কাফকার সাহিত্যকর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়েছে অগুনতি রকমের। কোনো কাফকা-ব্যাখ্যারই গভীরে যাওয়ার জায়গা এটি নয়; অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য ওই ছোঁয়াটুকুই যথেষ্ট। তার পরও যতগুলো কাফকা-ব্যাখ্যা হয়েছে (বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কাফকা ব্যাখ্যার মোট ১৯ রকমের মূলধারা আছে), যেমন অস্তিত্ববাদী ব্যাখ্যা, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণবাদী ব্যাখ্যা (তিনি ডায়েরিতে লেখেন যে, 'রায়' গল্পটি লেখার সময়ে তাঁর মাথায় 'ফ্রয়েডের চিন্তা, স্বাভাবিকভাবেই' এসেছিল), মার্ক্সিস্ট ব্যাখ্যা, মেটাফিজিক্যাল ব্যাখ্যা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যাখ্যা, অ্যাবসার্ড সাহিত্যিক ব্যাখ্যা, এক্সপ্রেশনিস্ট ব্যাখ্যা, সামাজিক ব্যাখ্যা, রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, দার্শনিক ব্যাখ্যা, নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, আত্মজৈবনিক ব্যাখ্যা, আইনি ব্যাখ্যা, ইত্যাদি ইত্যাদি, এর মধ্যে আজও অন্যতম জোরালো ব্যাখ্যা হিসেবে – মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সূত্রের নিরিখে কাফকা-ব্যাখ্যা এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোকে কাফকা-ব্যাখ্যার পাশাপাশি – টিকে আছে কাফকা-সাহিত্যের ধর্মীয় ব্যাখ্যা। মৃত্যুর পরে যেহেতু ম্যাক্স ব্রডের হাত ধরেই কাফকার বিশ্বসাহিত্যে প্রবেশ এবং ব্রড যেহেতু বিশ্বাস করতেন কাফকার লেখাকে দেখতে হবে 'ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে ব্যক্তিমানুষের ঈশ্বরকে খোঁজার আধ্যাত্মিক এক

নিরন্তর সংগ্রাম হিসেবে', আর সেই সঙ্গে কাফকার প্রথম ইংরেজি অনুবাদক উইলা ও এডুইন মুইরও যেহেতু সেই বিশ্বাস মাথায় রেখেই কাফকা-অনুবাদ করেন, কাফকার ধর্মীয় ব্যাখ্যাটি তাই রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে 'কাল্ট'-এর আকার ধারণ করে। আমরা এখানে কাফকার সৃষ্টিকর্মের আজও এই সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যাখ্যাটি নিয়ে সামান্য আলোকপাত করব।

ধেয়ান নামের গল্পসংকলনে আছে কাফকার অন্যতম বিখ্যাত স্কেচ 'গাছ'। পুরো লেখাটি এ রকম:

> যেহেতু আমরা হচ্ছি তুষারে গাছের গুঁড়িগুলোর মতো। আপাত-চোখে ওগুলো কী সুন্দর, তুষারের উপরে, পড়ে আছে মাটিতে; আর হালকা একটা ধাক্কাতেই আমরা ওদের সরাতে পারব মনে হয়। না, আপনি তা পারবেন না, কারণ ওরা শক্ত করে মাটিতে গাঁথা। কিন্তু দেখুন, সেটাও স্রেফ আপাত-অর্থেই।

এই লেখার কী মানে হয়? নিট্‌শের মতোই কাফকা এখানে বলছেন, 'পৃথিবীর আর কোনো নিরাপদ ভিত্তি নেই, ভিত্তি সরে গেছে।' তুষারের মধ্যে বড় হওয়া গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে ওরা দাঁড়িয়ে আছে শক্তপোক্তভাবে, কিন্তু ওদের ধাক্কা দিয়ে সরানো সম্ভব। তবে আমরা সরাতে চাইলেই গাছগুলো থেকে বাধা আসছে, মনে হচ্ছে আমাদের চেয়ে ওদের শিকড় আরো গভীরে পোক্ত। কিন্তু ওদের এই মাটির গভীরের শিকড় একটা 'ইল্যুশন' বা অলীক কল্পনা মাত্র। দেখতে যাকে সবচেয়ে পোক্ত ভিত্তির মনে হয়, তার ভিত্তি আসলে অত পোক্ত আদৌ নয়। নিট্‌শের ক্ষেত্রে এই হালকা ভিত্তির কারণ: ইউরোপে 'ঈশ্বর মারা গেছেন।' সেটা এ কারণে শুধু নয় যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস ধসে গেছে; বরং এ কারণেও যে মানুষ চাইছে – বিদ্রোহীর মতো – তাদের নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ঈশ্বরের হাত থেকে কেড়ে নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে। ইউরোপে ঈশ্বর-অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী তার আগের সেই স্পষ্ট দিগন্তরেখা, স্পষ্ট অর্থ এবং দৃঢ় ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে। যুদ্ধ, নির্যাতন, ক্ষুধা, নিগ্রহ ও নির্বিচার অবিচারের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আর কোনো সূত্র নেই, শরণ নেই, কিসের বরাতে জীবনকে দেখব তার আর কোনো বিধিমালা নেই, মানুষ আর পারছে না পৃথিবীকে অন্ধকার পথের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ঠেকাতে; কোনো অভিভাবক নেই, কর্তা নেই, যিনি কিনা আমাদের জন্য তা ঠেকাবেন।

কাফকা বারবার ওরকম এক পরিস্থিতির ছবি এঁকেছেন যেখানে আমাদের অভিভাবক, আমাদের কর্তা, আরো আরো দূরে সরে গেছেন, অনতিক্রম্য দূরে, যেন নির্বাসনে। সে জন্যই কাফকার শ্রেষ্ঠতম একটি লেখা 'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা'য় (এক *গ্রাম্য ডাক্তার* গল্পসংকলনে আছে) আমরা দেখি সম্রাট তাঁর বার্তাবাহককে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে, কিন্তু সেই 'অপরাজেয়', 'শক্তিশালী' বাহক নানা গোলকধাঁধার চক্করে পড়ে আমাদের কাছে মৃত সম্রাটের বার্তাটি আর পৌঁছাতেই পারল না। 'কিন্তু', গল্পটি এভাবে শেষ হচ্ছে, 'তুমি

বসে থাকো তোমার জানালায়, আর যখন সন্ধ্যা নামে, তুমি স্বপ্নে কল্পনা করে নাও ঐ বার্তার'। ঈশ্বর যদি সত্যিই মারা গিয়েও থাকেন আমরা তবু ঐ ঐশ্বরিক বার্তার আশায় বসে থাকি; কিন্তু যখন কোনো বার্তা, কোনো সাহায্যই আসে না, যখন ধুম করে চাকরি হারিয়ে একটা পরিবার রাস্তায় ভিক্ষার জন্য বসে যায়, বা যখন বিনাবিচারে পুলিশ আমাদের কারাগারে ঢুকিয়ে দেয়, তখন আমরা মনে মনে কল্পনা করে নেই সে বার্তার, খোদার থেকে পাব এমন কোনো সান্ত্বনার।

কাফকার উপন্যাসগুলোতে আমাদের যিনি বাঁচাবেন তাঁর এই অনুপস্থিতি অধিকাংশ সময়েই ধর্মীয় রূপকল্পে তুলে ধরা হয়েছে। *আমেরিকা* উপন্যাসে নিউইয়র্ক শহরের গির্জা দেখা যাচ্ছে কুয়াশার মধ্যে ডুবে আছে, কিন্তু পোলান্ডারের গ্রামের বাড়িতে কোনো গির্জাই নেই, বিল্ডিংটার আধুনিকায়নের কাজে ওটা পরিত্যক্ত করে রাখা হয়েছে। *বিচার* উপন্যাসের ক্যাথেড্রালটি বিশাল, অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রায় ফাঁকা; জোসেফ কে.র কাছে ওটা মূলত একটা 'ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন'। কবরে রাখা যিশুর একটা ছবি, জোসেফ কে. টর্চলাইটের আলোয় ছবিটা টুকরো-টুকরোভাবে দেখতে পাচ্ছে, একবারে পুরোটা কখনো নয়, তারপর একসময় সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল, কারণ ওটা ইদানীংকালের আঁকা একটা ছবি মাত্র। ক্যাথেড্রালের এই অন্ধকার দেখে আমাদের মনে পড়ে নিট্‌শের পাগলের সেই সর্বনাশা কথা: 'চার্চগুলো এখন আর খোদার কবর ও মনুমেন্ট ছাড়া আর কী?' কাফকার শেষ উপন্যাস *দুর্গ*তে আমরা দেখি কীভাবে তিনি কে.র নিজের শহরের চার্চের সঙ্গে এই দুর্গের তুলনা দিচ্ছেন। দুর্গটি দেখতে দুর্গের মতো লাগছে না। তাহলে দুর্গের চেহারা নিয়ে কে.-র যে প্রত্যাশা, তা মিটবে কীভাবে? দুর্গে তো অভিভাবকেরা থাকেন, তাঁদের থাকার জায়গার চেহারাই যদি অমন হয়, তাহলে তাদের নিজেদের চেহারা কেমন হতে পারে? তাহলে এই হচ্ছে গ্রামের মানুষের কর্তার ছবি? আর দুর্গটা যদিও গ্রামের পেছনে অনেক উঁচুতে, কিন্তু ওটা দেখতে তো গ্রামের থেকে আলাদা কোনো কিছু লাগছে না। কাফকা কি এখানে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে আজকাল মানুষ যে কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে (অর্থাৎ খোদা), তা আসলে তাদের নিজেদের কল্পনা দিয়েই গড়া কোনোকিছু?

বারবার কাফকার লেখার এই 'চার্চ' তাঁর সময়ের প্রাগের চিত্রকেই তুলে ধরে, তাঁর ইহুদি পরিবারকে নয়। কাফকার জন্মস্থানের কয়েক গজের মধ্যেই চারটি বিশাল বিশাল চার্চ, পুরো প্রাগ ভরে আছে বিশালায়তন সব চার্চে। খ্রিস্টধর্ম তাঁর কাছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা হিসেবে একদম তাঁর চোখের সামনেই ছিল সব সময়। তবে তাঁর লেখায় যে চার্চগুলো আছে, তাদের কী ব্যাখ্যা, তা বলা দুরূহ। 'রায়' গল্পে গেয়র্গের বন্ধু থাকে রাশিয়ার পিটার্সবার্গে, অর্থাৎ পিটারের শহরে, আমাদের মনে আসে সেন্ট পিটার ও রোমের কথা। তারপর গল্পের সেই বিধ্বংসী দৃশ্য: কিয়েভ শহরের এক যাজক মানুষের অনেক বড় এক ভিড়ের সামনে

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তার হাতের তালু কেটে একটা ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন। কেন? আর গেয়র্গের বাবা যখন গেয়র্গকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন, গেয়র্গ যখন সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামছে, তখন ঠিকে-ঝি চিৎকার করে উঠল: 'যিশু'; ব্রিজটা থেকে ঝুলন্ত গেয়র্গকে নিশ্চয় ঝুলন্ত ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতোই দেখতে লাগছিল। 'রূপান্তর' গল্পে পোকা হয়ে যাওয়া গ্রেগরের দিকে তাঁর অভিভাবক পিতা আপেল ছুড়ে মারলেন, সে তখন 'ঐ জায়গাতেই যেন পেরেকে গেঁথে গেল' – আবার সেই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি মনে আসে আমাদের। 'দণ্ড উপনিবেশে' গল্পে শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির আলোকপ্রাপ্তি ঘটে 'ষষ্ঠতম ঘণ্টায়।' 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের অসুস্থ ছেলেটিকে জানালা থেকে তাকিয়ে দেখে দুটি ঘোড়া; আস্তাবলে যিশুর জন্মের উল্টো ছবি যেন। 'এক অনশন-শিল্পী' গল্পে অনশন-শিল্পী খায় না '৪০ দিন'। ঠিক ৪০ দিনই কেন? যিশুর জনহীন-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো, উপোস করা সেই ৪০ দিনের কথাই কি মনে আসে না এটি পড়লে?

বাইবেলের এসব পরোক্ষ-উল্লেখ বিভ্রান্তিকরই ঠেকে, মনে হয় কাফকা খ্রিস্টধর্মের মূল্যবোধগুলো নিয়ে ক্রিটিক করছেন। নিট্‌শের পাঠক হিসেবে কাফকা নিঃসন্দেহে ধর্ম নিয়ে নিট্‌শের সমালোচনাগুলো (বিশেষ করে খ্রিস্টধর্ম নিয়ে করা যেগুলো) জানতেন। নিট্‌শে অস্বীকার করেছিলেন যে খ্রিস্টধর্মের নৈতিক বিষয় ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আসমানি কোনো ব্যাপার আছে। নিট্‌শের হিসেবে নৈতিকতা বিষয়টি ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, কোনো অবিনশ্বর-একক নৈতিকতা বলে কিছু নেই, আর ধর্মীয় নৈতিকতার এত জয়গান এজন্য না যে ওগুলোর মধ্যে আহামরি কোনো উৎকর্ষতা আছে, বরং এজন্য যে, যারা ওগুলো মেনে চলে তারা পৃথিবীতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানুষ হয়। নিট্‌শে আরো বলেন, ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের যাজক-জাতীয় লোকেরা মূলত অসুস্থ, প্রাণহীন, খোঁড়া মানুষ আর তারা তাদের ততোধিক দুর্বল শিষ্যদের ওপর খবরদারি চালায় তাদের কৌশলে, মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়ে। এই আলোকে দেখলে কাফকার 'রায়' গল্পের নিজেকে আহত করা সেই যাজক হয়ে ওঠে নিট্‌শের *The Genealogy of Morals*-এর অসুস্থ যাজকেরই একটি ছবি, যে যাজকের ক্ষমতার কেন্দ্রে আছে তার শিষ্যদের অসুস্থতার বোঝা বহনের গল্প। আমরা দেখি, 'রূপান্তর' গল্পের স্বার্থপর পরিবারটি যখন গ্রেগরের মৃত্যুর খবর পায়, তারা তাদের বুকে, স্বস্তিতে, ক্রুশচিহ্ন আঁকে। *আমেরিকা* উপন্যাসে কাজের মেয়ে ইয়োহান্না ব্রামার কার্লকে যৌনভাবে ব্যবহার করার পরে একটা কাঠের ক্রুশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করে। 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের ডাক্তার এটা ভেবে ব্যথিত যে তার রোগীরা তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস তাদের অপদার্থ যাজককে বাদ দিয়ে এখন এই বুড়ো ডাক্তারের ওপর অর্পণ করেছে:

> তাদের আগের সেই ধর্মবিশ্বাস তারা হারিয়ে ফেলেছে; যাজক বসে আছে বাড়িতে আর তার বেদিতে পরার পোশাক এক এক করে ছিঁড়ে ফেলছে; কিন্তু

ডাক্তারের কাছ থেকে তাদের আশা যে তিনি তার শল্যচিকিৎসকের নাজুক হাত দিয়ে সব অসম্ভবকে সম্ভব করে দেবেন।

কাফকার লেখায় – উপরের এসব খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে যোগাযোগের উদাহরণের পাশাপাশি – ইহুদিধর্ম ও জায়োনিজমের যোগাযোগের বিষয়টা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দুই ধর্মের তাত্ত্বিকেরাই যার যার মতো করে অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরেছেন কাফকার গল্প, উপন্যাস, ডায়েরি, চিঠি ঘেঁটে। জায়োনিস্ট আন্দোলনের মতো একটি বাস্তবভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি কাবালার (Kabbalah; ইহুদিদের গূঢ় রহস্যময় ধর্মীয় গুপ্তবিদ্যা) দৃষ্টিকোণ থেকেও কাফকাকে দেখা হয়েছে। *বিচার* উপন্যাসের দৃশ্যকল্পগুলো – যেমন এর বিচারকেরা, দ্বাররক্ষকেরা, এর ঘোঁরানো-প্যাঁচানো সিঁড়িগুলো – বলা হয়েছে কাবালার অনেক সূত্র ও মন্ত্রের সঙ্গে মিলে যায়; যদিও কাফকা *বিচার* উপন্যাস লেখার সময়ে কাবালা বিষয়ে কতটুকু জানতেন তা নিয়ে বিরাট সন্দেহ আছে। কাফকার ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখানে খ্যাতিমান দার্শনিক ওয়াল্টার বেন্‌জামিন ও ধর্মতাত্ত্বিক গেরশোম শোলেম (বর্তমানে যাকে কাবালা-বিদ্যা ও আধুনিক জার্মান-ইহুদি চিন্তার অন্যতম বড় স্তম্ভ হিসেবে দেখা হচ্ছে)-এর মধ্যকার বিতর্কের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। বেন্‌জামিন খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন ম্যাক্স ব্রড ও অন্যদের খাড়া করা 'অনায়াসলব্ধ' ধর্মীয় ব্যাখ্যা পড়ে (তিনি ব্রডের লেখা কাফকা জীবনীগ্রন্থটি অন্যদের পড়তেই মানা করেছিলেন; তাঁর হিসেবে এতই ফালতু ওই বই); তাঁর ভাষ্যমতে, কাফকার কল্পনাগুলো পৃথিবীতে ধর্মের উদ্ভব ঘটারও আগের সময়কার বিষয়, কাফকার চিন্তার সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের চিন্তার যোগাযোগ আছে, কাফকার এই 'প্রাচীনতা' (যদিও তিনি 'আধুনিকতাবাদী' বা মডার্নিস্ট লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ) ধর্ম ঘটবার আগের ঘটনা। আর শোলেম উত্তরে বলেছিলেন, যা-ই বলা হোক-না কেন, কাফকা ঐশ্বরিক বার্তার আলোকেই তাঁর পৃথিবীর ছবিটি এঁকেছিলেন, কিন্তু সেই বার্তার তিনি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে যেতে পারেননি, কারণ তিনি বার্তাটির ঠিকভাবে পাঠোদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। শোলেমের মতে, কাফকা 'নেগেটিভ' বা 'নেতিবাচক' ধর্মতত্ত্বের বার্তাবাহক, ইতিবাচক ধর্মীয় বিশ্বাসের নয়।

যা-ই হোক, আপনি যতই কাফকা পড়বেন, বিশেষ করে তাঁর ডায়েরি, ততই আপনার কাছে পরিষ্কার হবে যে, কাফকার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মানুরাগী কারো খুশি হওয়ার কিছু নেই। আপনি ধাঁধায় পড়ে যাবেন এটা ভেবে যে, কাফকা কি ঈশ্বরের প্রশংসা করছেন, নাকি ঈশ্বরের সমালোচনা করছেন, নাকি ঈশ্বরের বাণী যে মানুষেরা বহন করে তাদের ব্যাপারে সন্দেহ-অবিশ্বাস-সংশয় প্রকাশ করছেন? আর সেই সঙ্গে কাফকার ঈশ্বর কি খ্রিস্টান ঈশ্বর, নাকি ইহুদি ঈশ্বর, নাকি অন্য কোনো ধর্মের ঈশ্বর? কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতিই তিনি মিত্রতা দেখাননি – এটুকু পরিষ্কার।

যতজন ধর্মবেত্তা ও দার্শনিক কাফকার মন কেড়েছিলেন, তাঁর মধ্যে একমাত্র সোরেন কিয়ের্‌কেগার্ডের (১৮১৩-১৮৫৫) সঙ্গেই ছিল তাঁর কিছুটা বিশেষ এক সম্পর্ক।

১৯১৩ সালে কাফকা প্রথম কিয়ের্‌কেগার্ড পড়েন। তিনি দেখতে পান যে ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌দান ভেঙে যাওয়ার ঘটনার (যার মূল উৎস ছিল বিয়ে করলে সাহিত্যচর্চায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে এমন একটা ভীতি) সঙ্গে ধর্মের টানে কিয়ের্‌কেগার্ডের রেজিনা ওলসেন-এর সঙ্গে বাগ্‌দান ভেঙে যাওয়ার ঘটনার মিল আছে। ১৯১৭-১৮ সালে তিনি নতুন করে কিয়ের্‌কেগার্ড পড়া শুরু করেন, ব্রডকে লেখা চিঠিতে বিস্তারিত লিখতে থাকেন কিয়ের্‌কেগার্ড প্রসঙ্গে। কাফকা বিশেষভাবে মুগ্ধ হন কিয়ের্‌কেগার্ডের *Fear & Trembling* বইয়ের পিতা-পুত্রের কাহিনী – হজরত ইবরাহিম ও তাঁর ছেলে ইসমাইলের কুরবানির কাহিনী – পড়ে। ছেলেকে কুরবানি দিতে রাজি হওয়ার মধ্যে দিয়ে ইবরাহিম সামাজিক নৈতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে (অর্থাৎ পুত্রহত্যা করতে রাজি হয়ে) তাঁর পিতৃসুলভ নৈতিকতাবোধ ছাড়িয়ে গিয়ে, খোদার সেবায় সবকিছু উৎসর্গ করতে সম্মত হয়েছিলেন। অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রত্যয় খুব ভালোভাবেই সামাজিক নৈতিকতার বিপক্ষেও দাঁড়িয়ে যেতে পারে – এমনটাই বলেছিলেন কিয়ের্‌কেগার্ড। কাফকা বললেন অন্য কথা।

ইবরাহিম-ইসমাইলের ঘটনায় তাঁর মনে হল ধর্মবিশ্বাস আসলে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত একটি বিষয়, যার নির্ণয় শুধু খোদাই করতে পারেন; এখানে সামাজিক নৈতিকতার আগে – ঐ কুরবানির ঘটনায় – বিবেচনা করতে হবে ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে। কাফকার আরো মনে হল, যে মানুষ তার চরিত্র দৃঢ় রাখতে পারে, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অটুট রাখতে পারে (যদিও বাবা-মা ও শিক্ষকেরা সবসময়ে চেষ্টা করেন এটা খর্ব করতে), সেই মানুষের প্রতি শয়তান ও ফেরেশতা, দুই-ই আকৃষ্ট হয়, এর ফলে তার পক্ষে পরম ভালো কাজ ও চরম খারাপ কাজ – দুটোই করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

কিয়ের্‌কেগার্ড এভাবেই কাফকাকে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো মানবসমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখার চশমাটা ধার দিলেন, ধর্মীয় কাঠামোর আয়তনে জীবনকে দেখার স্পৃহা জাগালেন। কাফকা বুঝতে পারলেন, লেখালেখি শুধু নিজের জন্য নয়, শুধু নিজের সৃজনীক্ষুধা মেটাবার জন্য নয়, বরং এর মাধ্যমে বৃহত্তর মানবসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব, অর্থাৎ লেখালেখির কোনো উচ্চতর লক্ষ্যও থাকতে পারে। এভাবেই – উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছানোর তাড়না থেকেই – কাফকার লেখালেখি তাঁর অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল, কাফকা তাঁর অস্তিত্বের একটা ন্যায্যতা খুঁজে পেলেন এর মধ্যে দিয়ে। তাঁর লেখার প্রয়োজনটা হয়ে উঠল অস্তিত্ববিষয়ক বা অস্তিত্ববাদী, বা ধার্মিক প্রয়োজন। *বিচার* উপন্যাস লেখার সময় তিনি ডায়েরিতে লিখলেন:

> দু বছর আগে যেমনটা ছিলাম [অর্থাৎ 'রায়' গল্প লেখার সময়ে] আজ আর আমি আমার লেখার মধ্যে সেরকম সুরক্ষিত অবস্থায় নেই...তার পরও আমি জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছি; আমার রোজকার শূন্য, পাগলাটে, ব্যাচেলরের মতো জীবনের একটা ন্যায্যতা খুঁজে পেয়েছি।

শেষদিকের কাফকা শুধু তাঁর নিজের জীবনের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি ও একটি কারণ বা ন্যায্যতা খুঁজে ফেরেননি, তিনি সেটি – পয়গম্বরদের মতোই – আমাদের সবারটার জন্যও হন্যে হয়ে খুঁজেছেন। তিনি তখন নিজেকে দেখেছেন তাঁর সময়ের আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে। ১৯১৮-র ২৫ ফেব্রুয়ারির নোটবুকে আমরা তাঁকে এক রহস্যময় আধ্যাত্মিক মিশনের সঙ্গে লড়াইরত দেখি:

> আমি যদ্দুর জানি, জীবনের জন্য দরকারি এমন কিছুই আমি সঙ্গে আনিনি, শুধু এনেছি মানুষের চিরকালীন ও সর্বজনীন দুর্বলতাগুলো। এভাবেই...খুব শক্তিশালীভাবেই আামি আত্মস্থ করে নিয়েছি আমার সময়ের নেতিবাচক দিকগুলো...। কিয়ের্কেগার্ডকে যেভাবে খ্রিস্টধর্ম –মানতেই হবে ওই ধর্ম এখন আলগা হয়ে পড়েছে, ব্যর্থ হচ্ছে – জীবনে হাতে ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে, আমাকে তা নেয়নি; কিংবা জায়োনিস্টরা যেভাবে ইহুদিদের প্রার্থনার শালের প্রান্ত – ওটাও এখন আমাদের থেকে পালিয়ে যাচ্ছে – ধরতে পেরেছে, আমি তা পারিনি। আমিই শেষ কিংবা আমিই শুরু।

'আমিই শেষ কিংবা আমিই শুরু' – শেষ কথা

কাফকা যখন বলেন, তিনি হয় শেষ, না-হয় তিনি শুরু, অর্থাৎ তাঁর মধ্যেই আছে একটা সমাপ্তি বা একটা আরম্ভ, তিনি পুরোপুরি ভুল বলেন না। তিনি অর্ধেক ঠিক কথা বলেন। একভাবে দেখলে তিনি সমাপ্তি তো বটেই: তাঁর পথ ধরে আর বেশি দূর যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়; যে ভয়ংকর পৃথিবী তিনি তাঁর মাথার মধ্যে বয়ে চলেছিলেন, তার সামান্য অংশ মাথায় আনলেও সাধারণ মানুষ স্ট্রোকে বা দুর্ঘটনায় মারা যাবে (এ প্রসঙ্গে কাফকার মৃত্যুতে মিলেনা য়েসেন্স্কার শোকবার্তাটি আবার পড়ুন)। কিন্তু থিমের দিক দিয়ে দেখলে, তিনি শুরু। তাঁর বিশাল ও মহান থিম – এর পূর্বপুরুষ নিট্শে ও কিয়ের্কেগার্ডে লুকানো থাকলেও, কথাসাহিত্যে কাফকার আগে কেউ তা ভাষা দেয়নি – হচ্ছে এ পৃথিবীতে বাস করার শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক টেনশন। আমাদের সময়ের আধুনিকতা, উদারনৈতিক চিন্তাচেতনা এবং তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফাঁকিটা ও ফাঁকটা কাফকা ধরতে পেরেছিলেন। সেজন্যই হয়তো কাফকার লেখা ভর্তি পুরনো প্রথা ও পুরনো বিশ্বাসে: পিতা, পিতার শাসন, আদালত, বিচার, দুর্গ, সম্রাট, অবিনশ্বর আইন ইত্যাদি। তাঁর বিখ্যাত গল্প চীনের মহাপ্রাচীর' (*গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডে দেখুন)-এ যূথবদ্ধ, একত্রিত এক জাতির কথা

বলার সময়, সেই জাতির একজন হতে পারার 'মহান' ব্যাপারটির কথা জানানোর সময়, কীভাবে কাফকা কাব্যিক হয়ে ওঠেন! আর 'আইনের দরজায়' গল্পে ভেতরে প্রবেশের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে থেকে লোকটা যখন ব্যর্থ এক জীবন কাটিয়ে মারা যাচ্ছে, তখন এই বোকা কিনা দেখে যে 'আইনের দরজাপথ থেকে ভেসে আসছে অনির্বাণ একটা দীপ্তি।'

কাফকার মতো চালাক সম্ভবত আর কেউ ছিলেন না; তাঁর মতো স্বচ্ছতা নিয়ে বিশ্বব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার ফাঁকগুলোও আর কেউ বোধ হয় ধরতে পারেননি। কাফকার রসবোধ (সেন্স অব হিউমার) নিয়ে চিন্তা করলেই মনে হয়, কীরকম গুরুতর সব পরিস্থিতিকে কীরকম কমিক বানিয়ে ছেড়েছেন তিনি। প্রাগের 'ক্যাফে স্যাভয়' তে তিনি যখন বন্ধুদের সামনে *বিচার* উপন্যাসের শুরুটা পড়ে শোনাচ্ছেন, তখন তিনি ও তাঁর বন্ধুরা হেসে কুটিকুটি। কেন? ওরকম ভয়ংকর এক ঘটনা দিয়ে যার শুরু – এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে তার বিছানায় এক সকালে আগন্তুকেরা এসে গ্রেপ্তার করে বসল, বিনা কারণে – তা পড়তে গিয়ে কাফকা ওরকম হাসছিলেন কেন? 'গায়িকা জোসেফিন বা ইঁদুর-জাতি' গল্পে সংগীতশিল্পী জোসেফিনকে নিয়ে কাফকা ওরকম মারাত্মক ব্যঙ্গ করেন কেন যে, জোসেফিন আসলে গান গায় না, সে অন্য ইঁদুরদের মতোই একটু কিচিরমিচির করে? জোসেফিন ভাবে সে তার জাতির ত্রাণকর্তা, আর গল্পের কথক কিনা বলে, 'হায় খোদা, জোসেফিন যেন কোনোদিন জানতে না পারে, আমরা যে তাকে শুনি সেটাই প্রমাণ করে যে সে সত্যিকারের কোনো গায়িকা নয়।' এ কেমন কথা? গল্পে গল্পে কাফকার এই বক্রোক্তি, ঠাট্টা, শীতল রসিকতা কখনো কখনো আমাদের উঁচু লয়ের হাসিতে ফেটে পড়তেও বাধ্য করে (যেমন গল্প: 'রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান', 'এক ছোটখাটো মহিলা', 'দি স্টোকার', 'প্রথম দুঃখ', 'এক অনশন-শিল্পী', 'গায়িকা জোসেফিন')। কাফকার এই যে জার্মান ভঙ্গিতে রস বা হিউমার, যা কমেডিও নয়, বা চাতুর্যপূর্ণ রসিকতাও (wit) নয়, আসলে জীবনের খুঁতগুলো খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়ে সেগুলো নিরাসক্তভাবে মেনে নেওয়ার তাঁর যে ভঙ্গি – যেন তিনি বোঝেন যে কেবল তিনিই ওগুলো বোঝেন, কিন্তু আমরা বোকারা বুঝি না – তারই প্রকাশ। আজ বিশটি বছর ধরে কাফকা পড়ার পরে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, কাফকার রসবোধ যে বুঝবে, গল্পে গল্পে তাঁর বাঁকা উক্তি ও খোঁটা ও ব্যঙ্গগুলো যে ধরতে পারবে, সে-ই দাবি করতে পারবে, সে কাফকা বুঝেছে।

কাফকার সব প্রধান নায়কেরা দেখবেন একটা মতিবিভ্রমের মধ্যে আছে – পোকা গ্রেগর ভাবছে সে পোকা হয়ে গেছে তো কী হয়েছে, তাকে অফিসে যেতে হবে; জোসেফ কে. তার বিচার হবে বলে সারাজীবন অপেক্ষা করছে; কে. দুর্গের লোকদের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য জীবনটা বরবাদ করে দিচ্ছে; সম্রাটের বার্তাবাহক দৌড়াচ্ছে আর দৌড়াচ্ছেই; গ্রাম্য ডাক্তার যতক্ষণে খেলাটা বুঝতে পেরেছেন,

ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে; আইনের দরজায় ঐ বুদ্ধু দাঁড়িয়েই আছে এই অপেক্ষায় যে দরজাটা কবে খুলবে; দণ্ড উপনিবেশে মৃত্যুদণ্ডের পুরনো প্রথায় বিশ্বাসী লোকটি ভাবছে এই পর্যটক তার ভয়ংকর বিচারব্যবস্থার পক্ষে রায় দিয়ে সব আবার ঠিক করে দেবেন। এদের কারো বিভ্রম, কারো ঘোরই, যেন কাটছে না। মোট ৪৬-৪৭টি গল্প-ছোট গল্প-স্কেচের ২৪টিতেই আমরা ওরকম মতিবিভ্রমের (delusion) মধ্যে-থাকা চরিত্রের খোঁজ পাই। আমরা অবাক হই, হাসি, ওদের জন্য আমাদের মায়া হয়।

মজার কথা হচ্ছে, কাফকার এ রকম কোনো মতিবিভ্রম বা অলীক বিশ্বাস ছিল না। তিনি পৃথিবীকে অতি, অতি স্পষ্ট করে দেখে ফেলেছিলেন, যেভাবে দেখলে নিজের আর কোনো বিভ্রম থাকে না, কেবল তখন অন্যের বিভ্রম নিয়ে ঠাট্টা করা যায়। কাফকা জেনে গিয়েছিলেন যে ক্ষমতাশালীরা টিকে থাকে বিভ্রম ছড়িয়ে, মিথ্যা বলে আর ভয় দেখিয়ে; আর ক্ষমতাহীনেরা বেঁচে থাকে ঐ ক্ষমতাশালীদের যে ক্ষমতা আছে তা কল্পনা করে নিয়ে। এরা দুই পক্ষই বড় বড় কথা বলে, ফাঁকা আওয়াজ ছাড়ে, কিন্তু ওদিকে এদের আন্ডারওয়্যারগুলো নোংরা, এদের প্রার্থনার পোশাকগুলো ধার করা, এদের বিচারালয়ে পর্নোগ্রাফি পড়ে থাকে সবার চোখের সামনে, এদের ন্যায়বিচারের মধ্যে মানুষ মেরে ফেলাও ন্যায়বিচারের লক্ষণ হিসেবে পড়ে। পার্থিব ক্ষমতাই শেষ কথা, বাকি সব দার্শনিকতা, ধর্ম, আন্দোলন – সব ফাঁকা বুলি; কাফকা খুব ভালোভাবে সেটা বুঝেছিলেন। তাঁর ভাষায় এটাকেই তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁর সময়ের 'নেতিবাচকতা'কে বুঝেছেন ও সেটির প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

যারা একবার কাফকা পড়েছেন তারা যে মুহূর্তে ধরে ফেলেন যে, কাফকা 'বুঝেছিলেন', কাফকা সত্যি জীবন, পৃথিবী, সমাজের সব খেলা 'বুঝেছিলেন', তখন তাঁর প্রতি মুগ্ধতা থেকেই তারা আর কখনো কাফকা ছাড়তে পারেন না। একসময় এই পাঠকেরা বুঝে যান যে, 'কাফকায়েস্ক' কথাটাও অর্থহীন, এ দুনিয়ার এত অনেক কিছুই 'কাফকায়েস্ক' যে, সেটার আর কোনো মানে থাকে না। বেকার যুবক যখন চাকরি পাওয়ার জন্য অফিসগুলোর বারান্দায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সেটাও 'কাফকায়েস্ক'; অসুস্থ রোগী যখন বড় হাসপাতালের বিরাট আয়োজনের মধ্যে কোনো ডাক্তার খুঁজে পায় না, যিনি তার সমস্যাটা বুঝবেন, সেটাও 'কাফকায়েস্ক'; টিভির পর্দায় ধুম করে যখন আমরা দেখি যে ক্ষমতাশালীরা কী সূক্ষ্ম কৌশলে সাধারণ মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে, সেটাও 'কাফকায়েস্ক', আর আদালতের দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে আমরা যখন দেখি যে আমাদের ফাইলটা অসহায়ের মতো পড়ে আছে নিচের দিকে, সেটাও কাফকায়েস্ক; আর গভীর রাতে ঘুমের মধ্যে মোবাইল ফোন বেজে উঠলে যে ভয় নিয়ে আমরা সেটা ধরি, আর শুনি ওপাশে, পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে কে যেন বলে উঠছে 'হ্যালো', সেটাও 'কাফকায়েস্ক'।

আমরা পছন্দ করি কি না-করি, কাফকা আমাদের এই আধুনিক সংস্কৃতির এক অমোচনীয় অংশ হয়ে গেছেন। নিরাপত্তাহীনতা আর আতঙ্কের যে বোধ কাফকা আমাদের মধ্যে জারিত করে গেছেন, আত্ম-উন্নয়নের লাখো বইয়ের কোনোটি পড়েই সেই বোধ আমাদের আর কাটে না। তাঁর 'সেন্স অব হিউমার' হাসির ছলে আমাদের দেখিয়ে দেয় যে আমরা কত ভুল, কত বোকা। আমাদের পাপবোধ, হতাশা, ন্যায়বোধ, আশা, পাপমোচন ও ভালোবাসা – সবকিছুর মধ্যেই কত বড় আধ্যাত্মিকতার অভাব ও ফাঁকি। তাই কাফকার আধ্যাত্মিকতা আমাদের জন্য সান্ত্বনা হয়ে আসে। তাঁর কল্পনাশক্তির অদ্ভুত লজিক একই সঙ্গে আমাদের বুদ্ধি ও আবেগকে মথিত করে। আমরা বুঝি যে তাঁর নিজের জীবনের সংকট ও সমস্যাগুলো আমাদেরটার থেকে আলাদা কিছু নয়। আমরা বুঝি যে আমাদের মানবসমাজের হৃদয়টি আছে কাফকার ঐ ছোট কয়টি বইয়ের মধ্যেই। তাই আমরা মুগ্ধ হই, আলব্যের কাম্যুর কথার সঙ্গে একমত হই যে, কাফকা বারবার পড়ার জিনিস। 'আমরা কী?' এত বড় প্রশ্নের উত্তর যেহেতু সহজ হওয়ার কথা নয়, তাই আমরা কাফকা বারবার পড়ি – যুগে যুগে, দেশে দেশে।

পুনশ্চ

কাফকা সম্বন্ধে যারা আরো জানতে চান, তারা যেন তাঁর ওপরে লেখা ১৩ হাজারেরও বেশি বইয়ের হট্টগোলের মধ্যে হাবুডুবু না খান, তাই আমি আমার বিশ বছরব্যাপী কাফকাপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে এখানে মাত্র কয়েকটি বইয়ের সন্ধান দিচ্ছি। আমি নিজে যদি ১৯৯৫ সালের দিকে এ সন্ধানটি জানতাম, তাহলে জীবনের পাঁচ-সাতটি বছর অসংখ্য 'কাফকা মিথে' ভরা,

অনায়াসলব্ধ বিশ্বাসে ঠাসা, কাফকা গবেষণাগ্রন্থ পড়ে সময় নষ্ট করতাম না। আমাদের মাথায় রাখতে হবে কাফকার এক প্রধানতম জীবনীকার রাইনার স্টাখের কথা: 'সারা পৃথিবী জুড়ে প্রকাশিত অসংখ্য কাফকা 'ভূমিকার' মধ্যে মাত্র তিন বা চারটিই পড়ার যোগ্য।' এ কথা আমি এখন নিজেও বিশ্বাস করি।

প্রথমে আমি কাফকার জীবনীর কথায়। ম্যাক্স ব্রডের *ফ্রানৎস কাফকা: একটি জীবনী* (Max Brod, *Franz Kafka: A Biography*, ১৯৪৭) অনেক সমালোচিত ও নিন্দিত একটি বই হলেও এটির অন্য বিশাল মূল্য আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে একমাত্র কাফকা-জীবনী এটিই। তাই পড়া উত্তম বা এখান থেকেই শুরু করা উত্তম।

এ ছাড়া যথেষ্ট ভালো বই আরনস্ট্ পয়েলের *নাইটমেয়ার অব রিজন* (Ernst Pawel, *The Nightmare of Reason: A Life of Franz Kafka*, ১৯৮৪)। রোনাল্ড হেয়ম্যান ও নিকোলাস মারের জীবনী দুটি অনেক জনপ্রিয় হলেও, পড়ার তেমন কোনো মানে হয় না।

তবে সবচেয়ে ভালো কাফকা-জীবনীগ্রন্থ রাইনার স্টাখের বইটি – Reiner Stach; *Kafka -The Decisive Years;* ইংরেজি অনুবাদ ২০০৫। জার্মান ভাষায় লেখা তিন খণ্ডের কাফকা-জীবনীর এই দ্বিতীয় খণ্ডটিই এখন পর্যন্ত ইংরেজিতে বেরিয়েছে। তুলনাহীন ভালো বই। যদিও এর চেয়েও ভালো হচ্ছে পিটার আন্দ্রে অল্টের বিশাল বইটি – Peter-Andre Alt, *Der ewige sohn,* ২০০৫। ইংরেজিতে *The Eternal Son* নামের এ বইটির ইংরেজি অনুবাদ আজও কেন যে বের হয়নি, তা এক অবাক করা বিষয়। জার্মান ভাষার সর্বোচ্চ পুরস্কার পাওয়া এ বইটি সব কাফকা-মিথ ভেঙে দিয়েছে যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে। জানা যায়, ইংরেজি অনুবাদ শিগগিরই বেরোচ্ছে। এর কল্পনাশক্তির সাহস ও বিশ্লেষণের গভীরতার কোনো তুলনা হয় না।

কাফকা-সাহিত্যের বিশ্লেষণ বা গবেষণা নিয়ে খুব চমৎকার বইগুলোর মধ্যে পড়বে: (১) Ronald Gray-র *Franz Kafka* (১৯৭৩); (২) Mark Anderson সম্পাদিত *Reading Kafka - Prague, Politics, and the Fin De Siècle* (১৯৮৯); (৩) Ritchie Robertson-এর ছোট ১৩৬ পাতার বই *Kafka: A Very Short Introduction* (২০০৪), যা বিশাল আকারের অগুনতি কাফকা-পুস্তকের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট, স্বচ্ছ, ও সুন্দরভাবে সাজানো; (৪) Ritchie Robertson-এরই *Kafka: Judaism, Politics, and Literature* (১৯৮৫); (৫) Julian Preece সম্পাদিত *The Cambridge Companion to Kafka* (২০০২); (৬) W.J. Dodd সম্পাদিত *Kafka: The Metamorphosis, The Trial and The Castle - Modern Literatures in Perspective* (১৯৯৫); (৭) James Rolleston সম্পাদিত *A Companion to the Works of Franz Kafka* (২০০২); এবং (৮) অতি অবশ্যই Ronald Gray সম্পাদিত *Kafka - A Collection of Critical Essays* (১৯৬২) বইটি যেখানে চমৎকার এক 'ভূমিকা'র পরে এডুইন মুইর-এর 'To Franz Kafka' কবিতাটিই শুধু নেই, আরো আছে Erich Heller-এর 'The World of Franz Kafka'; Martin Buber-এর 'Kafka and Judaism'; এবং নোবেলজয়ী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান লেখক Albert Camus-এর অবশ্যপাঠ্য, চমৎকার প্রবন্ধ 'Hope and the Absurd in the World of Franz Kafka'।

ইংরেজি ভাষায় প্রধানতম কাফকা-গবেষক Ritchie Robertson ও Sir Malcolm Pasley-এর যেকোনো বই বা প্রবন্ধ নির্দ্বিধায় পড়তে পারেন। এদের দুজনেরই কাফকার ওপরে দখল পৃথিবীর যেকোনো কাফকা-গবেষকের বা বোদ্ধার কাছেই ঈর্ষণীয় বিষয়। 'অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ড ক্ল্যাসিকস্' সিরিজে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত কাফকার *The Metamorphosis and Other Stories*; এবং *A Hunger Artist and Other Stories* নামের দুটি গল্পসংকলন এবং কাফকার তিনটি উপন্যাস *The Man Who Disappeared* (যার নাম ম্যাক্স ব্রড রেখেছিলেন *Amerika*); *The Trial* ও *The Castle* - এর

তিনটি নতুন ইংরেজি অনুবাদ – এ পাঁচটি বইয়ের সব কটিতেই পাবেন Ritchie Robertson-এর অনবদ্য সব ভূমিকা ও পাঠ-পর্যালোচনা। কাফকার অনুবাদ আপনার সংগ্রহে থাকলেও এ পাঁচটি নতুনভাবে করা মূল পাণ্ডুলিপি দেখে অনুবাদ, সেইসঙ্গে যেহেতু পাচ্ছেন Ritchie Robertson-এর ভূমিকা ও ব্যাখ্যা, অবশ্যই পড়ার ও সংগ্রহে রাখার মতো সম্পদ। এ ছাড়া Walter Benjamin -এর বিখ্যাত প্রবন্ধ Franz Kafka: On the Tenth Anniversary of His Death একটি অবশ্যপাঠ্য রচনা। এটি আছে তাঁর *Illuminations* (১৯৬৮) গ্রন্থে। এ ছাড়া পড়তে পারেন বিখ্যাত চেক ঔপন্যাসিক মিলান কুন্ডেরার কাফকাকে নিয়ে লেখা চমৎকার প্রবন্ধটি, যেটি আছে তাঁর *Testaments Betrayed* (১৯৯৫) বইয়ে। এখানে কুন্ডেরা ম্যাক্স ব্রডকে অভিযুক্ত করেছেন পৃথিবীর কাছে কাফকার 'সাধু-সন্তের ও শহীদের' ইমেজটি প্রতিষ্ঠা করার দোষে। কুন্ডেরা বলছেন, ব্রডের কারণেই মানুষ কাফকার লেখাকে তাঁর আত্মজৈবনিক গণ্ডি থেকে দেখে কিংবা ধর্মীয় রূপক হিসেবে পাঠ করে, যদিও, কুন্ডেরার ভাষায়, কাফকা হচ্ছে 'বিশাল কল্পনাশক্তির গুণে বাস্তবের পৃথিবীকে রূপান্তরিত করে দেওয়া' সাহিত্যকর্ম।

আরেকটি মহা-বিতর্কিত বইয়ের কথা বলতেই হচ্ছে। এক নিঃশ্বাসে পড়ার মতো এ বইটি যথেষ্ট একপেশে, কিন্তু যথেষ্ট মজার ও কৌতূহলোদ্দীপক। এটি James Hawes-এর বই *Excavating Kafka - The Truth Behind the Myth* (২০০৮)। এ বইটি অবশ্য অন্যসব পড়ার শেষে পড়াই ভালো। পড়ার পরই পাঠক বুঝবেন, কেন তা বলছি।

উইকিপিডিয়ার 'Franz Kafka' আর্টিকেলটিও একটি ভালো লেখা। যে বা যাঁরাই এটি লিখেছেন, তাঁরা খেটেই কাজটি করেছেন; এবং এর মূল সৌন্দর্য এর বিন্যাসে। কাফকা-পাঠের একেবার শুরুতে কিংবা একেবারে শেষে – দুই সময়েই এটি পড়া সুবিধাজনক। এর Reference অংশটি এবং তার পরের Bibliography (Journal, Newspapers ও Online Sources-সহ) অমূল্য।

তবে সবকিছুর চেয়ে ভালো ফ্রানৎস কাফকার নিজের লেখা পড়া এবং এ কথাটি মনে রাখা যে সব গবেষক একমত, কাফকা বারবার পড়ার জিনিস। সরল, সোজা গদ্যে, ভান-ভণিতাহীন কাফকা পড়ার জন্য কোনো পূর্বপ্রস্তুতি লাগে না – এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। পড়া শুরু করে দিলেই হয়। তাঁর তিনটি উপন্যাস (ইংরেজিতে এখন, এত বছর পরে, মূল পাণ্ডুলিপি দেখে অনুবাদ করা 'Critical' এডিশনও বেরিয়ে গেছে এবং এগুলো বাজারে সহজলভ্যও) এবং গল্প সংকলনগুলো ছাড়াও অবশ্যপাঠ্য তাঁর ডায়েরি এবং চিঠির চারটি বই – *Letters to Felice*; *Letters to Milena*; *Letters to Friends, Family and Editors* এবং *Letters to Ottla and the Family*। এ ছাড়া আছে তাঁর সংকলিত প্রবচনগুচ্ছ *The Collected Aphorisms*; অনুবাদ 'ম্যালকম প্যাস্‌লি',

১৯৯৪; আছে *The Blue Octavo Notebooks*, সম্পাদনা ম্যাক্স ব্রড, ১৯৫৪; এবং *Franz Kafka – Parables and Paradoxes* (১৯৬১) – এ তিনটি বই-ই বাজারে পাওয়া যায়।

সবার শেষে বলব আমার খুবই প্রিয় দুটি বইয়ের কথা – দুটিই অসংখ্য ছবিসংবলিত কাফকা অ্যালবাম, সঙ্গে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ: (১) Klaus Wagenbach-এর *FranzKafka: Pictures of A Life* (১৯৮৪, ইংরেজি অনুবাদে); এবং (২) Jeremy Adler- এর *Franz Kafka* (২০০১)। কাফকার সময়কে ছবি ও লেখা – দুই-ই দিয়ে বোঝার অন্য কোনো এমন ভালো বিকল্প নেই।

কাফকার নিজের লেখা ও কাফকার ওপরে লেখা বইগুলো পাওয়ার শ্রেষ্ঠ স্থান www.ama zon.com।

লেখার জন্য আমি কাফকাকে নিয়ে লেখা উপরের সবগুলো বইয়েরই কমবেশি সাহায্য নিয়েছি। ভূমিকার বিন্যাসটি করেছি বা এটি সাজিয়েছি মোটামুটি Wikipedia-এর Franz Kafka আর্টিকেলটির মতো করে। এদের সবার প্রতি আমি অকুণ্ঠচিত্তে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

নাটক/প্রবন্ধ

এঁরাই সত্যিকারের 'ধার্মিক'

.....

হামীম কামরুল হক

নাটকের তো বটেই, সাহিত্যের পালাবদলে কয়েকটা জিনিস দাগিয়ে নিলেই একটু সুবিধা হয়। নানান ধরনের বৈশিষ্ট্য দিয়ে তো সাহিত্যকে চিনে নেওয়া চেষ্টা চলেছে, এখন চলছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ অব্দি যেকটি ধারায় সাহিত্যকে আমরা দেখে নিতে পারি, তার ভেতরে আছে ক্ল্যাসিক, রোমান্টিক, রিয়ালিস্ট ও ন্যাচারালিস্ট, মর্ডানিস্ট এবং পোস্টমর্ডান। এখানে সবচেয়ে ঝামেলা লেগে আছে

মডার্নিস্ট পর্বটি নিয়ে, কারণ এতে সিম্বলিজম থেকে শুরু করে অ্যাবসার্ডিসম পর্যন্ত অনেক কিছু এর পেটে ঢুকেছে এবং বের হয়েছে। এদের লক্ষ্য ছিল একটাই, রিয়ালিজমের বা ন্যাচারালিজমের বিরোধিতা। এর চল শুরু উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের আটের দশক পর্যন্ত। একটু পরেই পোস্টমর্ডানিজম এল। একে ধরা হচ্ছে ১৮৯০ সাল থেকে, ২০০০ সাল পার হয়েও তা চলমান। এটা গেল মূলত ইউরোপীয় নন্দন ঘরানার সাহিত্য ও নাট্যকলা বিষয়ে পালাবদলের একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বাংলা নাটকের পালাবদলে সেখানে পর্ব মূলত একেবারেই কম। যদি সেই রকম মোটা দাগে ধরা হয় তো এখানে একেবারে তিনভাগে ভাগ। পৌরাণিক বা ক্ল্যাসিকনির্ভর নাটক, বাস্তববাদী বা সমাজসংশিষ্ট বক্তব্যজাত নাটক এবং পাশ্চাত্যপ্রভাবিত নাটক ও নাট্যকলা। এর ভেতরে সিম্বলিস্ট ও অ্যাবসার্ড নাট্যধারাই প্রধান বলে ধরে নিতে পারি।

মিশর, গ্রিস ও ভারত– এই তিন জায়গায় নাট্যক্রিয়া দেবদেবতার কৃত্য থেকে উদ্ভূত। কিন্তু দেখা যায় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রকৃতিপূজারি বা প্যাগান ঐতিহ্য থেকে নাট্যকলা তৈরি হয়েছে। 'নাট্য' কথাটি অনেকের মতে 'থিয়েটার'-এর বাংলা। তাহলে নাট্যকার কথাটির মানে কি 'থিয়েটারিস্ট'? তিনি থিয়েটার লেখেন না। বর্তমানের থিয়েটার মূলত নির্দেশকের শিল্প। আমাদের জানা নেই 'থিয়েটারিস্ট' বলে কোনো শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় কিনা। 'নাট্য' কথাটি যখন 'কর্মী'র সামনে বসে তখন এর যে-অর্থ, 'কার'-এর সামনে বসে সেই অর্থ পূরণ করে না। ইদানীং 'নাটককার' নামে একটি শব্দ কেউ কেউ চালু করতে চাইছেন। কথাটা ঔপন্যাসিককে 'উপন্যাসকার' বলার মতো শোনায়। 'গল্পকার' যিনি গল্প লেখেন তাকে বলা চলে, কিন্তু উপন্যাস যিনি লেখেন তিনি ঔপন্যাসিক, তাকে 'উপন্যাসকার' বললে তা ধ্বনিগতভাবেও ভালো শোনায় না। উদ্ভট সব সমস্যা তৈরি করেছেন এখানকার অর্ধশিক্ষিত কিছু ব্যক্তি, যারা শিল্পসাহিত্যে জায়গায় অতিমূল্যায়িত হয়ে এইসব উদ্ভট শব্দ ব্যবহার করে চলেছেন। তারা এতটাই লিঙ্গসমতার কথা বলেন যে, কোনো লিঙ্গভেদই মানবেন না। তাদের তাছে যিনি লেখেন তিনি নারী কিংবা পুরুষ যাই হোন না কেন তিনি 'লেখক'। গান গাইলে গায়ক, আর অভিনয় করলে অভিনেতা। 'গায়িকা' এবং 'অভিনেত্রী' মতো কথাও তারা ছেঁটে দিতে চান। নায়কের বদলে নায়িকা শব্দটিও তারা উঠিয়ে দিতে চান মনে হয়। যেমন নারীর নামের আগে 'রাষ্ট্রনায়ক' বলা হচ্ছে, কথা হল রাষ্ট্রনায়ক শব্দটি কেনই-বা নারীর নামের আগে প্রয়োগ করতে হবে? (সমাজে বিশেষায়িত করার প্রবণতা এত বেড়ে গেছে যে কোনো বোধই যেন আর কাজ করছে না, কি শিক্ষিত মানুষের ভেতর কি নির্বোধদের ভেতর। রবীন্দ্রনাথের নামের আগে কি কোনো উপাধির দরকার পড়ে? তাপরও আমরা দিয়ে যাচ্ছি তো দিয়েই যাচ্ছি। যে নামকে কোনো উপাধি দিতে হয় না, সেই নামটিই সবচেয়ে নামি।) ইতোমধ্যে 'অধ্যাপিকা'

তো উঠেই গেছে। কথা হল ইংরেজিতে অথর ও প্রফেসর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেভাবে চলে, বাংলায় তা চলে না বলেই বোধ হয়। একেক ভাষার নিজস্ব স্বভাব রয়েছে, হিন্দিতে চোখ, কান, আঙুল, পা-য়েরও লিঙ্গভেদ অনুযায়ী ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ার কালও আলাদা হয় লিঙ্গ ভেদে। যেমন, এক হাসিনা থি (এক যে ছিল সুন্দরী), এ থা শের (এক যে ছিল বাঘ) এই যে 'থি' ও 'থা' এটা হিন্দিভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে দেখায়। সংস্কৃতেও এমন নিয়ম আছে। আর সেখানে বাংলাকে কিছু লোক নিজের ইচ্ছামতো শব্দ ব্যবহার করে চলেছেন। একে ভাষার ওপর বলাৎকার ছাড়া আর কী বলা যায়?

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বোধের বিশেষ অভাবের একটি দিক হল 'নাটক' শব্দটিকে নিয়ে। হাস্যকর হলেও সত্য, 'নাটক' বলতে অনেকেই টিভি নাটক বুঝে থাকেন। খুব কম লোক পাওয়া যাবে যারা জানেন– নাটক ও থিয়েটার শব্দটি এক, না আলাদা। অনেকের মনে করেন, এটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নাটক নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু নাটক বলতে আসলে কী বুঝায়, অন্য সমস্ত শিল্পাঙ্গিকের তুলনায় ঠিক কোন জায়গাটাতে নাটক আলাদা– এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে বিপাকে পড়ে যান। (এ যেন 'জীবন কী', অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের 'জীবন কোথায় আলাদা'– এমন ধরনের প্রশ্ন।) এছাড়া বাংলাদেশে নাটকের ধারা গতি নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। যাতে নাটকের শিল্পের জায়গাটি নিয়ে সোচ্চার হওয়ার বদলে নাটকের আঙ্গিকের জায়গাটি নিয়ে তর্ক তোলা হয়েছে বেশি। বাঙলা নাটক, বাঙালির নাটক, শিল্পের শেকড় সন্ধান– এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েও নাটক ও থিয়েটার নামের দুটো বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয়নি।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা হল নাটকের আগে থিয়েটার তৈরি হয়েছে। থিয়েটার মানে অভিনয় ও দর্শকের সমন্বিত একটি অনুষ্ঠান। গ্রিসে আগে মঞ্চে অভিনয়ের প্রচলন হয়, তারপর ধীরে ধীরে নাটক লেখার সূত্রপাত ঘটে। 'নাটক' হল থিয়েটারের যে-অংশটুকু কেবল সাহিত্য, বা স্ক্রিপ্ট-টা। আর 'থিয়েটার' স্ক্রিপ্ট ছাড়া হতে পারে, কোনো পরিচালক ছাড়াও থিয়েটার হতে পারে, পোশাক পরিকল্পনা ছাড়া হতে পারে, অন্যান্য আরো অনেক কিছু ছাড়াও হতে পারে। থিয়েটারের অত্যাবশ্যক বিষয় মাত্র দুটি– এক হল একজন অভিনেতা এবং একজন দর্শক। ইয়ের্জি গ্রোটোভস্কির এভাবে যে-থিয়েটারের মূল দিকটি তুলে ধরেন তা মেয়ারহোল্ডের মতেরই আরেকটি দিক। অন্য সমস্ত শিল্পের মধ্যে একমাত্র থিয়েটারে মানুষের শরীর একেবারে জীবন্তভাবে উপস্থিত থাকে। এবং থিয়েটার যেকোনো স্থানেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। একটি শূন্য স্থান থাকলে এবং সেখানে কোনো এক বা একধিক ব্যক্তি কোনোরকম ক্রিয়াকর্ম করলে এবং তা যদি অন্যদের দেখা হয়, সেটাই একটি নাট্যক্রিয়া। নাট্যক্রিয়ার একটি সমন্বিত রূপ হল থিয়েটার।

নাটক সাহিত্যমাত্র। আর থিয়েটার হল নাটক, অভিনয়, মঞ্চ, দর্শক, আলোকপ্রক্ষেপণ, রূপসজ্জা, পোশাকসজ্জা, গীত, সংগীত, নৃত্য, বাদ্যসহ বিচিত্র বিষয়ের একটি সমন্বিত আয়োজন। সেলিম আল দীন মধ্যযুগে বাঙালির নাট্যকলাকে নাট্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু সচেতনভাবে কোনো ব্যক্তি একেবারে চরিত্রদেরকে সংলাপের মাধ্যমে মানব-পরিস্থিতির কোনো একটি দিকতুলে আনার নিমিত্তে যে-নাটক লিখেছিল তা আধুনিক সময়েরই ঘটনা। দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে নাটক বলতে যা বুঝি তার পার্থক্য আছে। নাটক একেবারে কাব্যিকতামুক্ত হতে পারে। যেমন চলচ্চিত্রের প্রধান বিষয় ইমেজ। কিন্তু তা-ও অত্যন্ত কাব্যিক হতে পারে। নাটকের প্রধান বিষয় ইমেজ নয়। আগেই বলা হয়েছে সেটি হল সাহিত্য। এর লক্ষণ মূলত সংলাপ-নির্ভরতা। সংলাপের মধ্যে দিয়ে এতে সমস্ত কিছু তুলে ধরা যায়, উপন্যাস যা করে বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। ফলে নাটক যখন দুই বা ততোধিক চরিত্রের মধ্যেকার পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়ের বদলে বর্ণনাত্মক হয়ে যায়, তাতে এর মূলে গিয়ে আঘাত লাগে।

নান্দনিকভাবে এ-ও বোধ হয় নাট্যজাতীয় ক্রিয়া সমস্ত দেশ-জাতির সংস্কৃতির মধ্যে থাকলেও গ্রিক ও সংস্কৃত ছাড়া আর কোথাও নাট্যকলা এমন করে কোনো জাতির ঐতিহ্যে লীন নয়। চীন ও জাপানের নাট্যক্রিয়া প্রাচীন হলেও সাহিত্যসমৃদ্ধ নাটক সেখানে ততটা আর কোথায়? ফলে এই দুই ঐতিহ্য ছাড়া অন্য যেকোনো সংস্কৃতিতে নাটক রীতিমতো উদ্ভবনার বিষয়। একে নতুন করে সৃষ্টি করতে হয়। নাটকের ইংরেজি, স্পেনীয় অন্যান্য আরো উদাহরণ মনে রেখেই একথা বলা যেতে পারে। গ্রিক ও সংস্কৃত নাটকের আধুনিকতার তুল্য আর মাত্র একটি ধারার কথা বলা যায়, সেটি শেক্সপিয়ারের। তা ইংরেজদের সবার প্রতিনিধিত্ব করে? ক্রিস্টোফার মার্লোর নাটকই তো একই সময়ে ভিন্ন ধরনের হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরপর বিশ্বনাটকের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ইবসেন, স্ট্রিন্ডবার্গ-এর হাতে একদফা, পরে ব্রেখটের হাতে এবং সর্বশেষ বেকেটের হতে। বেকেটের আগে মেটারলিঙ্ক, পিরানদেলা, সার্ত্র, কাম্যু, আয়েনেস্কো প্রমুখের কথা বলা যায়, কিন্তু এদের সমস্ত নির্যাস নিয়ে বেকেটের নাটক নাটকের সম্ভবনার চূড়ান্তটুকু দেখিয়ে দিয়েছে।

বাংলা নাটক বিশেষকরে থিয়েটারে চর্চিত নাটক ব্রেখটের পর খুব একটা এগুতে পারেনি। সেলিম আল দীন নাটকের বাস্তববাদী ধারা ও এপিক থিয়েটারের মিশ্রণে নতুন একটি নাট্যধারার সন্ধানে ছিলেন বাংলা নাট্যঐতিহ্যের পরম্পরা চিহ্নিত করতে গিয়ে।

বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাটককে বাংলা নাট্যকলায় যতটা হাজির করার কথা ছিল ততটা হাজির করতে পারিনি। তিনি বাস্তব রঙ্গমঞ্চের চেয়ে মানস-রঙ্গমঞ্চের অভিমুখে নিয়ে গিয়েছিলেন তার নাটকগুলোকে। তার

অনেকগুলো থিয়েটার সহজে ধারণ করতে পারে না। সেলিম আল দীন যত দিন যাচ্ছিল মঞ্চের জন্য তার রচনাকে প্রায় অসম্ভবের স্তরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ তিনি নাটকের নামের আলাদা ও খণ্ডিত শিল্পাঙ্গিকেই আস্থা রাখতে পারছিলেন না। 'কাঠামোগত মহাকাব্য' বা 'স্ট্রাকচারাল এপিকে' পৌঁছানোটাকে তিনি গন্তব্য করে তুলেছিলেন, আরাধ্য করে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটেছে।

নাটককে মঞ্চের জন্য কি অসম্ভব করে তোলা যায়? কারণ নাটক তো বর্ণনামূলক ভঙ্গিটাও আত্মস্থ করে নিয়েছে। এর ফলে যেকোনো কিছু যার মঞ্চায়ন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে তা-ও আদতে সম্ভব। নাটক তো উপন্যাসের মতো সবকিছু হজম করার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সুমন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'দ্য ম্যান অব দ্য হার্ট' চলচ্চিত্রটি বলতে গেলে সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের একক অভিনয়ে সমৃদ্ধ। সেটি যখন সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় পৃথিবীর বিভিন্ন মঞ্চে কিছুক্ষণ সশরীরে অভিনয় করে পরে কিছুক্ষণ চলচ্চিত্রটি মঞ্চে পেছনে টানানো পর্দায় প্রদর্শন করেন। আবার কিছুক্ষণ সশরীরে অভিনয়– এভাবে পালাক্রমে প্রোজেক্টর ও সশরীরে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানোর ভেতরে দিয়ে একেবারেই বাঙালি লালনের জীবনচক্র তুলে ধরা– সেটিতে থিয়েটার ও সিনেমার সমন্বয় ঘটে, আদতে তাতে সিনেমা থিয়েটার অঙ্গীকৃত হয়। সবচেয়ে বড় কথা 'মহাভারতে'র মতো বিশাল বিস্তৃত কাহিনীকেও তো থিয়েটারের ভেতর দিয়ে পিটার ব্রুক হাজির করেন, তখন থিয়েটারের শক্তি পরীক্ষা হয়ে যায়। পৃথিবীর বহু স্থানে গল্প ও উপন্যাসকে থিয়েটারতে পরিবেশনা করা হচ্ছে। এভাবে কাব্য, গল্প, উপন্যাস সবেরই মঞ্চভ্রমণ সম্পন্ন হচ্ছে।

দুই.

এবার একটি বিষয়ে নজর দেওয়া যাক। পাশ্চাত্যে থিয়েটারকে এত এত মতবাদের চক্রাবর্তে পড়তে হয়েছে কেন? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক লুৎফর রহমানের তত্ত্বাবধানে তুলামূলক নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ করতে গিয়ে বিষয়টি তিনি উত্থাপন দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যে প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপন্থী সমাজব্যবস্থায় নাটকের মতো শিল্পকলার টিকে থাকার কথা নয়। কারণ নাটক হল যৌথক্রিয়া। ফলে নিজের অস্তিত্বের জন্যই থিয়েটারকে নানান অঙ্গভঙ্গি করে, নানান মতবাদের অভিষিক্ত হয়ে টিকে থাকার ফন্দি করে নিতে হয়েছে।

সেই পাশ্চাত্যেই কিন্তু ব্রেখটের মতো নাট্যকার ও নির্দেশক এলেন। এলেন স্যামুয়েল বেকেট'র মতো নাট্যকার। বেকেটকে ওয়েস্টার্নাইজড ভাবার সুযোগ থেকেই যায়। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে তাঁর নৈরাশ্য, নেতিবাচকতা তার শূন্যতাবোধের গভীরে আছে প্রাচ্যপ্রভাব। সেটি তিনি শোপেনহাওয়ারের কাছ

থেকে পেয়েছিলেন। শোপেনহাওয়ার পেয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম থেকে। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে নীলকণ্ঠ ঘোষাল দেখান বেকেট পাশ্চাত্য দর্শন ও বোধির যতটা অনুসারী, ততটাই প্রাচ্যবোধে উদ্দীপ্ত। 'শূন্য করিয়া রাখ তোর বাঁশি/ বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি'– তাও-মতবাদে এটাই সবচেয়ে কঠিন। শূন্যতার সেই মাত্রায় বেকেটকে আমরা দেখতে পাই। আস্তিকের জন্য আছেন 'ঈশ্বর', আর নাস্তিকের জন্য আছে শুধু 'অপেক্ষা'– এই সহজ ব্যাপারটি বেকেটে নতুনত্ব পায়। আমরা ভুলে যাই নাস্তিক মানে 'যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না'-এর চেয়ে যে বা যারা মূলত বেদবেদাঙ্গ বিরোধী তারাই নাস্তিক। বৌদ্ধমতবাদ এক অর্থে নাস্তিক্যবাদের মাত্রায় চলে যায়। এরই এক গভীর প্রভাব পড়েছে বেকেটের নাটকে এবং তাঁর নাটকের মঞ্চায়নে। মাত্র গুটিকয়েক চরিত্র দিয়ে তিনি এমন অভিঘাত তৈরি করেন, যা থিয়েটারের বিপুল আয়োজনের একেবারে ন্যূনতম ব্যবহার।

বেকেটের নাটক সেই অর্থে বর্ণনামূলক নয়। কিন্তু সংকেত ও প্রতীকের মাধ্যমে তিনি থিয়েটারের শক্তিকে হাজির করেন। তিনিও নাটকের আত্মাটিকে চিনেছিলেন বলে থিয়েটার ব্যতিরেকেও তার নাটক আমাদের আলোড়িত করে। 'ক্যাটাস্ট্রপি'র মতো একেবারে স্বল্প আয়তনের নাটকের কথাই চিন্তা করা যায়। মাত্র তিন-চারটি চরিত্র। তাদের মধ্যে মূলত দুজনের কথাবার্তা থেকে প্রকাশিত। জানা হয়, সেই সুগভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত যাতে ব্যক্তির প্রকৃত সত্তার বিকাশ যাতে না হয়। অথচ বেকেট বলতে গেলে কোনো রাজনৈতিক নাটকই লেখেননি। কিন্তু এই নাটকে দেখি যেখানে গণমানুষের হাত ও মস্তিষ্ক হবে সাদা, আদতে তা থাকবে শূন্য, নাটকের চরিত্রের মুখ ও হাতে সাদা রঙ মেখে দেওয়ার যে কথা বলা হয় তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ ব্যাপারটি। এবং নাটকের ভেতরের নাটকে উন্মোচিত হয় শিল্পের নামে কায়েমি স্বার্থবাদীরা কী দেখাতে পারে। (এখানকার টেলিভিশন ও মনোরঞ্জনমূলক সিনেমা কথাটাই ভেবে দেখুন।) পরিচালক মঞ্চ অন্ধকার করে কেবল মাথা নিচু করে থাকা মুখ্যচরিত্রে উপর আলো প্রক্ষেপিত করতে বলেন। তাঁর মহিলা সহপরিচালক যখন বলে, এক মুহূর্তের জন্য মুখ্যচরিত্র যদি মাথা উঁচু করে...। পরিচালক বিস্মিত হয়ে বলেন, 'ও মাথা উঁচু করবে? ও মাথা উঁচু করলেই তো ক্যাটাস্ট্রপি/ বিপর্যয়।' এই একটি কথায় শিল্প, রাজনীতি ও সামজে ব্যক্তির ভূমিকাকে মূক করে রাখার চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। নাটকের এই কথাটি কেবল ওই নাটকের পরিচালকের জন্য বিপজ্জনক নয়, রাষ্ট্রশক্তির কঠিন জালচক্র বিছানোর বিরুদ্ধে অমোঘ একটি কথা হয়ে ওঠে। রুশো বলেছিলেন, 'রাষ্ট্র থাকলে (নাগরিকদের/ব্যক্তির) স্বাধীনতা থাকে না, আর স্বাধীন সমাজে রাষ্ট্র থাকতে পারে না।' অর্থাৎ মানুষের চূড়ান্তভাবে সভ্য হওয়ার ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রে অবলুপ্তির সম্ভাবনা থেকেই যায়, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তাই যেকোনোভাবে বজায় রাখার জন্য কায়েমি স্বার্থবাদী পুঁজিপতি, ব্যবসায়ীর ও রাজনীতিবিদদের ভেতরে একটা স্বয়ংক্রিয় বোঝাপড়া আছে, আছে গোপন আঁতাত। সেখানে কোনো

ব্যক্তিকে মাথা তুলতে দেওয়া যাবে না, দিলেও কখনো সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের গণতন্ত্রের নামে যে প্রহসন বজায় আছে তাতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়, কারণ তাদের চেয়ে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী তো আর কে? 'ইউ.এস.এ– হোয়ার লিবার্টি ইজ অ্যা স্ট্যাচু।'–এভাবেই তার বিরুদ্ধে ঠাট্টার তীব্রতা হানেন কবি নিকানোর পাররা। আমরা জানি, এ হল সভ্য পৃথিবীতে সেই রাষ্ট্র যেখানে দর্শনচর্চা ও দার্শনিককে সবচেয়ে কম উৎসাহিত করা হয়। কারণ ওই একই, ব্যক্তির মাথা তোলার ভয়। সত্যিকারভাবে বিকাশের সম্ভাবনার ভয়।

এভাবে নাটক ও থিয়েটার তার সূচনালগ্ন থেকে ভাঙার গান গায় নতুন করে গড়ার জন্য। কাব্য ও দর্শনের প্রবল বোধ থেকে থিয়েটার ডাক দেয় উদার মুক্ত ও বৈজ্ঞানিক সমাজের, ডাক দেয় জীবন্ত সমাজের। ম্যাকানাইজড ম্যান নয়, (তলে তলে) সায়েন্টিফিক ম্যানই থিয়েটারের লক্ষ্য হয়ে থাকে, এজন্য থিয়েটারকে নিয়ে গোপন ভীতি আছে প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্র ও সরকারকে। আর তারাই একে ক্রমে অজনপ্রিয় করে তুলেছে, নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের নানান রকমের ফাঁদ ও লোভে ফেলে তাকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে সৃজনের সত্যিকারের ভূমি থেকে। তারপর কী কী হচ্ছে সে কথা বোদ্ধামাত্রই জানেন।

কিন্তু মানুষের আত্মবিকাশের গোপন একটি ব্যাপার হল, পৃথিবীতে সেই মানুষটি থাকবে যে একটি পয়সা না পেলেও মাটির হাঁড়ি বানিয়ে তাতে নকশা করবে, ঠিক তেমনি কোনো রকম আর্থিক লাভ না হলেও কিছু লোক থাকবে, যারা থিয়েটার করবে। এরাই আসলে সত্যিকারের 'ধার্মিক' মানুষ– যারা শেষ পর্যন্ত সত্য, সুন্দর, কল্যাণের ডাক দিয়ে যাবে। মুক্তির স্বপ্ন দেখবে, দেখাবে। মানুষকে সচকিত রাখবে মুক্তির জন্য ততদিন, যতদিন মুক্তি না মেলে। এভাবেই থিয়েটারে জীবন মুক্তি পায়, শিল্প জীবন হয়ে ওঠে।

নব্বইয়ের ২১ কবির ২১টি কবিতা

১. প রি তো ষ হা ল দা র

উষ্ণতা

ভীষণ উষ্ণতা জাগে। চোখের চপল বেয়ে টলটলে ঘ্রাণ নিয়ে মৃত্যুর মতোন রূপ নামে। মাথার উপর টাঙানো আকাশ। আমার সীমায় শ্লীল-অশ্লীল কিছুই নেই। শুধু চাঁদের পালান জুড়ে প্রান্তিক নক্ষত্র খোঁজা। কোনোদিন ঘুম ভেঙে জেগে দেখি মাঝরাত শুয়ে আছে আমার শয্যায়, ঠিক যেন বৌয়ের শরীর। ব্রহ্মপুত্র জলে তিন তিন বার দেখেছি দেবীদের স্নান উৎসব, লাজধোয়া অমৃত শরীর। আমার গোপন খোয়া গেছে চতুর গোপনে। আমিও বহরে হাঁটি যোজন যোজন। যাযাবর বিশ আঙুলে খেলে বিংশতি পল-অনুপল। কোথাও হঠাৎ থেমে জীবনের পায়ে আঁকি অমরত্বের সুবর্ণরেখা। কখনো আবার অন্ধকার কামারশালায় জ্যোৎস্না বানাই একা একা– এই মৃত্তিকায়।

২. রা দ আ হ ম দ

আইটন্স অন ইয়ারা (পাহাড় লাগাচ্ছে মাস্‌কারা)

আইটন্স অন ইয়ারা – কমপক্ষে একশত মাইল
শেষ দিকটায় পাহাড় ওখানে দিগন্তে সুরমা লাগাচ্ছে খুব যতনে
পাহাড় লাগাচ্ছে মাস্‌কারা

আলগোছে সারিনা আধাআধি সরে বলল
তোমার পিস্তল বার কর?
....

উঠে দাঁড়াব পরে – আপাতত একটু মদ্যপান করি!
আপাতত – একশত কিলোমিটার গতিলিমিট
দুপাড়ে পাহাড়– সিঁড়ি দিয়ে ল্যাটিন লধু নামছে
Tito Puente – টেইক ফাইভ

এক পা নামলে আরো দুই পা – স্যুটের ক্রিজ না ভেঙে আরো
স্টাইল – আরো আলো ঠিকরাক – তোমাদের বিয়ে ভেঙেছে তো কী হয়েছে মেয়ে?

সবকিছু শুষে নেওয়া নির্জন মাটি
তার উপরে জীবন যেভাবে মুঠো খুলে দেয়

যেভাবে সারিনা আধাআধি ঘুরে উঠে বলতে পারে তোমার পিস্তল?
কাঁধের উপরে আলতো হাত ছুঁয়ে মাটির উপরে একশত আঙুর বাগান
সারি সারি মানুষ তৈরি করতে পারে

সেভাবে জীবন বানানো যায়
হাতে খুব ভালো তাস পড়লে
সবকিছু ভুলে হেসে ওঠা যায়
... ...

আঙুর বাগানে ইনফরমেশন
খুঁজছি । মাটির উপরে ছুঁচোর মতো । বেতনাকাঙ্ক্ষায় পাদ্রির মতো
সারি সারি আঙুর বাগানে সারির মধ্যে আমি মাটিতে কান পাতি
স্টেথেস্কোপ টিপে ধরে খুঁজে দেখি আমাদের পাহাড় জীবন্ত কিনা

তারা যেভাবে সুরমা লাগাচ্ছে সেভাবে আমি
জীবন্ত আছি আমি আছি হে সারিনা

ল্যাটিন লধু এর মতো
একপা একপা নামতে আছি হাতে গেলাস

... ...

যেভাবে ফিরে আসি ।
রাস্তায় রোড-সাইন নাচিতেছে একশত কিলোমিটার ।
ওভারটেকিং লেইন ফাইভ হান্ড্রেড মিটার এ্যাহেড – দূরে কী সুন্দর বাতাস – আর
পাহাড়েরা তো পাহাড়ের মতোই
রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে আমার মাথার মধ্যেকার নিউরনগুলা ঝিমাইতেছে

মদ্যপানের ফলাফল – জীবন যাপনের ফলাফল – আমি
হাসিতে চাইলেও আমার মুখ হাসিতেছে না – রৌদ্রকরোজ্জ্বল

দিনের সাথে নিস্ফলা আমি আমার মধ্যে বসিয়া হাসিতে থাকি ।।

(মেলবোর্ন, ২০০৪)

৩. রো ক সা না আ ফ রী ন

ধুলোবালি, পাপ

এতকাল কতভাবে অপচয়ে, অনাদরে রেখেছি নিজেকে
যত্ন করে বেঁচে থাকা কেন আজও হয়নি আমার
এত ঘৃণা, এত রক্ত, তিলে তিলে জমে উঠে
ভেঙেছে আমার এই আগুনলাগা দেহ–
এই দুই হাত দিয়ে কী করেছি, কী যে করি নাই

কত পাপ, কত ধুলো, কত ঘাম
পায়ে পায়ে ঘোরে,
আমাকে অসুস্থ করে, ক্রুদ্ধ করে, শ্বাসরুদ্ধ করে,
চিৎকার করে বলে– থামো

৪. অনন্ত জাহিদ

নিরুদ্দেশে যাব

ঘাটে ভাঙা নৌকা
জোয়ার ভাটায় পলি-কাদা শ্যাওলায়
ডুবান ভাসান
চুপি চুপি বলি তাকে নিরুদ্দেশে যাব

থাকে নিরুত্তর
বিধবা মায়ের থালার কিনারে
নুনের বদলে স্তব্ধ অশ্রু

তারপর সারারাত ইস্টিমারে জরায়ু জগৎ
সকাল উগরে দেয় ক্ষুধা
পরস্পর অচেনা আঙুলে
মুদ্রা বিনিময়

মাঝরাতে শরীরে নিঃশ্বাস ফেলে আগুনের পশু
অদূরে ফ্ল্যাটের জানালায় জানালায় বস্তির দহন-দৃশ্য
মনে ভাঙা নৌকার কঙ্কাল
নিরুদ্দেশে যাব

৫. জাহেদ সরওয়ার

বালজাকের চামড়া

দহনের মৌল মিলনে গলে যেতে থাকে মোমের পরমায়ু
আভূমি ছাই করা দেহ তার জন্মমৃত্যুর ইতিহাস

মানুষের সকল আয়ু একখণ্ড বালজাকের চামড়া
সে ক্রমাগত সংকোচন করে নিজের মসৃণ শরীর

চাওয়া নতুবা পাওয়া যা কিছু অভিজ্ঞতা ক্ষরণ
ম্লান অথবা অম্লান যা কিছু জৈবিক বিস্ময়
মাটির গহিন আত্মার টানে অস্তির কৌতূহল
তবু তাকে অক্ষয় বৃক্ষ ভেবে মানুষ শেকড়ে ঢালে জল

তবু যেতে থাকে মানুষ নির্জ্ঞান প্রক্রিয়ার ভেতর
শিহরণে কাঁপে মধুলোভী ঘাস চোখ রাঙানো অধিশাস্তা
সকল তৃষ্ণা আদতে ক্ষরণে সহোদর তবু–
মানুষ বহু অভিজ্ঞতায় পুষ্ট করে তার জাগতিক উদর

৬. সা কি রা পা র ভী ন

চিঠি

মাননীয় হোস্টেল সুপার
মজিদা খাতুন মহিলা বিদ্যালয়
তারিখ: ১২ই আষাঢ়, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

বিষয়: দুই দিনের ঐচ্ছিক ছুটির জন্য আবেদন ।

জনাব

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার মহিলা হোস্টেলের একজন নিয়মিত বন্দি । মৃতপ্রায় দাদীর শেষ ইচ্ছা তিনি আমাকে শেষবারের মতো একবার দেখিতে চান । আমি তাই গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে হোস্টেল ত্যাগ করিতেছি । পথিমধ্যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না ।

অতএব আমাকে গ্রামের বাড়িতে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে আপনার বিশেষ আজ্ঞা হয়।

নিবেদিকা

আপনার একান্ত অনুগত
বীথি বসুনিয়া
দ্বাদশ শ্রেণী, মানবিক বিভাগ।

পুনশ্চ: মানবিক বিভাগে অধ্যয়নরতা সকলের অনুগত বসুনিয়া বাড়িতে ফিরিয়া দুর্ঘটনাবশত পালকিতে চড়িল। তাহার অকাল মৃত্যুতে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিল না।

৭. টো ক ন ঠা কু র

নিঃসঙ্গের ছদ্মবেশে

মানুষের ছদ্মবেশে থাকি, আদতে রাক্ষস!
একদিন রাক্ষসপুরীতে ছিলাম। কিন্তু রাক্ষসদের সঙ্গে আমার বনিবনা হত না। সবসময় খিটিমিটি লেগে থাকত। ভালোবেসে যে রাক্ষুসী আমার পাশে ছায়াচ্ছন্ন দাঁড়িয়েছিলো, এক সন্ধ্যার অজান্তে তাকে অন্য রাক্ষসেরা ভক্ষণ করে ফেলেছিল। মনের দুঃখে, স্বপক্ষত্যাগী আমি মানুষের ছদ্মবেশে মানবসমাজে চলে এসেছি। আমিও কবিতা লিখি...

এই হচ্ছে মানুষের মধ্যে থেকেও আমার নিঃসঙ্গতার সংগোপন ইতিহাস। এই হচ্ছে মানুষের সমাবেশে থেকেও আমার মানুষ হতে না পারার ইহলৌকিক যন্ত্রণা। কারণ, সৌন্দর্যলুব্ধক এক মোমের মানবীকে ভালোবাসতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি গোত্রান্তরিত রাক্ষস। স্বগোত্রে আমার জন্য এক রাক্ষুসী আত্মাহুতি দিয়েছিল। আর এদিকে আমি মোমের মানবীকে হাত ধরে আবেগে-আবেগে যেই বলেছি, রাক্ষুসী প্রিয়ে, তোমাকেই আজ ভালোবাসি, তুমি আমার পাশে দাঁড়াও; কিন্তু সে ভয় পেয়ে ছিটকে পালায়, আর

রাক্ষসের ভয়ে মানবীরা চিরকাল ভীত বলে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যাই, যথাক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে উঠি। নিঃসঙ্গতা এমন একটি উদাহরণ, সে-কেউ গ্রহণে অনিচ্ছুক... হায়রে এমন নিঃসঙ্গ থাকি।

সকাল থেকেই একটা শালিক কার্নিশে ভিজছে... স্থিরচিত্রে, নিঃসঙ্গের ছদ্মবেশে আমি এখন ওই ভেজা শালিক পাখি

শালিকের ছদ্মবেশে কবিতা লিখি!

৮. মা র জু ক রা সে ল

মালের আড়ৎ

হালখাতা লাল মলাটের হয় কেন?
এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে প্রতিটি বছর আসে;
মৃত্যুও আসবে শুভসূচনায়।
বৈশাখশুরুতে মিষ্টিমুখ করে ও করায় আড়তদাররা—
মৃত্যুতেও মিষ্টিমুখ করে ও করায় জীবিতরা—
৩নতুন হিসেব শুরু হয় আড়তে আড়তে—
শোনা যায়, বই পড়ে জানা যায়
নতুন হিসেব শুরু হয় ওপারেও—
ওপারে ভালো-মন্দদের খেলাখেলির পাশাপাশি মাঠ,
মাঝখানে বিশাল দেয়াল,
স্বপ্নে-দেখা-দেয়ালের উপর শূন্য আসনে বসে আছেন
শূন্য, মহাখালি—

ভাঙা স্বপ্নে বোঝা গেল না
কাদের খেলার প্রশংসায় তিনি দিচ্ছেন হাততালি।

৯. আয়শা ঝর্না

পথ

বলো রাজহংস কোথা ছিলে,
মেলেছো তোমার ডানা আমারই ডানায় ।

আমাদের গ্রীবায় রক্তের কালো ছাপ বলেছিলো,
পাখিরা উড়তে গেলে,
শিকারির তীর এসে ওদের থামিয়েছিল ।
রূপকথা সাথে করে এনেছো, বলছো,
পরীরও পাহারাদার আছে ।

তবু জীবন আমার
ষাঁড়ের সম্মুখে ধরা রঙিন কাপড়,
এসেছো যখন চলো, হেঁটে পার হই রাজপথ ।
অবাক, দেখুন ওরা হেঁটে চলা
আমাদের সাবলীল অতি ।

১০. আমীর খসরু স্বপন

পথ

কেমন আছো পথ, পালক সন্ধানে!

প্রতিটি প্রকৃত পালক ও পালকের প্রস্থ আজ
বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে গিয়েছো ।
কেবল বহুল প্রচারিত পথে পথে
এইসব পালক শূন্য ঘটনা যথাবিহিত প্রকল্পনায়

প্রতীক্ষিত সাঁতারের ফাঁকে ফাঁকে
সমর্থ নদী হবার মতো ভেসে থাকে ।
তাহারা কেবল বহুদিকে ছড়ানো ধাতব বাহিত চাক্ষুষ
ও নদীর ওপরে চর ।
আর এইসব ফল আজ কিরূপে ধার্য
বৃক্ষবিনা পাতার মর্মরে ।

১১. অ ল কা ন ন্দি তা

বৃত্তাবদ্ধ

অঙ্কে ছিলাম না কাঁচা । ছোটবেলায় একশতে নিরানব্বই পেয়ে মাস্টারমশাইয়ের প্রিয় হয়ে উঠি । পাড়া-প্রতিবেশীদের চোখে ঘোর অমানিশা । বীজগণিত পাটিগণিত ছিল নখদর্পণে । আর জ্যামিতি? সে তো কেবল বৃত্তের মধ্যে স্বপ্নের জাল বোনা ।

স্কুল পেরিয়ে কলেজের বারান্দায় পা রাখতেই অঙ্করা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, আমি তাদের ধরে রাখি দশ বছরের টিউশনি জীবনে । আমার ছাত্রদের মুখস্থ করাই সূত্র । সূত্রে ফেলে দিলে অঙ্কের রাস্তা সোজা । এভাবে বৃত্তের মধ্যে, সূত্রের রাস্তায় চলতে চলতে আমিও বৃত্তাবদ্ধ হয়ে যাই ।

দীর্ঘদিন আকাশ দেখি না । আকাশের নীল রং কখনো কালো হয় কি না জানি না । দিন শেষে রাত এলে বৃত্ত ও সূত্রের পাঠশালায় নিজেকে নিমগ্ন রাখি । হিসেব মেলে না ।

১২. আ শি ক আ ক ব র

নয়া এশিয়ার ডাক

যে সত্য বলিনি আমি
যে সত্য বলেনি কখনো কেউ
সেই সত্য বলি-
শোনো- কানের নেকাব খুলে শোনো
চোখের তারকা বন্ধ করে কান পেতে শোনো
আমার অস্তিত্ব বিলীন করে নিজের কথা শোনো- নিজের ভাষায়
আমি কেউ নই, তোমার কথা তোমার ভাষায় বলছি আমি
শোনো- আরো মন খুলে, আরো হৃদয় দরজা খুলে শোনো
পরমপুরুষের মিলবে সাক্ষাত- অসাক্ষাতেই শোনো
তার কথা শোনো- শুনতে শুনতে শান দাও প্রতিভার পাপে
এই যে এই বিচ্ছেদ, লাল নীল বাতি, হলুদ পোশাকায়িত ইষ্টিকুটুম ডাক
কোকিলার প্রাণে বাসা বানাবার ইচ্ছেমতি উড়া
গোবাল হৃদয়ের আকাশের কান্না ধোয়া পদতল পা রেখেছে পথে
প্রেম বলো কাকে- সে তো কামের তুলিতে আঁকা কুড়েঘর
ভবিতব্য পুত্র কন্যা সুখ
এ তো সত্য নয়- এতো আশ্রয়ের কচুপাতা জল
কয়লার আগুনে সেঁকা নামহীন হযরত
পুকুরপাড়ের প্রতিবেশিনীর কাপড় পাল্টাবার কালে কোমলাঙ্গের

ইশারা ইঙ্গিত

টোপ ফেলে বসা শিকারির চোখ
ঘাসবন দেখবার লোভ
ঠাকুর ডোবানোর অবৈধ খায়েস
খায়েসের খোয়াড়ে বসে কোন সত্য বলতে চেয়েছি বলো-
যে সত্য বলেনি কখনো কেউ
সেই সত্য বলি
বলি- উপমার আড়ালে নয়
ছোটোখাটো বস্ত্রের ভাঁজ খুলে বলি
সরাসরি বলি

বলতে বলতে আরো বেশি বিপ্লবী হই
বিস্তারিত হই
শ্রেণির চোদনে তুমিও তো তড়পাও
ক্ষোভ ঢালো খরিদকৃত ক্ষণিক সহবাসে
আত্মরতির উছিলায় যারে তারে করো উপভোগ
স্ত্রীতে করো চুনকাম করা চিত্রনায়িকা
অফিসের তাড়াতে বাস ধরো, ট্যাক্সি চাপো
ফাইলে ফলাও ব্যক্তিগত ফল
ফ্ল্যাটবাড়ির লোভে জমাও ছোটোখাটো অর্থের পাহাড়
শহরতলীতে জমি কেনো
বাচ্চাকে ভালো স্কুলে পড়তে দিতে প্রাণ যায়
আইঢাই করে মধ্যবিত্ত হৃদয়
বউয়ের গয়নার তাড়া গেলো না তো
কাপড় তোলার কালেও শোনো কম কামানোর তীব্র তিরস্কার
ফ্রিজটা এলো, ওভেনটা তো এলো না এখনো
পার্সোনাল পিসি নিয়ে ওরা ঘুরে
তোমার হাতে তো সাধারণ মোবাইল
ক'মিনিটেই কেঁদে উঠে পকেট- ময়লা মানিব্যাগ
ক্যাশকার্ডে টাকা তোলো
একাউন্টে এত কী করে জমাও- ঘুষ খাও, দুর্নীতি করে
শ্রম বেচো
নাকি শ্রম চুরি করে খাও
শোষণ সাম্রাজ্যে তুমিও তো তেমন কেউকেটা নও
পাছার উপরে তোমারও পিঁপড়ের আনাগোনা
ডলারে হিসাব কষো
ইউরোর আঙ্গিনায় যেয়ে সুরত পাল্টাও
ভিক্ষাবৃত্তি ভালো কোনো কর্ম নয়
বিপ্লব ফেরাবার উছিলায় ভিক্ষাবৃত্তি করো
বিক্রি করো দরিদ্রতা, অনাহার, রোগ, শোক অশিক্ষার আঁত্লামি
বন্ধু; বাংলাদেশ এখনো দাঁড়ানো
পূর্ববাংলা এখনও পরাজিত নয়
আত্মরক্ষায় এখনও তারা আকাশ সমান
কালো পোশাক পরে ঘুরো
প্রজাপতির মতো উড়ো

যার তার বুকে ফুটাও রক্তগোলাপ
আহা-
অশ্রুতে ভরে যাচ্ছে ব্যর্থ বাংলাদেশ
কালো প্রজাপতি, তোমার তর্জনীতে দ্বিধায় নড়াচড়া
জলপাই পোশাকের তলে তুমিও মানুষ
সিসার জ্যাকেটের নিচে আছে তোমারও কোমল হৃদয়
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর পর
পতাকার মতো আঁচল উড়ায় যেইসব শোকেস শোপিচ
ওরা তোমাদের কেউ নয়
তোমার প্রমোশন আটকে আছে
বাধ্যতামূলক নিয়েছো অবসর
খাড়া আছে হাওয়াই মেঘের জেনারেল
মার্চ করো, গুলি করো, ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত করো বুক
দ্বিধার পাহাড়চূড়া থেকে নেমে আসো
ওহে জেনারেল, তোমার পাশে এনজিও শকুন
অমরিকান প্রেতের রক্তমাখা হাত
ড্রাকুলার দাঁত
ইন্ডিয়ান আপেল ঢুকে যাচ্ছে তোমার পায়ুপথে
সাগরেও ঢুকছে বার্মিজ লিঙ্গ
জরায়ু কোথায় তোমার
পাকিস্তানি বাসমতি চালে পেট ভরে
প্রটোকল ভেঙে খেতে পারো
ভোটের বাক্সের কাছে তুমিও তো অসহায়
খেলনা কারবাইন বইতে বইতে ওরাও তো ক্লান্ত
ক'টা কামান আছে তোমার
ক'টা এফ্সিক্সটিন
নৌবহর তো অচল অস্ত্রে বোঝাই
ক'ব্যাগ বুলেটের পরেই তুমিও তো অসহায়
কবুতর স্কোয়াড আছে তোমার- কিংবা হাতির
সরাইলগুলোকেও তো দিলে না ট্রেনিং
আনসারের পোশাক পরিয়েছো আর্মিকে
ব্রাভো সাবাস
শান্তিবাহিনীরা এখনো তৎপর
সাগরমাতার পাশে ঐ যে গেরিলা বাহিনী

ওরা কারা
হিমালয়শৃঙ্গের মতো দাঁড়াচ্ছে গ্লোবালে
ভুটানে বোমা মেরেই লুকায় কোন সে মহাজন
জাহানাবাদ জেলখানায় মুহূর্তেই শাসন কায়েম করে কারা
পাকিস্তানে খুবই গোপনে সংঘটিত হয় কোন সে বাহিনী
চীনের চরণে আবারও গোপনে লিফলেট বিলি করে
কোন সে মানুষ
ভারতের ঝাড়খণ্ড কাদের দখলে
মধ্যপ্রদেশ কিংবা তেলেঙ্গানা কিংবা মহারাষ্ট্র
কার কথা কয়- তোমার- তোমাদের
ধীরে, বন্ধু ধীরে
আকাশে কাফ্রি মেঘ- বৃষ্টি ঝরানোর এসে গেলো বেলা
অণ্ডকোষে পিঁপড়ের কামড়
প্যান্ট খুলো, সার্ট খুলো, খুলো আন্ডারওয়্যার
বাংলাদেশে লজ্জা কী
নাসরীন বলে এক বোন ছিলো আমাদের
দাউদ বলে এক ভাই
কমরেড হুমায়ুন আজাদকে তো তোমরা মেরেই ফেললে
‘কোন পক্ষে যাবে’- আহা, রুদ্র মুহম্মদ
আকাশে কেমন আছো তুমি
ওখানেও অণ্ডকোষে পিঁপড়েরা কামড়ায়
মাসে মাসে ধর্ষিতার রক্ত ঝরে
মোড়ে মোড়ে ব্লুফিল্মের দোকান সাজানো
লং ড্রাইভে যেয়ে কাউকে কি মাঠে ফেলে আসা যায়
ইউরোপিয়ান হুইস্কিতে ডুবে হলুদ শয়তান কি চিৎকার করে
আর্ট ফর আর্ট সেক
আরব্য শরাবে মশগুল পাখিরা কি বলে-
খুলে দিলাম জান্নাতুল ফেরদাউস
আত্মঘাতী হও, ইশকের শানে মিলবে কিনার
গ্রিকের উপমা ব্যবহার করে কবি, করে কি গর্ব বোধ:
ল্যাটিনের ম্যাজিক রিয়ালিজমে পাছা খুলে দেয় দৌড়
পেটের খায়েসে পেট কেটে করে কি জন্মনিয়ন্ত্রণ
মোগাদিসুর মরতবায় উল্লসিত হয়
পুরুষ ধরতে সৌখিন সেক্সিরা, গুলশান, ইস্টার্ন প্লাজা কিংবা

বসুন্ধরা সিটিতে আসে
একরাত শ্রম দিলে একমাস কবিতা করার অর্থকড়ি মেলে
চেইন খুলে কেউ কি শাহবাগ আসে
যত্রতত্র করানো যায় কি জরায়ু খালাস
ঐ যে, ঐ মডার্ন বানর
ইডিপাস কমপ্লেক্সে ভোগা জর্জ বুশ
আমাদের পেট খালাস করতে দিচ্ছে না
বিছছিরি লাগছে গ্রে বিবাহের সামনে
ওর লিঙ্গ উঁচু করে দাঁড়ানোতে
কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা তর্জনীকে নিয়ে
ও বেশ ভাগবাটোয়ারা করে খাচ্ছে পৃথিবীটাকে
বুড়ো আঙুলটাকে চেপে ধরা দরকার
আফগানের পিকনিক পার্টি শেষ
চোরাগোপ্তা আক্রমণ করছে চেঙ্গিসের চেলারা
কাজী নজরুলকে বলো তো একটা কবিতা লিখে পাঠাতে
ইকবাল কি খুব বেশি ঘুমে
ইরাকে আটকে গেছে ওর পা
উল্লসিত আমাদের হৃদয়
হিজবুল্লার গেরিলারা দেখিয়েছে খুব- সাহস রাখোরে ভাই
এখনও তো পরাজিত নই- ইয়াহুদি ব্রেন তো, মাঝে মাঝে ভয় লাগে
কার্ল মার্কসকে জাগাও তো, হ্যাঁ, এঙ্গেলসকেও জাগিও
স্যুসুর লাকা ফুকো রোড লোবোস্কি চমস্কির থাপ্পড় খাওয়াটা
বেশ জরুরি হয়ে পড়েছে
পাভলভকেও পাঠিও
বাতিল ফ্রয়েডটা এখনও জ্বালাচ্ছে খুব
রাসেলটাকে আমরাই লাথি মেরে বঙ্গোপসাগরে ফেলতে পেরেছি
বিশ্ববিপ্লবের ঝটিকা কেন্দ্রে আমাদের অবস্থান
ভালো লাগছে তোমার, ভাই রুদ্র- ভালো লাগছে
লোরকা কিংবা নেরুদার সাথে কথা বলো
এই ফাঁকে কোমরটা গামছাতে বেঁধে নেই
চাষবাস খুব জরুরি
বিআর এগারোর ক্ষেতে পানি নেই
ফারাক্কার বাঁধটা ভাঙবো ভাবছি
সুষম বণ্টনের প্রস্তুতি নিচ্ছি

কিছু কিছু এলাকা মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করবো
ঐসব এলাকায় পুলিশের প্রেম নিষিদ্ধ করে দেবো
ওখানেই কবিতার সাথে সহবাসে কাটাবো চন্দ্রভরা রাত
চাঁদে চাঁদে মিলবে চাঁদ
আহা- হোলি খেলাময় বাসরশয্যা হবে অষ্টপ্রহর
বর্ম পরো
আর হ্যাঁ, মাও, মানে আমাদের মাও সে তুঙ
ওকে একটা গেরিলা বাহিনী দ্রুত সংগঠিত করে পাঠাতে বলো
ভারতবর্ষটার জেনারেল শাসক হওয়াটা আবার আমার জরুরি
হয়ে পড়েছে
প্রলেতারিয়েত প্রজাকুলের দিকে তাকাতে পারছি না
মধ্যবিত্তের উর্দির নিচে ক্ষোভ ঘৃণা ফ্রাস্ট্রেসন
ঘুমানোর আগে নয়া এশিয়ার মানচিত্রটা
মধ্যরেখামুছা মানচিত্রটা
নিয়ে আসছি
খুব বেশি ডেকো না তো
সময়মতো এসে যাবো ঠিকই
মেঘের উপর ভাসছে যে হুইল চেয়ার, সেটা তো আমার- আমাদের ।

১৩. আ হ মে দ ন কী ব

চুন-পর্ব

চুন, দ্রুত লাফিয়েছে ভাণ্ডের বলয়
থেকে । চক্রপাকে ঘুরে গিয়ে
মনিবের গৃহে শোভা পাওয়া তার ধর্ম-জ্ঞান,
অথবা হাড়ের বৃদ্ধিগুণ ধরে রাখা ক্রিয়াকলাপের
কিছু ভাষা জানা আছে রসায়নে;

লাফিয়ে পড়েছে চুন অরণ্য শয্যায়,
পত্রালিতে সঞ্চারিল এত তেজ!

প্রকৃত খাদ্যের ভাণ্ড ভেবে বহু লাফঝাঁপ ।
পাতা খাদ্য প্রস্তুতিতে ডুবে গিয়েছিল খুব, নিজ প্রয়োজনে ।

বাকি দৃশ্য : মনিবের ভোজপর্বে চুন
প্রতিবার পত্রালির সহযোগে নেমে যায় খাদ্য কোলাহলে,

খাদ্যলোভে এত ভাণ্ড ত্যাগ নিষ্প্রয়োজন;
গৃহপ্রাচীরের সাথে হেতু পায় তার মিশ্রক্রিয়াকলাপের
ভাষ্য
অথবা হাড়ের বৃদ্ধিগুণে পরিমিত চুন ব্যবহার
খুব প্রয়োজন নাকি?

উপরে নিন্দিত সবভাষা মনিবের; মনিবের
যাবতীয় পুরুষের শাখা-ব্যবসায়, বৃদ্ধিতে, সজ্জায়
চুনের কঠিন ও সজল ব্যবহারে
দিনে দিনে বাড়িয়েছে নব-ঐশী-ধারা বল ।

উৎস : রফিকউলাহ খান সম্পাদিত “বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা”

১৪. র ও শ ন ঝু নু

আড়াল

তোমাকেই ভালোবাসি

এই অপরাধে ছোট হতে হতে
মিশে গেছি মাটির সাথে...

কখনো বাতাস যদি ধুলা করে
উড়িয়ে তোমার গায়ে নিয়ে ফেলে
সেই ভয়ে, জলের জঠরে

মিলেমিশে কাদা হয়ে থাকি সারাক্ষণ...

আমি তো মীন রাশি নই
তবুও মাছের স্বভাব, জল ছাড়া বাঁচি কই!
জলের পরতে-পরতে জালের ফাঁদ;
প্রেমহীন জেলেদের হাতে শুঁটকি হওয়ার সাধ
ছিলো না কখনো, তবুও চিৎ রোদে সটান শুকাই
নিরবধি নরম কাদা...

কোনো একদিন তোমার মাটির ঘরে
লেপনের কাজে তুলে নাও যদি
জলের কসম, জলে আর ভিজবো না আমি...

এইভাবে প্রলেপে প্রলেপে
মাটির মিহিন ভাঁজে মিশে যাবো দিনে দিনে
তোমারই হাতে, তোমারই ঘরে
কোনোদিন জানবে না তুমি...

১৫. ব্রা ত্য রা ই সু

কুকিলের বাসায় উকিল

কুকিল সাহেব, কুকিল সাহেব,
বাসায় নিকি?
আমি আসছি উকিল, আমি নিজের কথা কইতে নারি
পরের কথা কই
আপনে আমার সই ।

তাই তো ডিয়ার, আমিও কাকার– মানেটি কাকের
বাসায় থাকি । কিন্তু আবার
এইটা আমার নিজেরও বাসা–

যেহেতু এইটা ভাড়াও বাসা–
সেহেতু আপনে ভিতরে আসেন–
নিকটে বসেন–
মনের কথা কই;
ক্যাসেট ছাড়েন ওই ।

শোনেন কুকিল, সিরিয়াসলি শোনেন আপনে
বালের ক্যাসেট বন্ধ করেন
কবিতা লইয়া ভাবেন কিছু?
কারোটাই তো কিছু হয় না
ভরসা এখন কই?
আপনে একটা মানুষ এবং উকিলও আছেন
কবিতা লইয়া বইসা থাকলে কামটি হবে?
ভরসা এখন ফরোসা হইছে, পরের জিনিস আগে আইছে–
এক্সওয়াইজেড কখগ খাইছে–
চলেন আমরা মুখ ফিরায়ে আগের কথাই কই–

বাট, আগে, রবিবারটি রবিবাবুরে গিফট করিয়া লইইই ।

১৮/০৫/২০০৪ – ৩০/১২/২০০৯

১৬. অ দ্বি ত্ব শা প লা

হালখাতা

যখন এ লোকালয় ইট পোড়া শেখেনি; তারও আগে আমাদের এই অনুন্নত গ্রামদেশে হালখাতা হতো; ঋতুভেদে বহুবিধ কোলাহল তুলে । ফলে হালখাতা মানে একটা সরল খুশির সমারোহ; সামান্য শিশু থেকে বিজ্ঞ প্রৌঢ়ের কাছেও... যৌথ প্রয়োজনে পৃথক দেনা-পাওনা মেটায় নিরপেক্ষ গ্রাম সহোদর । অবিচ্ছিন্ন শিশুকুলের নানা প্রকার প্রীতি-উল্লাস দেখে পঞ্জিকা হেসে ওঠে শেষে ।

হালখাতা আজও হয় গ্রামে-গঞ্জে মহাজনের দোকানে দোকানে। কেবল কৃষককুল টিপসহিতে হালের দাম জলের দামে দিয়ে, বাড়ি ফিরে হাতের কালি ধোয় বিষণ্ন মুখে...

১৭. জ্যো তি পো দ্দা র

ইচ্ছে ডানার গেরুয়া বসন

দশ আঙুল গড়িয়ে পড়ে যায়
পড়ে যাচ্ছে
থক থক সবুজ রক্ত।

জল পড়ে
পাতা মরে
সারি সারি পাতার লাশ
দাহ উৎসবে মত্ত শ্মশানপাড়া।

কে করবে মুখাগ্নি?
আগুন শলাকা নিয়ে কাঁপছে হরিশ্চন্দ্র
এমন কাঁপুনিই তো কেঁপেছিল সে রূহিদাসের
দাহকালে।

এ কোন দাহকাল!
বৃক্ষদের চিৎকারের স্কেলে কর্পোরেট ম্যানেজার
টুকে নিচ্ছে শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধি সূচক।

১৮. শে লী না জ

বীর্যব্যাংক

কেউ একজন তোর গর্ভমুণ্ডে ঢেলে গেছে বিষ
ফুলে ফেঁপে উঠছিস, ঋতুবন্ধ আনাড়ি কিশোরী
তোর গর্ভে ঢুকে গেছে ফুসলিয়ে একটা শিরীষ
তার ডালপালা নিয়ে ফুঁসে ওঠে বাহক শরীর
গর্ভপাত, জ্বর, ফের বর্জ্য, ধাতু সবুজ জঙ্ঘায়
বহুবলভের বলমে ফুটপাতে বধির শর্বরী

মালবাহী যান, বীর্যপাত্র ভেঙে কোথায় ছড়াবি?
ঘর নেই তোর, তুই শুধু রন্ধ্র, আনন্দ-গহ্বর
নিশিকন্যা, দিনে প্রস্তর নিক্ষেপ রাত্রিতে আবীর
ক্লেদ ও কলুষ জমে, পুরুষের বিষে স্ফীতোদর

তোর গর্ভকান্না শুনবে না কেউ, তুই ভ্রাম্যমাণ বীর্যব্যাংক
তোর দিকে তাক করা সামাজিক অস্ত্র, ধর্মযন্ত্র
পাদ্রি ও পুরুত আর ধর্ষকামী পুরুষের অগ্নিবাহী ট্যাংক!

১৯. ই ক তি জা আ হ সা ন

গোড়ান বাজার

কিছু ধুলা খাই, কলার হলুদ ছোলায় পিছলা খাই
রাস্তার দুধারে নানারকম সবজি সাজিয়ে বসে আছে
চাকুয়ালা ব্যবসায়ী; রেস্টুরেন্টের সিঙ্গারার আলুতে
মিশে যায় পাজেরোর দ্রুতগতি চাকায় প্রাণ পাওয়া
কণা কণা বালির বহর

মাছের সাজিতে সমপরিমাণ মাছির আওয়াজ নেই
আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে ফরমালিন শেখায় এডাপ্টটেশন।
নিম্নবর্গের মেয়েরা জড়তাহীন
রাস্তায় উড়ায় সুখ, স্বপ্ন, বাসনার সাদা সাদা পেঁজা পেঁজা তুলা
হারিয়ে যাওয়া তাছলিমা
অচেনা মুখের আদলে নানাভাবে ফুটে থাকে
তার দেহের ভাঁজ; ভঙ্গিমা–
অন্যের শরীরে রূপ পায়।
জনাধিক্যে ধাক্কা খায় কাঁধ
ছিড়ে যায় একমুখিনতার রশি
তাছলিমাই ফের ফিরে আসে
রক্তে তার শরীরের আস্বাদন ফুরায় না
সখি লো, খাইয়্যা বুকের হাড়
হইলি পাষাণ পাহাড়
তোকে ছুঁই না, ছোয়ার বাসনায়
হারাইছি রাস্তা গোলকধাঁধায়...
এই গোড়ান বাজার, বাজারের সকল নিয়ম
নীতিসুদ্ধ ধারণ করে মেলে ধরে আছে তার বুক
ভোগের ধর্ম মেনে ঘেরাটোপের মানুষ
পাখির ডানায়, বৃক্ষে, পত্র-পলবে
অনাবাদী মাঠে রোপণ করছে অসুখ।

২০. চ ঞ্চ ল আ শ রা ফ

বৃষ্টি

যে গান শুরু হলো মেঘ থেকে, আজ এই সন্ধ্যা মুছে যাক
তার অজস্র ফোঁটায়।

আর এখন শহরে বৃষ্টি হচ্ছে।
কোথাও বৃষ্টি হলে সারা পৃথিবীর সব ভিজে যায়;

মৃত সৈনিকের কবর থেকে মহড়াফেরত সেপাইয়ের হেলমেট
প্রেমিকার রুমাল থেকে প্রেমিকের ছন্নছাড়া দিন
কিছুই থাকে না বাকি, প্রাণান্ত চেষ্টায় যে জলাশয় কোনোদিন

ভেজাতে পারে না তার তীরবর্তী ঘাস, ঝোপঝাড়
সে-সবও ভিজে যায় বৃষ্টির অনায়াস ভূমিকায়

দ্যাখো, ভেজা পথ পায়ে আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মুছে যাচ্ছে
গোধূলিপীড়িত একটি মানুষ।

হয়তো তার অভ্যন্তর বৃষ্টিতে ভেজেনি এখনো।
এ-রকম গানের ভেতর নিঃসঙ্গ, টলোমলো, অপসৃত হতে পারে কেউ!

সারা পৃথিবী এখন ভিজে যাচ্ছে ভারাক্রান্ত মেঘের বার্তায়
তবু গোধূলিলাঞ্ছিত কেউ এই গান উপেক্ষা করে চলে যায়
নিজস্ব ডেরায়।

২১. শ ও ক ত হো সে ন

‘আমি’ না ‘তুমি’

যে ফুল, তার ফল হওয়ার প্রলোভনকে
নস্যাৎ করতে পেরেছে–
সে-ই হতে পেরেছে ফুল;
যেমন, লালরক্ত গোলাপ তার ফলের প্রলোভনকে নস্যাৎ করেছে!

যে ফল, তার ফুলের মহিমাকে
ম্লান করতে পেরেছে–
সে-ই হতে পেরেছে ফল;
যেমন, কালোরক্ত জাম তার ফুলের মহিমাকে ম্লান করেছে!

...এভাবে 'আমি' থাকলে 'তুমি' বাঁচো না
'তুমি' থাকলে 'আমি'–

তাহলে, কে বাঁচবে–
'আমি' না 'তুমি'...?

ক বি তা আ লো চ না

.....

নব্বইয়ের ২১ কবির ২১টি কবিতা প্রসঙ্গে

[এ-সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতার কবি সকলেই নব্বই-এর দশকের। এ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাগুলোর কবির নাম মুছে দিয়ে এবং যে ক্রমানুসারে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে সেই ক্রম এলোমেলো করে দিয়ে এগুলোর ওপর আলোচনা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম দেশের উল্লেখযোগ্য কবি নাসির আহমেদ, কবি ও গবেষক হিমেল বরকত এবং ১ম দশকের কবি মাজুল হাসানকে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে এঁরা আলোচনা তিনটি সমাপ্ত করে গোলাঘরে ছাপার জন্য দিয়েছেন। এঁদের কাছে গোলাঘর-এর পক্ষ থেকে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কবিতার সঙ্গে কবির নাম না-থাকায় আলোচকত্রয় কবির নাম উল্লেখ না-করে শুধু কবিতার ওপর ভিত্তি করে আলোচনা তিনটি সম্পন্ন করেছেন। এতে আলোচনা কবি-ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত থেকেছে আশা করা যায়। তিন কবি-আলোচকের মূল্যায়নে নিশ্চয়ই ভিন্নতা থাকবে; এটি হয়তো সত্যিই কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার। কবিতাগুলো কেমন হয়েছে এবং এর ওপর আলোচনা কেমন হয়েছে সেই রায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঠকের ওপর বর্তায়। উল্লেখ্য, শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে এই ২১টি কবিতা ছাপা হল, বিষয়টি এমন নয়। সেকারণে আশা করা চলে, আমাদের ওপর কারোরই ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আর থাকল না। কারও-কারও অনুরোধে শওকত হোসেনেরও একটি কবিতা এখানে প্রকাশ করা হলো, এক্ষেত্রে আতি-প্রচারের অভিযোগে তাকে, প্রিয় পাঠক দায়ী করবেন না আশা করছি। –সম্পাদক দ্বয়]

না সি র আ হ মে দ

১. 'উষষ্ণতা'য় কবিত্বের অভাব নেই। আছে কবিকল্পনার ব্যাপ্তিও। কিন্তু শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই কবির এক ধরনের মোহ আছে, যা লাগসই কি-না সে বিবেচনাকেও মাঝে মধ্যে ক্ষুণ্ন করে। যিনি 'মাথার ওপর টাঙানো আকাশ' 'জীবনের পায়ে আঁকি অমরত্বের সুবর্ণ রেখা'-এর মতো সুন্দর পঙ্‌ক্তি লেখেন, সচেতন পাঠক তার কাছ থেকে অসঙ্গতিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার প্রত্যাশা করবেন না। 'চোখের চপল বেয়ে টলটলে ঘ্রাণ নিয়ে' কিংবা 'চাঁদের পালানজুড়ে প্রান্তিক নক্ষত্র' খোঁজা খুব সুন্দর শোনায়, কাব্যিকও। কিন্তু 'চোখের চপল বেয়ে' মানে কী? কিংবা 'চাঁদের পালান'? চপল অর্থ হচ্ছে অস্থির, চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী, লঘু ইত্যাদি। আর পালান শব্দের অর্থ হচ্ছে শাকপাতা, ছোট ছোট অসার গাছ, বাড়ি সংলগ্ন জমি। চাঁদের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী! শুধু এই কবিকে নয়, নিজেকেও বলি– উপমার সঙ্গে উপমানের সম্পর্ক-সাযুজ্য আছে কি-না জেনে যেন আমরা তা প্রয়োগ করি। শব্দটি সুন্দর বলেই ব্যবহার করা ঠিক নয়। তবু আমরা করে ফেলি। এ শব্দমোহ অনেক সময় অর্থহীন পঙ্‌ক্তি তৈরি করে, কখনও ভাবের ঐক্য বিনষ্ট করার মতো উল্লম্ফনধর্মী কবিতারও জন্ম দিতে পারে, যা কাম্য নয়।

২. মেলবোর্নের মতো প্রবাস-পরিবেশে যে দিগন্তস্পর্শী পাহাড়ের বর্ণনা দিয়ে 'আইটন্স অন ইয়ারা (পাহাড় লাগাচ্ছে মাসকারা)' কবিতাটি শুরু হয়েছে, সেখানে আঙুর বাগান, ল্যাটিন লধুসহ আরও বেশ কিছু শব্দ প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে। শেষদিকে সাধু ভাষায় কাব্য পঙ্‌ক্তি রচনার প্রয়াসও লক্ষণীয়। কাজী নজরুল ইসলাম 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই' বলে শতাব্দী আগে যে কল্পনার বিস্তৃতি দিয়ে গেছেন, তাতে একালের কবি লং ড্রাইভে যেতে যেতে দু'পাশের পাহাড় পেরিয়ে অন্তত সামনের দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড় দেখে কল্পনা করতেই পারেন পাহাড় লাগাচ্ছে মাশকারা, দিগন্তে সুরমা লাগাচ্ছে খুব যতনে। এই কবিরও কবিত্বে এতটকু ঘাটতি নেই। শুধু ঘাটতি ভাবনার ঐক্যে। অনেক কষ্ট করেও একটা টোটালিটি দাঁড় করানো কঠিন হয়ে যায়। অথচ খ খ চমৎকার চিত্র, পঙ্‌ক্তিতে সজ্জিত।

৩. 'ধুলোবালি, পাপ' আত্ম অনুশোচনার শুদ্ধ প্রকাশ। অক্ষরবৃত্তে সাজানো, অন্ত্যমিল নেই কিন্তু সুরেলা তারপরও। কবিতাটি হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু এতটা সরল বিবরণধর্মী কবিতা কি একালের কবির কাছে প্রার্থিত? তারপরও প্রশংসা করি এ জন্য যে, কবিতার যে ভাবের ঐক্য থাকা চাই, তা এই কবি পুরোপুরি মান্য করেছেন। কবিতার জন্য সুরও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্তত বাংলা কবিতায় সুর হাজার বছরের ঐতিহ্য। সুরই কবিতাকে প্রথমত গদ্য থেকে পৃথক করে। তবে বিশুদ্ধ অক্ষরবৃত্তের

কবিতায় চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে (ভেঙেছে আমার এই আগুনলাগা দেহ) কোন উদাসীনতায় যে তিনি ছন্দ পতন ঘটালেন, সত্যি তা ভাবিয়ে তুলবে সচেতন পাঠকদের।

৪. 'নিরুদ্দেশ যাব' নিঃসন্দেহে কবির মেধার পরিচয়বাহী একটি কবিতা। অক্ষরবৃত্ত নয়, প্রবহমান মুক্তক আঙ্গিকে সচেতনভাবে সাজানো। সুর আছে, ছন্দ আছে, তবে প্রাচীন রীতির নয় এ ছন্দ। সবচেয়ে বড় কথা, চিত্রকল্পে বিন্যস্ত এই কবিতায় প্রতীকী ভাষ্যে কবি যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন, তা যথার্থ কবিরই স্বপ্ন। আপাতত শুনতে বা পড়তে সহজ-সরল মনে হয়। কিন্তু প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অর্থের একাধিক মাত্রা পেয়েছে। আমার কাছে অন্তত সুখপাঠ্য মনে হলো।

৫. প্রথম পঙ্‌ক্তিটিই চমৎকার কাব্যিক। গদ্যে লেখা হলেও সুর তাতে নষ্ট হয়নি। তবে পুরো কবিতাটি পড়ে যে সার্বিক কবিত্বের গাঢ়তা, তা কিন্তু মিলল না। জীবনের কিছু শাশ্বত সত্য, দার্শনিক উপলব্ধি নিয়ে উপস্থিত হয়েও যে পূর্ণাঙ্গ উত্তীর্ণ কবিতা হওয়ার জন্য আরও কিছু লাগে, তা এই কবিতা পড়ে মনে হয়েছে। মধুকূপি ঘাস লিখতে গিয়ে ভুলক্রমে 'মধুলোভী ঘাস' লিখেছেন? বোঝা গেল না।

৬. কবিতা নিয়ে নিরীক্ষার অভাব নেই। আজ থেকে অন্তত ৩০ বছর আগে এ রকম দরখাস্ত আঙ্গিকে প্রয়াত কবি সৈয়দ হায়দার একটি কবিতা লিখেছিলেন। আঙ্গিকের জন্যই যে তা অভিনবত্ব এনেছিল তা নয়, বক্তব্যেও হঠাৎ একটি চরণে কবিতা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। কবিতার ঝিলিকহীন নিরীক্ষা কি কবিতার দাবি পূরণ করতে পারে? এই কবিকে নতুন করে আরেকবার তা ভাবতে অনুরোধ করি।

৭. প্রকৃত গদ্য কবিতা কমই লেখা হয়। আল মাহমুদের 'চক্রবর্তী রাজার অট্টহাসি' যারা পড়েছেন অথবা আহসান হাবীবের 'আবহমান', তারা উপলব্ধি করেছেন গদ্য কেমন করে রাশভারি আর ব্যঞ্জনাময় কবিতা হয়ে উঠতে পারে একই সময়ে। নব্বই দশকের এই কবির কবিতাটি সেই ব্যঞ্জনার দাবি পূরণ পুরোপুরি করতে পারেনি বটে। তবে আমার কাছে কবিতাই মনে হয়েছে এবং তা রূপক-অলঙ্কার নিয়েই কবিতা। একটা গল্প আছে পুরো কবিতাজুড়ে। এই প্রতীকী গল্পটাই কবিতার সৌন্দর্য এখানে। শেষ তিনটি চরণ বেশি ভালো লেগেছে।

৮. 'মালের আড়ত'-এ জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে হালখাতার সম্পর্ক খোঁজার বিষয়টি নতুন। ভালো লেগেছে এই ধারণা। তবে 'মৃত্যুতেও মিষ্টিমুখ' করানো হয় না কিন্তু। মিষ্টিমুখ করানো হয় কুলখানি কিংবা চেহলামে। যা-ই হোক, কবিতা হিসেবে মোটামুটি উৎরে গেছে বিষয়ের অভিনবত্বে। শেষ দুটি চরণ তুলনামূলক উজ্জ্বল।

৯. 'পথ' একটি প্রতীকী প্রেমের কবিতা। মোটামুটি উত্তীর্ণ। তবে এ ধরনের বিষয় লিরিক দাবি করে। আমার অভিজ্ঞতা অন্তত তা-ই বলে। তাতে বিষয়টা হৃদয়গ্রাহী হয়। আবার কেউ যদি 'হেঁটে পার হই রাজপথ' পঙ্‌ক্তিতে দ্রোহ দেখতে চান, দেখতে পারেন। কবিতার এটা গুণ।

১০। 'পথ' কাব্যিক নিঃসন্দেহে। পথও প্রতীকী। বুঝতে পারি– যখন পড়ি 'কেবল বহুল প্রচারিত পথে পথে'। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'প'-এর সচেতন অনুপ্রাসও লক্ষণীয়। কিন্তু যখন পড়ি 'এইসব পালকশূন্য ঘটনা যথাবিহিত প্রকল্পনায়/প্রতীক্ষিত সাঁতারের ফাঁকে ফাঁকে/সমর্থ নদী হবার মতো ভেসে থাকে।/তাহারা কেবল বহুদিকে ছড়ানো ধাতববাহিত চাকা' তখন পারস্পর্য, অর্থের যথার্থতা আর সঙ্গতি খুঁজে পাই না। প্রসঙ্গটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ধাতববাহিত চাকার সঙ্গে নদীর সম্পর্ক কী? কবিতা যতই প্রতীকী চিত্রকল্পময় হোক, তার পারস্পর্য এবং প্রতিটি অনুষঙ্গ যেন সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যে কবি যত দক্ষতায় তা পারেন তিনি ততো সার্থক। সহজ করে বলার ক্ষমতা অর্জন সহজ নয়। সেই সহজের সাধনাই মহৎ কবিতা।

১১। 'বৃত্তাবদ্ধ' যেন একটা আত্মজৈবনিক গল্প। কিন্তু সহজ অথচ ব্যঞ্জনাময়। শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই বৃত্ত, অঙ্ক, জ্যামিতির যত গল্প বলা। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিই কবিতা। বাকি পঙ্‌ক্তিগুলো দর্শনটাকে প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে মাত্র।

১২। 'নয়া এশিয়ার ডাক' কবিতায় নব্বইয়ের কবি দাবি করেছেন, 'যে সত্য বলেনি কখনো কেউ/সেই সত্য বলি।' যা কেউ আগে বলেনি, সেই অশ্রুত কথাই তো প্রত্যেক মৌলিক কবির আরাধ্য। তা কতখানি কবিতা করে বলা যায়, সেটাই হচ্ছে দেখার বিষয়। বক্তব্যই কবিতা নয়, এটি কবিতার একটি প্রধান উপকরণ। এই দীর্ঘ কবিতায় একজন আবেগপ্রবণ, রাজনীতি সচেতন কবির উচ্ছ্বাস আর বিশ্বাস নানা দ্বন্দ্বে উচ্চারিত, উচ্চকিত। যারা কবিতায় প্রবল রাজনীতি এবং সমকাল মোটা দাগে দেখতে চান, তাদের ভালো লাগতে পারে এই দ্রোহী উচ্চারণ। তবে যে এশিয়ার স্বপ্ন তিনি দেখছেন, তা রোমান্টিক কবি-কল্পনাই এখনও পর্যন্ত। কারণ বড় জটিল এর আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। রাজনীতি তো আরও দ্বন্দ্ব সংকুল।

১৩। 'চুন-পর্ব' সুসজ্জিত ছন্দোবদ্ধ কবিতা। প্রতীকী এবং চিত্রকল্পময়ও বটে। তবে সহজপাচ্য বলতে যা বোঝায় তা নয়। প্রতীকী কবিতা শৈল্পিক এবং প্রতীক-চিত্রকল্প

ভালো কবিতার জন্য অনিবার্য। কিন্তু অতটা আড়াল কাম্য কি হবে, যা দূরান্বয়ী এবং প্রায় অগম্য করে দিতে পারে প্রতীকটিকে?

১৪। 'আড়াল' হৃদয়গ্রাহী, প্রেমিকের বেদনার্দ্র উচ্চারণ সন্দেহ নেই। সহজ করে বলার চেষ্টাও ভালো। তবে অতটা সহজও কাম্য নয়– যা ভাবনাকে উস্কে দেয় না কিছুটা আবিষ্কারের আনন্দে অবগাহন করতে। শুরুর দুটো পঙ্‌ক্তি পড়ে লিরিকাল অক্ষরবৃত্ত ভেবে বসবেন সচেতন পাঠক। পরে আর ছন্দরক্ষিত হয়নি। এটা কাম্য নয়। গদ্যে লিখলে প্রথম চরণেই জানান দিতে হবে। ছন্দেও তা-ই। অধিকাংশ পঙ্‌ক্তি অক্ষরবৃত্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। শেষ চারটি পঙ্‌ক্তি বেশ মনোগ্রাহী।

১৫। 'কুকিলের বাসায় উকিল' ছড়ার ঢঙে কবিতার নিরীক্ষা? কিন্তু শালিনতা বাদ দিয়ে (বালের ক্যাসেট বন্ধ করেন) এ কেমন নিরীক্ষা? কবিতা বোঝা সত্যি দুরুহ হয়ে উঠছে! কবিতা নিয়ে নানা রকম রসিকতাও চলছে দেখছি। অতীতেও এমন দৃশ্য দুর্লক্ষ নয়।

১৬। 'হালখাতা' বক্তব্য হিসেবে বাংলার নিপীড়িত কৃষক সমাজে শাশ্বত সন্দেহ নেই। 'শিশুকূলের নানা প্রকার প্রীতি-উল্লাস দেখে পঞ্জিকা হেসে ওঠে' বাস্তবিকই কবিতা। কিন্তু পুরো কবিতাটি যে কেবলই উচ্চকণ্ঠ বক্তব্য। কবির কাছ থেকে রসজ্ঞ পাঠক গভীরতা আর বাক্যের দ্যুতি প্রত্যাশা করেন। তা অতীতে যেমন সত্য, আজও তেমনই।

১৭। শেষ তিনটি পঙ্‌ক্তি চমৎকার। জিজ্ঞাসার জবাব কোথায় পাব আমরা? মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগ বড় নির্মম। কিন্তু ওপরের ঘটনা এবং পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ কি সমন্বিত হয় শেষ তিন
পঙ্‌ক্তির সঙ্গে?

১৮। 'বীর্যব্যাংক' পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনাচারে জর্জরিত নারীর জন্য গভীর সমবেদনায় একজন নারীবাদী কবির আন্তরিক উচ্চারণ। সুরময়, ধ্বনিময়ও। এই কবি ছন্দদক্ষ এবং ধ্বনিদক্ষ। বৈষম্যপীড়িত সমাজের ছবি হওয়ায় স্লোগানে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তা হয়নি। ধন্যবাদ।

১৯। 'গোড়ানবাজার' কবিতায়ও অন্য আঙ্গিকে এসেছে নির্যাতিত নারীর কথা। লোকায়ত জীবনের কিছু চিত্রও এসেছে অনুষঙ্গ হিসেবে। 'মাছের সাজি' (টুকরি অর্থে) এর মতো শব্দবন্ধ, 'পরিপাকতন্ত্রকে ফরমালিন শেখায় এডাপ্টেশন।'

সাম্প্রতিক বটে। কিন্তু এই বক্তব্যই যদি সুর পেত শব্দের গুঞ্জরণে আরও গভীর হতে পারত। কেন এত সুরবিমুখতা– বুঝি না। শেষ পাঁচটি চরণে কিন্তু দূরের অন্ত্যমিলে বুক আর অসুখের একটা সুর তৈরি হয়েছে, যা আমার অন্তত ভালো লেগেছে।

২০। 'বৃষ্টি' প্রকৃতিমনস্ক একজন কবির শুদ্ধতাপিয়াসী কবিমনের ভাব প্রকাশ করেছে। ভালো লাগল। শুরু থেকে শেষ অব্দি একটা ভাবনার ঐক্যও কাব্যিকতায় সফলভাবেই ধরা আছে। 'ভারাক্রান্ত মেঘের বার্তা' কিংবা 'গোধূলিপীড়িত একটি মানুষ' 'আজ এই সন্ধ্যা মুছে যাক তার অজস্র ফোঁটায়'– এইসব বাক্য প্রকৃত কবির পরিচয়ই উৎকীর্ণ করবে। দুর্বোধ্য না হয়েও কবিতা ব্যঞ্জনাময় আড়াল নিয়ে বোধ্য হতে পারে। সবসময় তা-ই প্রত্যাশা থাকে আমার।

২১। সুন্দর। প্রশ্নটির উত্তর জটিল হলেও উপমার সঙ্গে উপমানের সাযুজ্যে– সর্বোপরি প্রকৃত গদ্য কবিতার বাকরীতি আত্মস্থ করেও গদ্য নয়, 'আমি', না 'তুমি' প্রকৃত কবিতাই মনে হচ্ছে। কবিকে ধন্যবাদ।

হিমেল বরকত

১.
পরাবাস্তব অনুষঙ্গের অন্তরালে প্রকৃতি ও জীবনের একাত্ম মৌতাত কবিতাটির মূলসুর। ধাবমাল জীবন তার ক্ষয়িষ্ণুতা নিয়েও অমরত্ব-স্পর্শী, অন্ধকার-তাড়ানিয়া জ্যোৎস্না ফোটাবার উষ্ণতায় তপ্ত। জীবনের সদর্থকতায় কবিতাটির উত্তাপ পাঠককেও উষ্ণ করে।

২.
'আমি/ হাসিতে চাইলেও আমার মুখ হাসিতেছে না– রৌদ্রকরোজ্জ্বল/ দিনের সাথে নিস্ফলা আমি আমার মধ্যে বসিয়া হাসিতে থাকি'– এই সকরুণ অভিজ্ঞতা, আত্মবিবরে সমাহিত মন নাগরিক জীবনের 'বিপন্ন বিস্ময়'কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩.
আত্মদ্বন্দ্বের রক্তাক্ত ভাষ্য নিয়ে কবিতাটি উপস্থিত। 'এই দুই হাত দিয়ে কী করেছি, কী যে করি নাই'– এমন বেহিসেবি অপচয়ের সামনে এসে আরেক সত্তা 'চিৎকার করে বলে– থামো'। নিরাভরণ এই কবিতার মূল শক্তি অনুভূতির প্রগাঢ়তা।

৪.
অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিপার্শ্বের ঘেরাটোপে বন্দি মনে নিরুদ্দিষ্ট হবার তৃষ্ণা। কিন্তু পথ রুদ্ধ– 'ঘাটে ভাঙা নৌকা', 'মনে ভাঙা নৌকার কঙ্কাল'। কবিতাটিতে প্রকাশিত পণ্য-সভ্যতায় শ্বাসরুদ্ধ মানুষের দ্বিমাত্রিক অসহায়ত্ব সমকালীন পাঠকেরও মর্মের বাণী হয়ে ওঠে।

৫.
'মানুষ বহু অভিজ্ঞতায় পুষ্ট করে তার জাগতিক উদর'– এই পঙ্‌ক্তির ভেতরই কবিতাটির মর্মশাঁস। জীবনের তৃষ্ণা ও ক্ষরণ, নির্মাণ ও দহনের সমবায়ে মানুষ শেষাবধি অগণন জীবনেরই সঞ্চয়।

৬.
কবিতাটি মহিলা হোস্টেলের একজন 'নিয়মিত বন্দি'র ছুটির আবেদন। 'পুনশ্চ' অংশে কবি সংযোজন করেছেন, বাড়ি ফিরে মানবিক বিভাগের ছাত্রীটি 'দুর্ঘটনাবশত পালকিতে' চড়ল ও তার 'অকালমৃত্যু' ঘটল। ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে, বিদ্রূপের আলোয় কবিতাটি সমাজের সর্বস্তরে নারীর বন্দিদশাকে তুলে এনেছে। প্রকাশভঙ্গিটি অভিনব।

৭.
আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির অচরিতার্থতার ভেতর দিয়েই নিঃসঙ্গতার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। মানব ও রাক্ষস সেই দ্বন্দ্বের রূপক, যেরকম মুখ ও মুখোশ। এই দ্বন্দ্বের ফাঁক গ'লে ঝরে পড়ে নিঃসঙ্গ মন, জল, কবিতা।

৮.
ইহলোকের হিসেবি আদলে গড়া পরলোকও। কিন্তু সব হিসেবের নিয়ন্তা যিনি, তিনি 'শূন্য, মহাখালি'। তাঁর করতালিও শূন্যতার দ্যোতক। কেবল ধর্মীয় অনুষঙ্গে নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রূপকেও কবিতাটি ব্যঞ্জনাবহ।

৯.
সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ধাবমান পথিকই রচনা করে পথ। জীবনের অন্বেষণ এই পথ-সৃষ্টিরই অন্বেষণ। তাই তীরবিদ্ধ পাখির ডানাই কবি তুলে নেন। অনুত্তোজিত ভাষায় প্রগাঢ় এক দায়বোধ তুলে দেন পাঠকেরও কাঁধে।

১০. [কবিতাটির আলোচনা থেকে আলোচক বিরত থেকেছেন। -সম্পাদক]

১১.
'বৃত্তের মধ্যে স্বপ্নের জাল' বুনতে-বুনতে যে-জীবন বৃত্তাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তার জন্য আকাশ অগম্য। মালা গাঁথতে-গাঁথতে নিমগ্ন সে-জন ভুলেই যায়, কার জন্য মালা গাঁথা! এভাবেই বৃত্ত-সূত্র ঢেকে ফেলে জীবনের গূঢ়ার্থ। তখন আর হিসেব মেলে না। সহজ ভাষ্যে জীবনের এই দার্শনিক উপলব্ধি কবিতাটিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে।

১২.
সমকালীন দৈশিক ও বৈশ্বিক পটভূমিতে রচিত এ দীর্ঘ কবিতাটি ক্ষোভ-ঘৃণা-বিপ্লবে অরক্তিম। নয়া-ঔপনিবেশিক খবরদারি, সামরিকতন্ত্র, দেশীয় উচ্চবিত্ত–মধ্যবিত্তের অনৈতিকতা, ভোগ-লিপ্সা, যৌনতা; পাশাপাশি শিল্পকলার বুর্জোয়া রাজনীতি– এরকম বহু প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ-আক্রান্ত ক্ষয়মাণ দেশ ও বিশ্বের চিত্র এঁকেছেন কবি। উচ্চকিত স্বরভঙ্গি ও বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহার কবিতাটির বিষয়ের সহগামী।

১৩. [কবিতাটির আলোচনা থেকে আলোচক বিরত থেকেছেন। -সম্পাদক]

১৪.
কবিতাটি জুড়ে নিঃস্বার্থ সমর্পণের নিবেদন। নরম কাদার মতোই নমনীয় এর ভাষাভঙ্গি, নমিত স্বর। সুন্দর।

১৫.
সমকালীন কাব্যধারার প্রতি বীতশ্রদ্ধ মনোভঙ্গিটি ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় বিবৃত হয়েছে। স্বরবৃত্তের চালে কোথাও-কোথাও হোঁচট খেতে হল।

১৬.
উৎসবের অন্তরালে আবহমান শোষণচক্রের উন্মোচন লক্ষ করি এ কবিতায়। হালখাতা উৎসব এখনও গ্রামে-গঞ্জে উদযাপিত হয়, শহরেও। কিন্তু এর ঝলমলে

আলোর নিচে এখনো জমা থাকে কৃষকের অন্ধকার মুখ, বিষণ্ন ভবিষ্যৎ। শেষ লাইনে এসে হালখাতাকে নতুনভাবে দেখবার পরিসর করে দিয়েছেন কবি।

১৭.
সভ্যতার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ শিল্পায়ন আর বনমর্মরের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কবিতাটির সহজ প্রশ্ন ও বিস্ময়: 'এ কোন দাহকাল!' কর্পোরেট সভ্যতার প্রতি উচ্চারিত অনাস্থা ও বিদ্রূপ কবিতাটিকে পরিবেশবাদী কবিতার পঙক্তিভুক্ত করেছে।

১৮.
পণ্য-সভ্যতা, ধর্ম, পুরুষতন্ত্র, সামাজিক বিধি সবই নারীর প্রতিপক্ষে। নারীর পরিচয় কেবলই 'রন্ধ্র, আনন্দ-গহ্বর'। সুদীর্ঘ কালের এই দৃষ্টিভঙ্গি, নির্যাতনকে প্রকট ভাষ্যে তুলে ধরে কবি আঘাত করতে চেয়েছেন ধর্ষকামী সামাজিক অস্ত্র ও ধর্মযন্ত্রকে, মূলত পুরুষতন্ত্রকেই।

১৯.
সমকালীন বাজার-সংস্কৃতির রূঢ় ভাষ্য কবিতাটিতে রূপ পেয়েছে। বাজারনীতির কাছে সবই পণ্য– মানুষ, প্রেম, দেহ। এরই ক্রমবৃদ্ধি বিস্তারিত করছে অসুখের ডানা।

২০.
অন্তর্গত নৈঃসঙ্গের নিরাময়হীন অসহায়ত্ব ফুটে আছে এ কবিতায়। পৃথিবী-প্লাবিত বৃষ্টিও পারে না সেই নিঃসঙ্গতা ভেজাতে। বিচ্ছিন্ন সত্তার তুমুল একাকিত্ব এই কবিতার মর্মসার। সুন্দর প্রকাশভঙ্গি।

২১.
এন্টি-রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'আমি' ও 'তুমি'র সাংঘর্ষিক অবস্থান তৈরি করা হয়েছে এ কবিতায়। রেল লাইনের পাতের মতই বিচ্ছিন্ন ও সমান্তরাল দুই সত্তা– কখনোই সম্পূরক নয়। শেষাংশের প্রশ্নটি না-থাকলেই বরং আরো ব্যঞ্জনাবাহী হত কবিতাটি।

মা জু ল হা সা ন

১.

উষ্ণতা

বড় বেশি ঘাস-ফুল-লতা-পাতা খাওয়া হলো। এতো বেশি প্রকৃতি আর সাজানো বাগানে সয়লাব বাংলা কবিতা; তারপরও 'অন্ধকার কামারশালায় জ্যোৎস্না বানানো'র ক্লান্তি নেই। এই একাকীত্ব আর নৈঃশব্দ্য তৈরির প্রচেষ্টা উষ্ণতা-য় দেখি। 'রাত বৌয়ের শরীরের মতো শুয়ে আছে শয্যায়'এই যে চিত্রকল্প, ব্যক্তিগত ডায়েরির ঢং, ভালই লাগে; কিন্তু ক্লান্তও করে। কবিতায় এতো এতো ল্যান্ডস্কেপ তার রং সেগুলোতে বহুল ব্যবহৃত, সহজ চেনা, এখানকার বাক্যগুলো যে চিত্রময়তার রং উদগীরণ করে তা খুবই চেনা, প্রেডিকটেবল। প্রশ্ন উঠতে পারে; যা চিনি বলে মনে হয়, তাকে কি নতুন করে চেনা যায় না, দেখা কি যায় না আরো দূরতর কোনো সুবর্ণরেখা? যায়, কবিতায় সেই অধরা দিক নির্দেশনা থাকতেই হয়। কারণ, শব্দ, রং আর উপলব্ধির বন্দর পেরিয়ে সেখানেই বিচরণ করেন কবিতাঁরা।

২.

আইটন্স অন ইয়ারা (পাহাড় লাগাচ্ছে মাস্‌কারা)

নাগরিক মানস। সমস্যা-সম্ভাবনারা নাগরিক। কবির ইনটেনশন আর শব্দ ব্যবহারে এক ধরনের ইভিল মোটিভ আছে বলে টের পাওয়া যায়। তাই পিস্তল না বের করেও গোলার শব্দ পাওয়া যায়। কিছু উপলব্ধি মন ছুঁয়ে যায়। বেশি নয় একটু কোড করি : 'হাতে খুব ভালো তাস পড়লে/ সবকিছু ভুলে হেসে ওঠা যায়' অথবা, ' উঠে দাঁড়াব পরে - আপাতত একটু মদ্যপান করি!' বা 'স্যুটের ক্রিজ না ভেঙে আরো/ স্টাইল - আরো আলো ঠিকরাক - তোমাদের বিয়ে ভেঙ্গেছে তো কী হয়েছে মেয়ে ?' এই যে স্খলিত বয়ান অন্যরকম মজা দেয়– এর বিপরীতে আবার দেখি, 'হাসিতে চাইলেও আমার মুখ হাসিতেছেনা - রৌদ্রকরোজ্জ্বল/ দিনের সাথে নিস্ফলা আমি আমার মধ্যে বসিয়া হাসিতে থাকি'। এই যে কামুক ঋষির মিটমিট্টা ভিলেনি হাসি, এটা মানুষের ভেতরকার দ্বন্দ্বের প্রতীক। এই কবিতায় জার্নি আছে, আছে শব্দ ব্যবহারের স্বাধীনতা।

৩.

ধুলোবালি, পাপ

সবাই বলেন, তারপরও এক নয় সবার বলা। কারো স্বর হাই পিক, কারো টোন ফোক। গল্প থাকে সবখানেই। থাকে প্রকাশের আকুলতা। তারপরও ঈশপের গল্প আর ব্যক্তিগত জার্নাল যে আধুনিক কবিতা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'ধুলোবালি, পাপ' পড়ে সেই কথাই মনে হলো। এই যে হাপিত্তেশ সেটা কি কাব্যিক দাবিকে নিবৃত করে? নব্বইয়ের নিরীক্ষা কিংবা নবতর শব্দ, আইডিয়া কোথায়? তবু কহিলেন কবি, শুনিলাম বটে, চশমার ফোকাশ ঝাপসা হলো না অথবা গেলো না ঠাস করে ফেটে বোধের পর্দা। অতএব নিরামিশ।

৪.

নিরুদ্দেশে যাব

ঘোমটা জরুরী ভীষণ, জরুরী খেমটাও। নুন-তেলের সহি মিশ্রন মেশিনও করে, কিন্তু তারপরও ভাল লাগে, দাগ কেটে থাকে মনে কারো জলবরিষণ। ভাল লাগে না নগর জীবন, পিছু টানে গাঁ, সামনে নিকষ কংক্রিট, তারপরও কোথাও নেই সাধের বরাক। এই তো ভাবার্থ নিরুদ্দেশের। ৩য় প্যারা ছাড়া এই কবিতায় কোনো ঘোমটা নেই, নেই আবিষ্কারের মজা। সেখানে একমাত্র সম্বল ইস্টিমারের জরায়ু, পরস্পর অচেনা আঙুলে তদ্রা বিনিময়। ভাব বিনিময় হয় বটে, বুঝি কষ্টে আছেন কবি, কিন্তু আমারে তাড়িত করে সেই ছিলা, সেই লহু-হলকা বাক্যবাণ ছুটে আসে না, আমি মরি প্রথাবদ্ধতায়, এইবার পানি নয়, মদ নয়, আমাকে দাও লক্করঝক্কর বাসের হর্ন।

৫.

বালজাকের চামড়া

পরতে পরতে দার্শনিকতার ছাপ। বালজাকের চামড়ার সাথে আয়ুর তুলনা। সবথেকে ভাল লেগেছে 'সকল তৃষ্ণা আদতে ক্ষরণের সহদোর' এই যে উপলব্ধি। মনে পড়ে গেল নব্বইয়ের আরেক কবির কবিতার লাইন 'এই শীত পৃথিবীর বোন'। দার্শনিক কবিতার সাফল্য এর সবর্জনীনতা, সর্বকালীন আবহ। আর সীমাবদ্ধতা, মর্মউদ্ধারে প্রাচীনপন্থি নীতিবাগিশ মানসিকতা, যেখানে সমসাময়িকতাকে রাখা হলেও আদতে উদ্দেশ্য দর্শন বয়ান, যা বহুলাংশে পুরাতন। দর্শনের ব্যাপারই এমন, খুব বেশি যাওয়ার সুযোগ কম ডান-বাম-আর মধ্য পন্থার মতো ব্যাপারটা। তবে এই কবিতায় দেখা যায় দর্শনের বাইরে শব্দের খেলা। আর খেলার প্রশ্ন এলেই বলতে হয়, দর্শক ভেদে তার প্রিয়তার বিষয়টিও ঘুরপাক খায়।

৬.

চিঠি

পোস্টমর্ডানরা কবিতাকে নানামুখী পরীক্ষা নীরিক্ষায় দেখেন। স্ট্রাকচারাল পয়েমের ধারণাও বেশ পুরনো। অই যে মদের বোতলের আদলে কবিতা, সৈয়দ হকের রাইফেল হাতে চলা যুবকের মতো গেরিলা কবিতা। এসবই নীরিক্ষা। সব নীরিক্ষা সফল হয় বলা যায় না। তবে নীরিক্ষা জারি থাকুক। কারণ, ক্লোনিং বা কলম-করা

ছাড়া জাত উত্তোরণ/রক্ষা বেশ দুরূহ। এই কবিতাটিকে মনে হয় আইডিয়া। সেই আইডিয়াকে নিদেনপক্ষে বাক্যবাণে, শব্দঝনৎকার সমবায়ে সফলভাবে এক্সিকিউট করা গেছে বলে আমার কাছে প্রতিভাত হয়নি। তবে আইডিয়া মাত্রই মাথার মুকুট। তাকে শিরোধার্য মানি।

৭.

নিঃসঙ্গের ছদ্মবেশে

স্টোরি টেলিং। এমনটাই মনে হল। তবে প্রতীকায়নের মাধ্যমে। গদ্য ছন্দ। এখানে লুকানো অক্ষরবৃত্তও অনেকক্ষেত্রে অনুপস্থিত। যাকে বলে বাতচিতের ঢং। ব্যক্তিগত (হত) কাহন, অভিজ্ঞতা অতপর মর্মপীড়া, কার্নিশে দেখা ভেজা শালিককে আত্মজ্ঞান করা। এই যে টানা গদ্য কবিতা, তা অনেক আগে শুরু হলেও, এর উজ্জ্বলতা মান্নান সৈয়দের জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ, সিকদারের বাতাসের সঙ্গে আলাপ ইত্যাদিতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি এই সিধা ফর্মের রীতিমতো যাচ্ছেতাই ব্যবহারও দেখেছি। তাই টানাগদ্যের ফাঁদ বলে নতুন একটা কথা আজকাল শোনা যায়। এই কবিতা সেই ফাঁদেই পড়ে নাই তো? কে জানে কবি হয়তো ফাঁদে পড়িতেই ভালবাসে!

৮.

মালের আড়ৎ

ঈশ্বর ভাবনা। ধনী-গরিব দ্বন্দ্ব। পাওয়া না-পাওয়ার হিসাব। এই বোধই কবিতার শরীর জুড়ে। তবে এখানে একটি বিষয় অনুচ্চ রয়ে গেছে, যা হয়তো কবিতার শেষ লাইনটির চাপে হুট কের অভিঘাতবৃত্তের বাইরে চলে যায়। তা হলো জন্ম-মৃত্যু সবই উৎসব, প্রক্রিয়া জারি থাকে, চরিত্র জারি থাকে আর্টিস্ট বদলে যায়। খুবই ওয়েল প-ান্ড কবিতা। কিন্তু এইখানে একটা শব্দও দেখান যেটা বহুল ব্যবহৃত না, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মহা ধোয়াশার ঐতিহাসিক ও বহুল ব্যবহৃত কনসেপ্টের আবহে যে শব্দটা নিজের ক্ষমতাগুণে নতুন মাত্রা ছড়ায়, পুরনো দার্শনিক মাত্রাকে নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়? এই ধরণের কবিতায় অবশ্য লিটারারি তেমনটা করার সুযোগ খুবই কম। স্ট্রাকচারালিই এটা খুব কষ্টসাধ্য। তাই এ ধরণের কবিতায় মেকিনিজমটাই মূখ্য। মালের আড়ৎ কবিতায় সেটা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আর নামকরণ সেখানে একটা কেরদানি বা পূর্ব বাংলার ভাষা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনজনিত কেলাসনেস আনার চেষ্টা আছে, যা শেষ পর্যন্ত কবিতার সৌম্যকান্তি ধূতিতে জিকজ্যাক দাড়ি রাখার মতো ব্যাপার।

৯.

পথ

রাজহংস, ডানা, গ্রীবা, শিকারি, তীর, রক্তে কালো ছাপ..... জীবনান্দনের সাথে এগুলো এমনভাবে জড়িত যে, আমাদের ভাবনা জীবনানন্দ আবহে হোঁচট খায়। কবির অভিঘাত প্রথম টের পাই 'পরীদের পাহারাদার আছে' এই লাইনে। সাথে সাথে মনে আসে জহর সেনের লাইন 'ঘুমেরও পাহারাদার থাকে' লাইনটি। তবু প্রতিটি কবি ও কবিতা আলাদা। বোধের ষাঁড়ের সম্মুখে রঙিন কাপড় মেলে ধরে পথ চলা কবিতাদেবীর।

১০.

পথ

ন্যারেটিভ কবিতা। পুরো কবিতাই 'কেমন আছো পথ, পালক সন্ধানে!' এই লাইনের ইলাস্ট্রেশন। এই পথ অন্বেষা, নাগরিকতার বোধ থেকে উৎসারিত। অনেকদিন থেকে মনে একটা প্রশ্ন, তা জীবনানন্দর ক্ষেত্রেও খাটে, এই যে নাগরিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, তা প্রকাশ করতে প্রকৃতির স্মরণাপন্ন হওয়ার কি কোনো বিকল্প নেই? এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড অথবা জীবনানন্দের সিন্ধুসারস কিংবা আবুল হাসানের পাতাকুড়োনির মেয়ে তুমি কী কুড়োচ্ছ? এসব কি এতোই অলঙ্ঘনীয়? এর উত্তর হয়তো লেখা আছে ধাতব চাকায়।

১১.

বৃত্তাবদ্ধ

লিনিয়ার বা একরৈখিক কবিতা। অঙ্কের সূত্র মুখস্ত থাকলে, সূত্রে ফেলে দিলে সমস্যা সমাধান। জীবনের সহজসূত্র নেই। তাই মেলে না হিসেব। আবিস্কারের কি খুব কিছু আছে এই প্রশ্নে? তারপরও ভীড় করে শব্দ, জ্যামিতি; আর সে তো কেবল বৃত্তের মধ্যে স্বপ্নের জাল বোনা। বুঝলাম, কিন্তু সোনারকাঠি-রূপোর কাঠি কৈ? কেরানীবাড়ির মেয়ে, এবার কবিতার ঘুম ভাঙাও ঘুম ভাঙাও।

১২.

নয়া এশিয়ার ডাক

সবই কহিলেন কবি। মনে লয় আশেকে বাংলাদেশ, না না আশেকে এশিয়া, না না প্রলেতারিয়েত প্রজাকূল শিরোমনি! মাঝে মাঝে ক্ষোভ, তারো বেশি অক্ষমের শৌর্য্য। সহজাত, প্রগল্‌ভতা, গলগল বেরিয়ে আসা ক্ষোভ, সোজাসাপটা; বুঝতে পেরেছি; ভাল নেই মোরা; দাসেরও দাস অধমস্য অধম, কে বাঁচাবে প্রাণ? তবু বেজায় স্লোগান। বুঝি, কবি এক করেছেন কবিতা আর শ্রেণি সংগ্রাম। এও এক

ধরণ বটে কবিতা লেখার, হয়তো কমিউনিকেটিভ, যেখানে বক্তব্য পরিস্কার, স্বচ্ছ্ব। রুদ্রর কথা মনে পড়ে। 'কালো প্রজাপতি, তোমার তর্জনীতে দ্বিধায় নড়াচড়া'-এর মতো অনেক উপমাসমবায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লাইনের তাত্ত্বিক কচকচানিতে ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। তবে স্বীকার করি, এই কবিতার বিচার আমার কম্ম নহে। শুধু বলি ক্ষোভকেও হাতিয়ার করতে হয়, যেমন শব্দ সমবায়কে উত্তীর্ণ হতে হয় কবিতা পঙক্তিতে।

১৩.

চুন-পর্ব

প্রতীকি কবিতা। চুনের সাথে জীবনের নুনের তুলনাচিত্র। সেই সাথে অনুচ্চ খুনোখুনির ইতিহাস। তবে এতো চুন যে কবিতার শরীর পুরো চুনকাম। ন্যারেটিভ ফরমেটে সাবজেক্টিভ কবিতা লেখার বিপদ ও সম্ভাবনা দুই-ই থাকে। এখানে কি ঘটেছে তার বিচার পাঠকের। আমার কাছে সুখপাঠ্য বা চমকদার লাগেনি। যদিও শুরুর লাইনটা বেশ ড্রামাটিক 'লাফিয়ে পড়েছে চুন অরণ্য শয্যায়'।

১৪.

আড়াল

নিবেদন কবিতার দিন শেষ, শেষ প্রেমের কবিতার দিনও; যতোই বলা হোক, প্রেম এক সর্বপ্লাবী নিদান বটে। প্রেমে পড়ে কেউ হতে চায় সাবান, নিঃশেষিত হতে চায় সুবাস ও ফেনায়। কেউ মাছের স্বাধীনতা ভুলে ভুলে প্রেমটানে হতে চায় নরম কাদা, প্রেমাস্পদ তার ঘরে লেপনে যদি ব্যবহার করে তাকে! লেপন; লোকজ একটা অনুসঙ্গ। নব্বইয়ে অনেকেই স্থানিকতা ও লোকজ অনুসঙ্গ, ফোকটোন আনার চেষ্টা করেছেন। এখনও সেই চেষ্টা আছে, থাকবে বহুদিন। অস্বীকার করার জো নেই, এখনো পল্লীগীতি বেশির ভাগ বাঙালির সুরের খোরাক। একটা প্রশ্ন করি, মুকুন্দ দাস আর রবীন্দ্রনাথ-এর মধ্যে কে বেশি বড়; উত্তর দেন তো আজকের দিনের কবি?

১৫.

কুকিলের বাসায় উকিল

এই ধরণটা আমি চিনি। কার লেখা আমিও বুঝতে পারতেছি। আপনেও পারতেছেন ছম্পাদক সাব। নব্বইয়ে ইহাও এক প্যারাডাইম বটে। পয়ার বা ব্রজবুলি বা দ্বিতাল-ত্রিতাল কিংবা ছড়ার ছন্দে ঠাকঠাক কইরা লেখার। মেলা দিন তো হইলো। এইখানে স্যাটায়ার আছে, শব্দের গিমিক আছে। এরও এক মজা আছে। কিন্তু মজাটা একইরকম। বেশ একঘেয়েমী লাগে। এর ডাইভার্সিটি কিভাবে আসতে পারে,

ছন্দের বন্দীত্ব না নিয়া, সিনট্যাক্স আর স্যাটায়ারনেসের নির্যাস নিয়া কিভাবে এর নয়া নয়া উইং খোলা যায় তা ভাবা যায়। তবে, এই কবিতা কেমন, তা বলার থেকে বলতে চাই, এইটা চেনা যায়, এইটা ওমুকের লেখা, এক্সওয়াইজেডের না। এটাই বা কম কীসে!

১৬.
হালখাতা

হালখাতা কবিতায়, কবিতার আঁটি শেষ প্যারাটি। প্রথম প্যারাটি আবহ নির্মাণ। লাস্ট প্যারাটি ম্যাসেজ। পুরো কবিতাটি যেন ফাঁদা হয়েছে এই লাইনটির জন্য– 'হালখাতা আজও হয় গ্রামে-গঞ্জে মহাজনের দোকানে দোকানে। কেবল কৃষককুল টিপসহিতে হালের দাম জলের দামে দিয়ে, বাড়ি ফিরে হাতের কালি ধোয় বিষণ্ন মুখে...'। কোনো দার্শনিকতা নেই, চিত্রময়তা নেই। বিবৃতি আছে; তাও শরৎচন্দ্রের আমলের। এখনো মাঠের অবস্থাও হয়তো সেটাই। কিন্তু কবিতা কি তেমন আছে?

১৭.
ইচ্ছে ডানার গেরুয়া বসন

কবির দায় আছে সমাজের প্রতি, সত্যকথনের। কর্পোরেট থাবায় যখন সবুজ বিরাণ হচ্ছে তখন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার দায় কবির আছে বৈকি! এখানে মনে ধরেছে কিছু ইউটার্ন মিনিং। কবি বলছেন, জল পড়ে পাতা মরে। কেন মরে? কিউরিয়ালিটি জাগে। তারপর আনফোল্ড হয় কবিতার মিনিং। কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (হতে পারে কোনো সত্য ঘটনা, হতে পারে সংখ্যালঘুর জমিজিরাত বেহাতের ঘটনা) হরিশ্চন্দ্র, রুহিদাস অন্যরকম বাঙময়তা ও অদেখা ইশারা কাহিনীর জন্ম দেয়।

১৮.
বীর্যব্যাংক

বারবণিতাকে বীরাঙ্গণা বা নগরসেবিকার দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস আধুনিকতার চেতনা বা স্কুলিং-এর তত্ত্বপ্রসূত। এমন ঢের কবিতা আছে। এখানে অনেকটাই ছন্দের মাত্রার টানটান শাসনে পুরনো বক্তব্যকেই নতুনভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন কবি। বলেন, তোর গর্ভকান্না শুনবে না কেউ, তুই ভ্রাম্যমাণ বীর্যব্যাংক'। আর পুরুত পাদ্রিসহ পুরুষশাসিত সমাজের কামবাসনাকে তুলনা করা হচ্ছে অগ্নিবাহী ট্যাংক হিসেবে। খুবই টাইপড চিন্তা, উপমায় নতুনত্ব বা ডেমকেয়ার ভাব আনার প্রবণাতা দেখা যায় কবিকণ্ঠে। তবে আমি আলোকপাত করতে চাই এই লাইনটির দিকে, 'নিশিকন্যা, দিনে প্রস্তর নিক্ষেপ রাত্রিতে আবীর' অ্যা ইউনিক লাইন।

১৯.

গোড়ান বাজার

এই কবিতায় পাওনা নাগরিক আটপৌড়ে জীবন, যেখানে নিম্নবর্গের মেয়ে তছলিমা যে একটি প্রক্রিয়া, বিয়িং সাইরাসের মতো, গায়েগায়ে ধাক্কায় যার একমুখিনতা কেটে যায়; হারায় রাস্তার গোলকধাঁধায়। এইখানে কবিতাকে প্রথাগত কাব্য ডিকশনকে, ন্যায়নিষ্ঠতার ফেরিওয়ালাকে ক্রিটিক করা হয়। তবু সেটা খুব উচ্চকিত নয়। পাখির ডানায়, বৃক্ষে, পত্রপল্লবে অসুখ রোপন করার যে উপমা তা পুরোদস্তর নাগরিক মানসিকতা প্রসূত। এইখানে ভিন্নজগত আছে, যদিও তা বাজারমন্ডিত চিরায়ত রূপ। কিন্তু সেইটা আঁকা হচ্ছে রূক্ষ নাগরিকতার ইনটেনশন থেকে, যেন চাকুয়ালা ব্যবসায়ী; কবি। তবে, এইযে কবিতার টোন, নব্বইয়ে যার গোষ্ঠিবদ্ধ চর্চা দেখি কতক কবির মাঝে, সেই ভাষাতে কি শুধুই স্যাটায়ার, গিমিক; তাতে কি কবিতার দাবি রাখা যায় না এতটুকু? নগরে কি খালি পাজেরোর চাকায় কবিতাকণা গতিপ্রাপ্ত হয়?

২০.

বৃষ্টি

এই কবিতায় উপমার ফুলঝুড়ি, আছে রঙের খেলা। সেপাইয়ের হেলমেট, প্রেমিকার রূমাল, 'ভেজা পথ পায়ে আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গোধূলিপীড়িত একটি মানুষ' অদৃশ্য হওয়ার বর্ণনা; সর্বোপরি, কবিতার আত্মোপলব্ধি 'কোথাও বৃষ্টি হলে সারা পৃথিবীর সব ভিজে যায়' একটি চিরচেনা রিয়েলিটিকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়। যেখানে বিরহ, প্রত্যাক্ষাণ অথবা আত্মগোপনসহ নানা অনুসঙ্গ একটি শাব্দিক বর্ণালী তৈরি করে।

২১.

'আমি' না 'তুমি'

কবিতায় তুলনা পরিস্কার। দুই কূলে দুইজন, সবসময় রক্ষা হয় না যা। একটা ভাঙে, গড়ে আরেকটা। কিন্তু এখানে একটা চাপা নৃশংসতা আছে, আমি-তুমি যদি যুগলবন্দী হই, তবে একজন কি করে 'ফুলের প্রলোভন' হন? কিভাবেই বা হন 'ফলের ম্লান মহিমা'? বলা হচ্ছে; আমি-তুমি; কিন্তু এই কবিতা একজন আরেকজনকে খারিজ করার এমন এক স্বয়ংক্রিয় প্রয়াসের অস্তিত্ব ঘোষণা করে যা আধুনিক মানুষের একাকীত্ব ও আত্মকেন্দ্রীকতার প্রতিচ্ছবি। আমার মনে হয় এইখানে কবির ইনটেনশন শব্দরা ছাপিয়ে গেছে। এখানে মনে পড়ে পোস্টমর্ডান ডিসকোর্সের ইমেজ ও সাবজেক্টের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের কথা। যেখানে 'কে বড় বস্তু না ছায়া'– এই তর্ক মূখ্য হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের দর্শন: মঈন চৌধুরীর ভাবনায়

শওকত হোসেন

মঈন চৌধুরীর প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য নৈর্ব্যক্তিকতা; বিশেষ মতাদর্শের প্রতি একতরফা ঝোঁক নয়; বরং কোনো বিষয়কেই বিনা প্রশ্নে ছেড়ে না-দেয়া। ফুকো, দেরিদা, হাইডেগার, লাঁকা, পপার, সস্যুর, হিবটগেনেস্টাইনসহ বিংশ শতাব্দীর এমন সব দার্শনিকের দর্শন নিয়ে মঈন চৌধুরী আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, যাঁদের দর্শন সম্পর্কে বাংলাদেশ এবং ভারতে তাঁর আগে কেউ বাংলাভাষায় উল্লেখযোগ্যরূপে আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। এখনও পর্যন্ত উল্লিখিত দার্শনিকদের দর্শন নিয়ে বাংলাভাষায় বিশেষ বড় কোনো কাজ হয়েছে বলা যাবে না।

বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর পূর্বের যে-সকল দার্শনিক খুব বেশি আলোচিত; আমাদের লেখকগণ ওই সব প্রচল দার্শনিকদের দর্শন নিয়েই সাধারণত গৎবাঁধা কথা লেখেন বা বলেন; মঈন চৌধুরী সেখানে ব্যতিক্রমী। যেখানে দর্শনের অধ্যাপকগণ পা ফেলতে ভয় পান, মঈন দর্শনের একাডেমিক ছাত্র বা শিক্ষক না-হয়েও সে-সব জায়গায় পা-ই ফেলেননি, রীতিমতো লাঙল দিয়ে চষে ফসল ফলাবার চেষ্টা করেছেন।

বাংলাদেশেই নয় বরং দুই বাংলাতেই কারও সঙ্গে তুলনা করে যে বলব, মঈন চৌধুরী কতটা ভুল করেছেন বা কতটা শুদ্ধ করেছেন, সে-কথাও বলবার সুযোগ নেই। কারণ বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদের দর্শনের ওপর বিশেষ কোনো কাজই হয়নি; পশ্চিমবাংলায় যৎসামান্য কাজ হলেও সেগুলো আমি পড়ে দেখেছি তাদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে তেমন কোনো অর্থ উদ্ধার করা যায় না; এতে বোঝা যায় যে, তারা নিজেরাই ফুকো, দেরিদার মতো দার্শনিকদের দর্শন এবং তাঁদের ভাষারও তেমন কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। যদি নিজেরা বুঝে থাকতেন তবে বুঝিয়ে লিখবার ভাষাও এঁদের থাকত। এক্ষেত্রে মঈন চৌধুরীর ভাষা অনেকটাই বোধগম্য।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল-এর ওপর অন্য দশজন লেখকের মতো উল্লিখিত দার্শনিকের দর্শনের ওপর দু-চার ডজন বই মিলিয়ে একখানা বই লিখে মঈন হাজির করতে পারতেন; তিনি এই ধরনের অতি পরিচিত দার্শনিকের চর্চিত জমিনে সহজ কোনো চাষ দিতে যাননি। বরং হাইডেগার, লাঁকা, পপার, সস্যুর, হিবটগেনস্টাইনসহ বাংলা ভাষায় অচর্চিত দার্শনিকদের দর্শনের ওপর তিনি সম্পূর্ণ নিজের আঙ্গিকে আলোচনার চেষ্টা করেছেন।

অন্যদিকে ভারতীয় দর্শনের লিখিত যে-রূপ আমরা পাই তার প্রায় সবই থিয়োলজি (তত্ত্ব); ফিলোসফি (দর্শন) নয়। ধর্ম প্রশ্ন করতে বারণ ক'রে বিশ্বাস করতে বাধ্য করায়; ফলে ধর্মকে অবলম্বন করে কোনো দর্শন ডানা মেলতে পারে না। ভারতের দর্শন অতঃপর বাঙ্গালার দর্শন-যে নেই, সেটা হতে পারে না কিন্তু এখানকার সামষ্টিক মানুষের সেই দর্শনের লিখিতরূপ নেই; যা আছে সেটা ধর্মবিশ্বাস, আবেগ, অনুমাননির্ভর। পক্ষান্তরে তা আঙ্কিক মান বিবর্জিত। এককথায় বলা যায় ভারতের অতঃপর বাঙ্গালার মানুষকে অঙ্ক কষে আজ অবধি বিশ্লেষণ করা হয়নি। তাই যে জিজ্ঞাসা ধর্মের বারণের মুখে পড়ে মিইয়ে যায়, যে প্রশ্ন অঙ্কের ওপর দাঁড়ায় স্বাতাকে দর্শন-রূপ বলা যায় না। কাজেই ভারতে মানুষ আছে, মানুষের দর্শন আছে; কিন্তু সেই দর্শন-এর লিখিত রূপভিত্তি নেই। বিষয়টি বর্তমানের এবং আগামীর জন্য ভারতীয় দর্শন-চর্চার ক্ষেত্রে একটি বড় ঘাটতি, যা পূরণ হওয়া জরুরি।

অখণ্ড ভারতের অন্যতম চিন্তাবিদ গোখলের ভাষ্য, Bengal is the brain of India. What Bengal thinks today, the whole of India thinks tomorrow. কিন্তু বাস্তবতা হল, বেনিয়া ইংরেজের এই ইতিহাস-রচনায় সৎ-উচ্চারণ প্রতিফলিত হয়েছে এ-কথা বাঙালি বিশ্বাস করেনি– 'বেনিয়া ইংরেজের লেখা ইতিহাসে বাঙালির যে চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা সঠিক নয়, ঈর্ষা-উদ্দীপিত প্রতারণার অপছায়া। স্বর্ণ-প্রসবিনী বাংলা বারবার বিদেশি লুটেরাদের অপ্রমেয় লোভের শিকার না-হলে বাঙালি আধুনিক বিশ্বে নেতৃত্বের আসনে আসীন থাকত।' [রাশীদুল আলম/ বাংলা সাহিত্যে দর্শনচিন্তা– বঙ্কিম থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী/ বিষয় প্রবন্ধ ।]

প্রশ্ন হল, মঈন চৌধুরীও কেন ভারতীয় দর্শন নিয়ে সেভাবে মাথা ঘামাতে গেলেন না? এই একই প্রশ্ন অতীতের বহু মেধাবী গবেষক, লেখকের বেলাতেও। যদিও এর কারণ ব্যাখ্যা করা আজ আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং মঈন চৌধুরী যে-যে দিকে তাঁর প্রশ্নবান ছুঁড়ে দিয়ে দর্শন চর্চায় ব্রতী হয়েছেন, সে-সেদিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে বোধ করি।

মঈন চৌধুরী প্রধানত কবি এবং প্রাবন্ধিক; আমার ধারণা কবি এবং একইসঙ্গে আরও অনেক কিছু হওয়া সম্ভব কিন্তু একইসঙ্গে কবি ও দার্শনিক হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভবত কার্ল মার্কস সে-কারণেই তাঁর জীবনের প্রথম দিককার তিনটি

কবিতার বই পুড়িয়ে তবেই দর্শন-চর্চায় নেমেছিলেন। কবিতার মধ্যে দর্শন থাকে; তার মানে এই নয় দর্শন থাকার অর্থ পুরো কবিতা দর্শন হয়ে গেল কিংবা কবি দার্শনিক হয়ে গেলেন। কবিতা যেখানে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে এক বিশেষ ভালোলাগার ঘোর বা মূর্ত-বিমূর্তের দোলাচলে আবছা-আবহ সৃষ্টি করে, দর্শন সেখানে সত্য উপলব্ধিতে বস্তুনিষ্ঠার ওপর ভর করে আঙ্কিক জ্ঞান দেয়; কবিতায় ভাবাবেগের আধিক্য প্রবল, দর্শনে ভাবাবেগের কোনো জায়গা নেই। এতসবের পরেও মঈন চৌধুরীর কবিতায় যেমন দর্শন রয়েছে, একইভাবে তাঁর প্রবন্ধের পরতে পরতে দর্শন-চিন্তা এবং দার্শনিক নানা উপাদান লুকিয়ে রয়েছে। সে-কারণে তাঁকে অন্তত দার্শনিক বলা যায় না, তবে দর্শনের ধারক, বাহক, সমালোচক, আলোচক নিশ্চয়ই বলা যায়। একই অর্থে বলা যায়, বাংলাদেশে এমনকি ভারতবর্ষে আজ অবধি কোনো দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেনি।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা ভারতীয় দর্শন তথা দর্শনবিদ্যা নিয়ে মঈন বেশি মাথা ঘামাননি এ-জন্য যে, তিনিও বুঝে উঠতে পেরেছিলেন যে, ভারতীয় দর্শনবিদ্যা ধর্মের নখর দিয়ে মোড়ানো; সে-অর্থে প্রশ্ন করা মানে ধর্মের গায়ে কালি ছুঁড়ে দেয়া; আর ধর্ম তো কালি সহ্য করে না সেটা ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়; সুতরাং মঈন চৌধুরী ভারতীয় দর্শনবিদ্যা ব্যপকভাবে পাঠ ক'রে সেই বিদ্যা নিজের ভেতরেই মজিয়েছেন, ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আক্রান্ত করা অতঃপর নিজে আক্রান্ত হওয়ার মতো ঝুঁকি তিনি গ্রহণ করেননি। তারপরও ধর্ম-রাষ্ট্র-সমাজ-এর বিষদাঁত তুলে ফেলবার মতো আক্রমণাত্মক না-হলেও, তিনি এ-বইয়ের বহু জায়গায়ই প্রচল-ধারণাকে আঘাত করেছেন বেশ ঠাণ্ডা মাথায়।

দুই.

মঈন চৌধুরীর 'সৃষ্টির সিঁড়ি' বইটি বাংলাভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এটি তাঁর প্রথম দিকের বই হওয়ায় এখানে ভাষা নিয়ে নিরীক্ষার প্রবণতা লক্ষণীয়। এ বইয়ে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকের দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; বলা যায় রচনাগুলো ভাষা-দর্শন, জীবন-দর্শন এবং নন্দনতত্ত্বের আলো দিয়ে সৃষ্ট। স্বাধীন বিশ্বের যৌক্তিক এবং গাণিতিক বিশ্লেষণ হাজির করা এই বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। বইটির কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর যেমন চোখে পড়বার মতো; আবার সে-সব চিন্তার সমর্থনে বহু ধরনের উদ্ধৃতি ও প্রমাণও হাজির করা হয়েছে প্রতিটি রচনা ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজনে। 'সৃষ্টির সিঁড়ি' বইয়ের ভূমিকাতে লেখকের ভাষ্য 'ভাষা, দর্শন কিংবা সাহিত্যের পাঠ যেহেতু অনেক সময় Misreading-এর পর্যায়ে যেতে পারে, (স্মরণ করছি ভাষা-দার্শনিক পল দ্যা মান-এর কথা– Reading is always necessarily misreading) সেহেতু রচিত প্রবন্ধগুলোতে আমার নিজস্ব অহং-এর উপস্থিতি হয়তো-বা প্রচণ্ডভাবে আছে।' পৃ. ৯

লেখক এ-বইয়ে মোট তেরোটি রচনা ও একটি তথ্যপঞ্জী সন্নিবেশ করেছেন। এসব রচনার অধকাংশই যুক্তিগ্রাহ্য; দু-একটি প্রবন্ধ আছে নিজস্ব ভাব-নির্ভর। এতগুলো বিষয়-নির্ভর রচনার মধ্যে লেখক একটি বিশেষ দিকের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় 'এই বইতে গ্রন্থিত বেশ কিছু প্রবন্ধে আমি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিক তত্ত্বের কিছু শব্দ-ধারণাকে উপস্থাপন করেছি (যেমন, কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদ, কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব, আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ ইত্যাদি) বর্তমানের দেশ-কালে গ্রাহ্য বিজ্ঞান-দর্শন ও গাণিতিক চিন্তা-চেতনা-কাঠামোকে কেন্দ্র করে। আমার এ উপস্থাপনায় অবশ্যই সময়গ্রাহ্য কিছু গাণিতিক যুক্তি আছে, এবং আমি এ কথাও বিশ্বাস করি যে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিক তত্ত্বের স্থুল গণিত-সূত্রকে ঠিক এখনই জীবন, সাহিত্য ও শিল্প-বিশ্লেষণে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ না-করা গেলেও, আগামীর পৃথিবীতে সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিক তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।' পৃ.৯

বইয়ের প্রথম রচনা 'সংজ্ঞান সংবেদ'-এর প্রথম স্তবকে লেখক পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন মানুষের মস্তিষ্কে কীভাবে কাজ করে এই জীবন-জগৎ, পরিবেশ-প্রতিবেশ। সেখানে বিশ্লেষিত হয়েছে একজন যুক্তিগ্রাহ্য 'আমি'ও কীভাবে ব্যবহার করে যুক্তিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষা 'মানবমস্তিষ্কের নিউরোন কোষে আবদ্ধ হয়ে আছে জগৎ ও পরিবেশ সম্পর্কীয় সব ধরনের ইন্দ্রিয়-কণা-তরঙ্গ চিত্ররূপ এক কোয়ান্টাম-যান্ত্রিক প্রতীকী শৃঙ্খলার বিন্যাসে। জগৎ ও পরিবেশের প্রতীকী চিত্ররূপকে প্রকাশ করতে একজন 'আমি' ব্যবহার করছে যুক্তির ভাষা, যা আবার নিজেই ইন্দ্রিয়-তরঙ্গ-নির্ভর অন্য একটি প্রতীকী শৃঙ্খলার অন্তর্গত বিষয়। প্রতীক দিয়ে প্রতীক কিংবা আন্তঃপ্রতীকী সম্পর্ককে উপস্থাপন করতে গিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে 'বোঝা আর না-বোঝা'র অহংকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বকে কেন্দ্র করে।' পৃ. ১১

ষাটের দশকের প্রথম দিকে কাঠামোবাদী (structuralist) সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব হলেও ১৯৮০ সাল নাগাদ এ-তত্ত্বটি নতুন সাহিত্যদর্শন হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করবার কারণে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই তত্ত্ব সমাজবাদী রাজনীতি ও সমাজনীতির বিপরীতে অবস্থান করা এক তত্ত্ব; কিন্তু সমাজবাদীরাও কি অস্বীকার করতে পারবেন, সমাজের পুরোটাই-যে সাহিত্যে উঠে আসে না আবার সাহিত্যের পুরোটাই সমাজের বাস্তবতা নয়! ; কাজেই কাঠামোবাদকে সমাজবাদের বিপরীত অবস্থানে না ফেলে বরং মানুষের চিন্তার আরেকটি শাখা হিসেবে এই ধারাকে বিবেচনা করাই শ্রেয়; যার অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে সাহিত্যিক গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ ঘটতে পারে।

কাঠামোবাদী (structuralist) সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখকের ব্যাখ্যান 'কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের বিশেষ পরিচিতির কারণ, এ তত্ত্বে, প্রচলিত অন্যান্য সাহিত্যদর্শনের মূল উপাদান ও বিশ্বাসসমূহকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী সাহিত্যকর্ম হল একজন সৃষ্টিশীল মানুষ বা লেখকের জীবন ও জগৎ-বীক্ষণের প্রতিফলিত রূপ, সেখানে লেখকের উপস্থিতি থাকে অনিবার্যভাবে আর সাহিত্যকর্মের মাঝ থেকে জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রকৃত সত্যকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কাঠামোবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা প্রচলিত এ বিশ্বাসের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে বলেন, সাহিত্যকর্মে লেখকের উপস্থিতি থাকে না, লেখক তাঁর সৃষ্টির পরই মৃত, এবং সাহিত্য সবসময়ই সত্যের সাথে সম্পর্কহীন।' পৃ.১২

যে-কোন মতাদর্শকে পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যাখ্যা না-করা হলে সেখানে ভুল বুঝবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। মান্যবর মঈন চৌধুরী কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের যে-উপাদানসমূহ এ বইয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন তা কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। এসব কথার সঙ্গে লেখকের সহমতেরও প্রমাণ মেলে আলোচ্য রচনার শেষভাগে।

হাইডেগার-এর 'সত্তাবিজ্ঞান, ভাষাদর্শন ও নন্দনতত্ত্ব' প্রবন্ধটি এ বইয়ের তৃতীয় রচনা। প্লাতো, আরিস্ততল, দেকার্ত, লাইবনিৎস, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকের মতো হাইডেগারও ছিলেন মৌলিক দর্শনের প্রবক্তা, এ রকম মন্তব্য অনেক স্বনামধন্য দার্শনিকের। যদিও জার্মান জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত হয়েই হাইডেগার হিটলারের পক্ষ নিয়েছিলেন। হাইডেগার ছিলেন ফরাসি ও জার্মান ঐতিহ্যবাহী দর্শন জগতের একদিকে অত্যন্ত আলোচিত, অন্যদিকে ভীষণভাবে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। মঈন চৌধুরীর ভাষায়– 'মার্টিন হাইডেগার তাঁর দর্শন অন্যান্য দার্শনিকের মতো সাদামাটা প্রচলিত ভাষায় প্রকাশ করেননি। আমরা হাইডেগার-এর মাঝে খুঁজে পাই একজন কবিপুরুষকে, যিনি প্রচলিত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় এমন সব বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন নতুন ভাষাবিন্যাসে কিংবা বলা যায় ব্যবহার করেছেন কবিতার ভাষা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক; সত্তা বিষয়ে হাইডেগার বলেন– Doch das Sein—was ist das Sein? Es ist es selbst. Dies zu erfahern und zu sagen, muss das kunftige Denken lernen. Das 'Sein'—das its nicht Gott und nicht ein Weltgrund. Das Sein ist weiter denn alles Seiende und ist gleichwohl dem menschen naher als jedes Seiende, sie dies ein Fels, ein Tier, ein kunstwerk, eine Maschine, sei es ein Engel order Gott. Das Sein ist das Nachste. Doch die Nahe bleibt dem Menshen am weitestem. পৃ.২৫

'সৃষ্টির সিঁড়ি' বইয়ের চতুর্থ প্রবন্ধ 'দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন: তাত্ত্বিক বিচার'। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার জন হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক সেমিনারে জ্যাক দেরিদা Structure, Sing and play in the Discourse of Human Seience শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা সে-সময়ের ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। দেরিদার এ-দর্শন তখন আমেরিকায় একটি নতুন সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে Deconstruction বা বিনির্মাণ দর্শন নামে পরিচিতি লাভ করে। এই প্রবন্ধে মঈন চৌধুরী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, দেরিদার Deconstruction বা বিনির্মাণ দর্শন উত্তর-কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে; উল্লেখ্য উত্তর-কাঠামোবাদ কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে না।

জ্যাক দেরিদা-র দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে সস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন প্রাসঙ্গিকভাবেই আমলে চলে আসে; কেননা দেরিদা, সস্যুরের ভাষাতত্ত্বকেন্দ্রিক দর্শনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুধু গ্রহণ করেন না বরং এই দর্শনের বিস্তারও ঘটান। আলোচ্য প্রবন্ধে জনাব মঈন লিখেছেন– 'সস্যুরের মতে ভাষা কোনো বস্তু বা বিষয়ের অর্থ (meaning) তৈরি করে না, বরং বিষয় বা বস্তুর অর্থকে উদ্‌ঘাটন করাই হল ভাষার মূল কাজ। এ তত্ত্বটিকে গ্রহণ করে বলা যায়, ভাষা ব্যবহারের পূর্বেই অবস্থান নির্দিষ্ট করে বস্তু বা বিষয়ের অর্থ বা meaning। সস্যুরের ভাষাতত্ত্বে এ-ও বলা হয় যে, মানুষের ব্যবহৃত ভাষাচিহ্ন বা শব্দ, ভাষাব্যবস্থার আওতাধীন অন্যান্য-ভাষাচিহ্নের সাথে তুল্য হবার পরই অর্থবোধক হয়। অর্থাৎ আমরা যখন উচ্চারণ করি 'মানুষ', তখন তার অর্থ প্রকাশ করার জন্য, 'যেহেতু, মানুষ গাছ নয়, বাঘ নয়, পাহাড় নয়, নদী নয় সেহেতু মানুষ অর্থ মানুষ'– এমন একটা তুলনামূলক গ্রহণ-বর্জন নীতি ক্রিয়াশীল থাকে।' পৃ.৩৬ - ৩৭

পঞ্চম প্রবন্ধের নাম, 'আমেরিকান ডিকন্সট্রাকশন'। আমার ধারণা, এই প্রবন্ধকে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন না-করলেও চলত; কেননা এ প্রবন্ধেও মূলত সাহিত্যতত্ত্বের Deconstruction বা বিনির্মাণের পক্ষেই কথা বলা হয়েছে। সেটা মঈন চৌধুরী মিলারের ভাষায় তুলে ধরেছেন এভাবে– Language is not an instrument or tool in man's hand, a submissive means of thinking. Language rather thinks man and his 'World', including poems. পৃষ্ঠা: ৪৪ মঈন চৌধুরীর রচনা নিয়ে কারও কারও অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের দর্শন নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন—সেই তুলনায় ভারতীয় দর্শন নিয়ে তিনি আলোচনার আগ্রহ কমই দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর 'সস্যুর, দেরিদা ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন' প্রবন্ধটি পাঠ করলে সে-অভিযোগ খুব একটা টেকে না। এ-প্রবন্ধের শুরুতেই মঈনের বক্তব্য এমন, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা সত্য-জ্ঞানের যুক্তি বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈতন্যের যথার্থ রূপ ও স্বরূপ নির্ণয়

করা এবং সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য-জ্ঞান লাভ করে সত্য বিশ্বাসকে উপস্থাপন করাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব চর্চার মূল বিষয় ।

ভূমিকার প্রথম দিকে আমি 'তত্ত্ব' ও 'দর্শন'-এর পার্থক্য নিয়ে লিখেছি; এখানে লক্ষণীয় যে, 'ভারতীয় দর্শন' নাম দিয়ে আলোচনা শুরু করে জনাব মঈনকেও 'দর্শন'-এর স্থলে 'ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব' কথাটি ব্যবহার করতে দেখা গেল । তবে ভারতীয় সেই তত্ত্বের ভাষাকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা যে-ধরনের উদ্ধৃতি ও প্রমাণ সাপেক্ষে মঈন এখানে হাজির করেছেন সেটা নিঃসন্দেহে দরকারী এবং প্রশংসনীয় । মঈন চৌধুরীর ভাষায়– 'চার্বাকপন্থী দার্শনিকসহ বৌদ্ধ, বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকেরা মনে করেন শব্দ ও ভাষা কম বেশি প্রথাগত এবং অপৌরুষেয় । জৈন-দর্শন মতে শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো বস্তুকে বোঝায় না, শব্দ সর্বজনীনতা ধারণ করে, যেমন– 'গো' শব্দের বাচ্যর্থ 'গরুশ্রেণী' । সাংখ্যদর্শন জৈন মতবাদের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে শব্দের নির্দিষ্টতাকে মুখ্য করে তোলে । ..... এ প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্ট বলেন– শব্দের জাতিবাচক ধারণা নিত্য এবং এ কারণে নির্দিষ্ট কিছুকে শব্দ দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয় । বেদান্ত দর্শনে বলা হয় যে শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্যের অর্থ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তি ও তাৎপর্যজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল ।' পৃ. ৪৫ – ৪৬

দেরিদা ও সস্যুর যে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিতই হয়েছেন তা-ই নয় বরং মঈন চৌধুরী এ-প্রবন্ধের সর্বশেষ স্তবকে সরাসরি বলেছেন, পঞ্চম শতাব্দীর দিঙনাগ ও সপ্তম শতাব্দীতে জিনেন্দ্রবুদ্ধি যে ভাষাদর্শন উপস্থিত করেছিলেন, প্রায় একই রকম দর্শন দেরিদা ও সস্যুর বিংশ শতাব্দীতে উপস্থিত করলেন । মঈন এ-ও বলেন, দেরিদা ও সস্যুর প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বা জ্ঞানতত্ত্ব থেকে তাদের দার্শনিক ধারণা নিয়েছিলেন, একথা চিন্তা করা অবাস্তব নয় ।

সপ্তম প্রবন্ধ 'সাহিত্য সমালোচনায় দেরিদার ডিকন্সট্রাকশনের প্রয়োগ'-এ লেখক নানাভাবে দেখিয়েছেন কোন কোন সাহিত্যে কী-কীভাবে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে । লেখক আরও লিখেছেন যে, কাঠামোবাদী ধারণার মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এ ভালো ও মন্দের বৈপরীত্য নিয়ে রচিত । এই প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন, বাংলা ভাষায় লেখা বিভিন্ন কাব্য ও গদ্য সাহিত্যকর্মের বিনির্মিত রূপ ও স্বরূপকে এ-প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা সম্ভব । এ ছাড়া বিভিন্ন দিক থেকে এই তত্ত্ব বা দর্শনের প্রয়োগ দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে ।

অষ্টম প্রবন্ধ 'মিশেল ফুকো : জ্ঞান ও চিন্তার প্রত্নতত্ত্ব'-তে অতি সংক্ষেপে ফুকোর দর্শনের কিছু চাবিকথা ক্রমাগত বলে গেছেন লেখক । কিন্তু খুব সহজেই অনুমেয় যে এই সংক্ষিপ্ত রচনার মাধ্যমে ফুকোর পূর্ণাঙ্গ দর্শনকে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়; এ-কথা লেখক নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন । লেখকের ভাষ্য, মিশেল ফুকো তাঁর দর্শনে কিছু মৌলিক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন কিন্তু সে-সব সমস্যার সমাধান তিনি দেননি । তা সত্ত্বেও মঈন চৌধুরী মনে করেন, ফুকোর চিন্তা-চেতনাকে বারবার

আলোচনায় আনতেই হবে। ফুকোর দর্শন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানার জন্য মিশেল ফুকোর কয়েকটি বই পাঠেরও পরামর্শ দেন জনাব মঈন– Madness and Civilization; The Order of Things; An Archeology of Human Science; Archeology of Knowledge, Discipline and Punish; The Birth of Prison; History of Sexuality.

"কার্ল পপারের 'বিশ্ব-৩' ও ভাষাদর্শন" নামের নবম প্রবন্ধে মানুষের জ্ঞানতত্ত্বের ওপর দার্শনিক কার্ল পপারের দর্শন বিশ্লেষিত হয়েছে। মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা যত ধরনের জ্ঞান আহরণ করতে থাকে, সেই জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নানা সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত প্রামাণিক তথ্য দিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক ও বিজ্ঞানী কার্ল পপার। এক্ষেত্রে তাঁর 'বিশ্ব-৩' প্রকল্পকে উপস্থাপন করা খুবই প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। মঈন চৌধুরীর ভাষায়– 'দার্শনিক কার্ল পপার বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জ্ঞানতত্ত্বসম্পর্কীয় তাঁর নতুন দর্শন উপস্থিত করেন। জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল মানবিক চেতনাকাঠামো, ভাষাব্যবস্থা আর ভৌত জ্ঞানতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পপার মানবিক জ্ঞানকে তিনটি মৌলিক স্তরে বিভক্ত করতে চান, যা একজন মানুষের জীবন ও বিশ্ব-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে। কার্ল পপারের দর্শনের উল্লিখিত মানবিক জ্ঞানের স্তরগুলো নিম্নরূপ:

বিশ্ব-১: বিশ্বজগৎ, জীবন ও প্রকৃতির ভৌতরূপ।

বিশ্ব-২: বিশ্ব, জীবন ও প্রকৃতির ভৌত বাস্তবতাকে গ্রাহ্য করে মানবিক চেতনায় উপস্থিত জ্ঞানের মৌলিক স্তরসমূহ।

বিশ্ব-৩: বিশ্বজগৎ, জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন যৌক্তিক ও গাণিতিক সত্য, তত্ত্ব, সূত্র, সমস্যা, সমস্যাসমূহের স্তর বিন্যাস, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি যা ভাষা-মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন পুস্তক, সাময়িকী ও পাঠাগারসমূহে অবস্থান করছে।" পৃ. ৬৩

দশম প্রবন্ধ 'ফ্রয়েড, লাকাঁ ও সমাকালীন বিজ্ঞানদর্শন'। ফ্রয়েড ও লাকাঁ'র দর্শন বিংশ শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচিত হয়েছে। এর কারণ মানুষের মন নিয়ে এত সূক্ষ্ম ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা এঁদের আগে কোনো দার্শনিক করেননি। এঁদের পূর্বকার দার্শনিকগণ মনকে ধ্রুব ও স্থিতিশীল বিষয় হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েড মানুষের মনের নানা স্তর ও উপাদানের ব্যাখ্যা দিয়ে তার অবদমন, কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি, তাড়না, বিরোধ ও স্ববিরোধসহ মনের আরও বিভিন্ন দিক

নিয়ে ব্যাখ্যা হাজির করেন— এতে দর্শনচর্চার ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। মঈন চৌধুরী তাঁর এ-প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে উপস্থাপিত হয়েছিল আলফ্রেড এ্যাডলার, কার্ল য়ুঙ ও জ্যাক লাকাঁর মতবাদ এবং এঁদের মনকে আলোড়িত করেছিল বিশেষভাবে।' মানুষের 'মন' নিয়ে ফ্রয়েডীয় সকল বিশ্লেষণ কাম-চেতনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে— এমন অভিযোগ ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে থাকলেও অভিযোগটি সর্বাংশে সঠিক নয়। তবে ফ্রয়েড তাঁর দর্শনে কাম-চেতনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে মানুষের মনস্তত্ত্ব তথা বিজ্ঞান মনের স্বরূপ ব্যাখ্যা যৌন-অবদমনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে তার 'মন' বিষয়টি গভীরভাবে যুক্ত হয়ে আছে। সে-কারণে লাকাঁকে মানুষের অস্তিত্বের সংকট নির্ধারণের জন্য বারবার ফ্রয়েডীয় দর্শনের কাছে যেতে হয়েছে। ফ্রয়েড কখনো কখনো যুক্তিহীন বা কমযুক্তির বক্তব্যও পেশ করেছেন; লাকাঁ সেই সব বক্তব্যকে অনেক সময়ই যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। লাকাঁর মতে, একজন শিশুর আত্মকাম শুধুমাত্র শিশুকাল বা শৈশবকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং মানুষের পুরো জীবন জুড়েই আত্মকাম অবস্থান করে।

জাক লাকাঁর দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ-প্রবন্ধে মঈন চৌধুরীর বক্তব্য– 'জাক লাকাঁ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'আয়না-পর্ব' উপস্থাপনের মাধ্যমে 'আমি' বা ব্যক্তিসত্তার বিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে দেকার্তের দর্শনে ব্যক্ত 'cogito ergo sum' বা 'আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি', এ ধরনের প্রকাশ সরাসরি গ্রাহ্য নয়। লাকাঁর কজিতো বা 'আমি' শুধুমাত্র চিন্তা দ্বারাই সত্তায়িত হয় না, বরং এই আমিত্ব লাভের পেছনে কাজ করে জন্ম-পরবর্তী দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা। একটি শিশু জন্মের পর এক অসহায় অবস্থায় থেকে শুধুমাত্র নিজেই নিজেকে চিনতে পারে সম্পূর্ণভাবে এবং তার চারপাশে অবস্থানকারী সমগ্রের সাথে একাত্ম হয়ে তৈরি করে নেয় এক প্রতীকী 'আমি'-কে। জন্মের পর 'আয়না' পর্বের একটি 'শিশু-আমি' যে পূর্ণতাসহ নিজস্ব প্রতিবিম্বকে দেখতে পায়, তাকে লাকাঁ ইমাগো (imago) নামে আখ্যায়িত করেন এবং এই ইমাগো'র মাঝেই অবস্থান নেয় এক কাল্পনিক আমি-সত্তা, যার সামাজিক চরিত্র তখনো নির্ধারিত হয়নি। আয়না-পর্বের এই 'আমি' এক অসহায় অবস্থায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, উৎকণ্ঠা আর ক্লান্তিকে নিয়েই দেখতে পায় 'নিজস্ব পূর্ণপ্রতিচ্ছবিকে' এবং এ পর্বেই অসহায়তা, মানসিক ভগ্নাংশতা আর অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় মানবিক বিচ্ছিন্নতা বা alienation-এর। আয়না-পর্বে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে একটি মানুষ ইহজীবনে আর কখনোই মুক্তি পায় না এবং এ কারণে লাকাঁ বলেন কজিতো-নির্ভর মানবিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা বাস্তবে অসম্ভব।' পৃ. ৭২

অবচেতন ও ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লাকাঁ বুঝতে হলে একদিকে যেমন ফ্রয়েড বোঝা দরকার একইভাবে মার্টিন হাইডেগার-এর দর্শনও আমাদের বোঝা জরুরি।

তেরো নম্বর প্রবন্ধ: 'সমস্যা, সমস্যার সমাধান ও ভাষাদর্শন'। বলা বাহুল্য মঈন চৌধুরী তাঁর বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধগুলোতে অধিকাংশ সময়ই বক্তব্য উপস্থাপনের বাহন করেছেন ভাষাদর্শনকে। কোনো কোনো দার্শনিকের দর্শন ভাষাদর্শনের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়েছে; কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে ভাষাদর্শন-এর ওপর ভর করা নিরুপায় কর্তব্য নয়, মান্যবর মঈন সে-সব ক্ষেত্রেও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভাষাদর্শনকে তাঁর আলোচনার স্বার্থে প্রাসঙ্গিক করেছেন: বিষয়টিকে মঈনের প্রাবন্ধিক-জীবনের বিশেষ অর্জন বললে বেশি বলা হবে না। এই প্রবন্ধের 'জীবন ও ভাষা' অংশের শুরুতেই উল্লেখ রয়েছে, 'বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক বস্তুর গণিতকে নির্ভর করে পৃথিবীতে যখন জীবন এল, তখন থেকেই সৃষ্টি হল এক নতুন ধরনের জটিল জৈবগণিতের। আর জীবনের এই গণিতকে অবলম্বন করেই জন্ম নিল জীবন প্রকাশের এক অসাধারণ উপাদান ভাষা ও ভাষার যুক্তি।'

মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল কর্মকাণ্ডকে ভাষা অর্থদান করে প্রকাশ করতে পারে কি-না, সেটি একটি বড় ধরনের প্রশ্ন। যদিও জাগতিক সকল সমস্যা ও তার সমাধান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল কর্মকাণ্ডকে দানকৃত অর্থকে কেন্দ্র করেই আবির্ভূত হয়। একই ধরনের ভাষাচিহ্নের বহুমাত্রিক অর্থ কীভাবে উপস্থিত হয় তা সস্যুর, দেরিদা ও লাকাঁর দর্শন থেকে উদ্ধার করা গেলেও বিষয়টির বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ভাষাতত্ত্বে এখনো উল্লেখ বা বিশ্লেষিত হয়নি। এ ব্যাপারে জনাব মঈন এ-প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলেছেন: সে-কারণে ভাষাতত্ত্বের আওতার মধ্যে বিষয়টিকে আনা জরুরি। কেননা ভাষাতত্ত্বই পারে একটি ভাষার প্রতীককে বহু অর্থের কাছে নিয়ে যেতে। একই বস্তু, ঘটনা বা বিষয়ের ভাষাচিহ্ন-সৃষ্ট অর্থ দেশ-কাল গ্রাহ্য করে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পায়। দার্শনিক হিবটগেনস্টাইন-এর ভাষায়– The world is my world : this manifest in the fact that the limits of Language (of that language which alone I understand) mean the limits of my world.... The world and life are one. ...I am my world. (Book : Tractatus Logico—philosophicus)

যাইহোক আলোচ্য প্রবন্ধের শেষভাগে এর লেখক মোট আঠারোটি 'সিদ্ধান্ত' হাজির করেছেন, যেগুলোকে এই প্রবন্ধের সারকথাও বলা যেতে পারে। এসব সিদ্ধান্তের সবগুলোই সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে পাঠকের কাছে হয়তো মনে হবে না; তবে এসব সারকথার সারকথা উঠে এসেছে পনেরো ও ষোলো নম্বর সিদ্ধান্তে। পনেরোতে বলা হয়েছে, 'মানবমস্তিষ্কে কোনো ভাষাচিহ্ন স্থাপন/ প্রতিষ্ঠাযোগ্য না হলে তা থেকে সৃষ্টি হয় অধিবিদ্যাজাত উপলব্ধির।' আর ষোলোতে বলা হয়েছে,

‘কেবলমাত্র যৌক্তিক/ গাণিতিক বর্ণনাই ভাষাসৃষ্ট সমস্যার সমাধান কিছুটা হলেও করতে পারে।’

‘কবিতা ও প্যারাডাইম’ এ-বইয়ের পঞ্চদশ প্রবন্ধ। মঈন চৌধুরী একজন কবি হওয়ার কারণে এ-বিষয়ে তাঁর উপলব্ধিজাত বিচার, সত্যের অনেক বেশি কাছাকাছি হবেএটা ধরে নেয়া যায়।

‘কবিতা বা অন্য কোনো সৃষ্টির বেলায় জাগতিক শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া মৌলিকভাবেই ক্রিয়াশীল থাকে’লেখকের এমন মন্তব্য ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়েছে। অবশ্য ‘কবিতা ঐশ্বরিক দান’ এমন বিশ্বাসের কবি ও পাঠক সংখ্যাও আমাদের সমাজে কম নেই। এই দুই ধরনের চিন্তা আসলে বস্তুবাদী ও ভাববাদী ধারার দুই প্রকারের প্রকাশ। সে-অর্থে মঈন চৌধুরী তাঁর দর্শন আলোচনাতে তো বটেই, কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যেও দেখা যায় তিনি বস্তুবাদে আস্থাশীল।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি ‘প্যারাডাইম’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন সম্ভবত এই কারণে, এর বাংলা যুতসই শব্দ তিনি খুঁজে পাননি। আমিও ভেবে দেখেছি অনেক বাংলা শব্দের যেমন প্রকৃত ইংরেজি শব্দ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, একইভাবে কোনো কোনো ইংরেজি শব্দেরও প্রকৃত বাংলা শব্দ পাওয়া অসম্ভব; আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় ইংরেজি Motive (মোটিভ) এরকম একটি শব্দ; এবং মঈন চৌধুরী কর্তৃক ব্যবহৃত প্যারাডাইমও সে-রকম একটি শব্দ। যা হোক জনাব মঈন বাংলা কবিতা অতঃপর বাংলা নতুন কবিতার খোঁজ করতে গিয়ে খুব বেশি অতীত ঘাঁটতে যাননি। বাংলা কবিতার অতি উজ্জ্বল যে অতীত রয়েছে সেই সময়কে এড়িয়ে গিয়ে তিনি আর দশজন প্রথাগত, উপনিবেশ-জালে আচ্ছন্ন আলোচকদের মতোই এখানে কাজটি করেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্যারাডাইম মূলত প্রাচীন ভারতীয় জীবনদর্শন ও ভারতীয় জীবনদর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বসাহিত্য ও পাশ্চাত্যদর্শনের প্রভাবে তাঁর কবিতায় নতুনের আমেজ আসে এবং তিনি বাংলাভাষায় প্রথম নতুন কবিতা বা আধুনিক কবিতা লিখতে প্রয়াসী হন।’

এখানে লেখক ‘নতুন কবিতা’ ও ‘আধুনিক কবিতা’ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন সেটা আমাদের বুঝতে সমস্যা হল না। কিন্তু তিনি যদি শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন তা-হলে তাঁর কাছে আমাদের অনুরোধ রইল, পাশ্চাত্যদর্শনের প্রভাব-মুক্ত থেকে বাংলা কবিতার রবীন্দ্র-পূর্ব যে-উজ্জ্বল অতীত রয়েছে, সে-বিষয়টি তিনি যেন এই প্রবন্ধের মধ্যে যুক্ত করেন। সঙ্গত কারণেই তাঁর কাছ থেকে পাঠকের প্রত্যাশা প্রথার বাইরের কিছু সত্য।

আট নম্বর প্রবন্ধ ‘কবিতা ও যুক্তিভাষা’-য় তিনি অসাধারণ একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। খুব সংক্ষেপে যদি বলি তাহলে তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায় এমন,

কবিতার ভাষা সবসময়ই যুক্তির ভাষা থেকে আলাদা; তবে কবিতার মধ্যে যুক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। শত হাজার রকম যুক্তি দিয়ে কবিতা বানানো সম্ভব কিন্তু তার মধ্যে নন্দন না-থাকলে ওই কবিতা শিল্প হয় না। তাঁর ভাষায় এই 'শিল্প-সৌন্দর্য' বা 'নন্দন'-এর কোনো গণিত নেই।

এই বইয়ের সর্বশেষ প্রবন্ধ 'সৃষ্টির সিঁড়ি'; যে-নামে লেখক এই বইয়ের নামকরণ করেছেন। বোঝা যাচ্ছে, লেখকের কাছে প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বের। তবে প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু জনিত কারণে যে-অবয়ব দাবি করে সেই অবয়ব এখানে রক্ষিত হয়নি; মাত্র দুই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে প্রবন্ধটি। এটি যে-বিষয়ের ওপর এবং যে-ভাবে শুরু হয়েছে তাতে লেখক চাইলে 'সৃষ্টির সিঁড়ি' এমন সুন্দর নামের ওপর একটানা একটি বই-ই রচনা করতে পারতেন অথবা আশা করা যায়, ভবিষ্যতে লিখবেন। 'জন্মমুহূর্তের কথা মানুষটার মনে নেই'এমন উক্তি চিরায়ত কেননা ওই মুহূর্তের কথা কারো মনে থাকে না। এর পরের প্যারাতেই তিনি লিখছেন, 'ভেতরের মানুষটা বুঝেছিল, জীবন আসলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো একটা সময়ের উপলব্ধি।'

দু-পৃষ্ঠার প্রবন্ধ হলেও এরকম অনেক উজ্জ্বল লাইন রয়েছে এর মধ্যে, তারচেয়ে বড় কথা প্রায় গল্পের ঢঙে লেখা এই প্রবন্ধটিতে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী ধাপগুলোকে তিনি চিত্রিত করেছেন কবিতা বা কথাসাহিত্যে যে-নন্দন থাকে সে-ধরনের নান্দনিক ভাষায়।

এছাড়াও এ বইয়ে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে, যেগুলোর ওপর আমি আলোকপাত করা থেকে বিরত থাকলেও আমার দৃঢ়ভাবে মনে হয়েছে, সেগুলোও অত্যন্ত মূল্যবান রচনা। সব মিলিয়ে নির্দ্বিধচিত্তে বলা যায়, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত দার্শনিক ও তাঁদের দর্শনের ওপর বাংলাভাষায় এটি ব্যতিক্রমী ও নতুন ধরনের চিন্তাসন্ধানী গুরুত্বপূর্ণ বই।

তিন.

মঈন চৌধুরীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই 'ইহা শব্দ'। এ-বইয়ে দেরিদা, ফুকো ও হিবটগেনস্টাইন-এর দর্শনের ওপর স্বতন্ত্র আরও তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে। 'জাক দেরিদার দর্শন : শব্দব্রহ্ম, বিচ্ছেদ ও বিনির্মাণ' প্রবন্ধে লেখকের উদ্ধৃতি– "উপনিষদের 'নির্গুণ ব্রহ্ম', প্লেটোর 'আইডিয়া', দেকার্তের 'কজিটো', স্পিনোজা'র 'গাণিতিক ঈশ্বর', লাইবেনিত্সের 'মোনাড' কিংবা হেগেলের 'পরম' বা 'এ্যাবসল্যুট' সবসময় আমাদের শুনিয়েছে অধিবিদ্যার বাণী, তৈরি করছে অস্তিত্ব, মন, ঈশ্বর, চরম, পরম ইত্যাদির মতো কিছু ধ্বংসহীন আদর্শ এবস্ট্রাক্ট বস্তু কিংবা বিষয়ের গোলকধাঁধা।....."

".....প্লেটোর 'আইডিয়া'র বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন যুক্তিনির্ভর সফিস্টরা, উপস্থিত ছিলেন সংশয়বাদী পাইরো, সেক্সটাস এম্পিরিকুস এবং পরবর্তীকালে হিউম, কান্ট,

দিদেরো, হলবাক এবং হেলভেটিয়াস। অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিককালে সোচ্চার ছিলেন নিৎশে, সার্ত্রে এবং হাইডেগার। ফ্রেডরিখ নিৎশে তাঁর রচিত Thus Spoke Zarathustra, The Anti-Christ, Beyond Good and Evil, The Genealogy of Morals, The Daybreak এবং Will to Power শিরোনামের দার্শনিক উপস্থাপনে অধিবিদ্যাজাত বিভিন্ন উপাদান, যেমন– ঈশ্বর, ধর্ম, ভালো, মন্দ, নৈতিকতা ইত্যাদিকে আক্রমণ করেছেন বিস্তারিতভাবে।" ইহা শব্দ: পৃ. ৯

জাক দেরিদাকে কেবল দার্শনিক নয় বরং তাঁকে দর্শনের কট্টর সমালোচকও বলা যেতে পারে। একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁর সমালোচনামূলক দার্শনিক অবস্থান সবসময়ই অধিবিদ্যা বা Metaphysics-এর বিপরীতে। তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে মনে করেন, অধিবিদ্যক জ্ঞানের ভাষাই মানুষকে প্রকৃত সত্যের কাছে পৌঁছার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা।

এই ভাষা নিয়ে এক মারাত্মক, ইতিহাস কাঁপানো প্রশ্ন তুলেছিলেন নিৎশে। ভাষার ক্ষমতা বাস্তবতাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম নয়; এক্ষেত্রে ভাষার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে নিৎশে প্রশ্ন করেছিলেন, "1st die Sprache der adequate ausdruck aller realitaten?"

মঈন চৌধুরী তাঁর এ-প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ভদ্রলোক ও ছোটলোকের ভাষার পার্থক্যের কথা। উনিশ শতকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রসারকালে জন্ম নিয়েছিল যে Positivism, পরবর্তীকালে তাই Humanish নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল; এই চিন্তারই ধারাবাহিকতায় জাত পরবর্তীকালে কার্ল মার্কস-এর দর্শন তথা মানবিক সত্তার এক মৌল উপাদান শ্রেণিসংগ্রাম-এর চেতনার বিশেষ উৎসও ওই ভদ্রলোক ও ছোটলোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা।

মঈন চৌধুরী তাঁর 'সৃষ্টির সিঁড়ি' বইয়ে দেরিদার দর্শন নিয়ে যা লিখেছেন তার অনেক কিছুরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তাঁর 'ইহা শব্দ' বইয়ে। কিন্তু একই বিষয়ে দুই বইয়ের ওপর দুটি প্রবন্ধ কেন প্রকাশ করেছেন তা আমার বোধগম্য নয়। বরং এ-দুটো প্রবন্ধের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি বইয়ে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া গেলে এই পুনরাবৃত্তির হাত থেকে রচনা দুটিকে রেহাই দেয়া যেত। আমার ধারণা, তাতে পাঠকেরও রচনা পাঠে সুবিধা হত। এই ঘটনা মিশেল ফুকো এবং হিবটগেনেস্টাইনের ওপর রচিত প্রবন্ধের বেলাতেও ঘটেছে। এই দু-জন দার্শনিকের দর্শনের ওপর দুই বইয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রেও আমার একই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এ-বইয়ের লেখক বর্তমানে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশে থাকার কারণে, পুনরাবৃত্তি রয়েছে এমন প্রবন্ধগুলোকে সমন্বয় ও সম্পাদনা করে যে নতুনভাবে 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ'-তে সংকলিত করব সেই সুযোগ নেই, কেননা এক্ষেত্রে তাঁর অনুমতি ও পরামর্শ ব্যতীত এ-কাজে আমার একতিয়ার নেই বলে মনে হল। পুনরাবৃত্তির ঘটনা ঘটলেও 'মিশেল ফুকোর দর্শন ও ফুকোর মানব' প্রবন্ধে বেশ কিছু

নতুন কথাও বলবার প্রয়াস লক্ষণীয়। জনাব মঈনের মতে, 'ফুকোর মানব'এই শব্দ-যুগল গ্রন্থনা করা হয়েছে বিশ শতকের দার্শনিক মিশেল ফুকোর তত্ত্ব-ধারণাকে কেন্দ্র করে। এই প্রবন্ধে 'ফুকোর মানব' বিষয়টি কী সে-কথা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল সাহিত্যিক ভাষায়– "আমি মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব। আমরা হয়েছি ঈশ্বরের অবতার। সৃষ্টিকর্তার সেই জ্ঞানাবলিকে কেন্দ্র করে আমরা জন্ম নিচ্ছি পীর, ফকির, সাধু, সন্ন্যাসী হিসেবে। আবার সাধারণ মানুষ যদি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তাহলে আমরা আবির্ভূত হই বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট, রাজনীতিক, এনজিও প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক, আমলা, সাংবাদিক, সমাজ-সেবক ইত্যাদি হিসেবে। আমাদের সাধারণ মানুষ যে-নামেই ডাকুক, রসুনের গোটার মতো আমরা গোড়ায় এক। আমরা কোনো এক কেন্দ্রবিন্দু দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যবহৃত হই আর ব্যবহার করি তোমাদের। আমাদের কেন্দ্রের ইংরেজি নাম Power Center এবং এই কেন্দ্রটিই আমাদের ধারণ ক'রে নিজে পরিচিত হয় Power Structure কিংবা ক্ষমতা-কাঠামো নামে। এ-কারণেই মিশেল ফুকো আমাদের আবিষ্কার ক'রে আমাদের নাম দিয়েছেন 'ফুকোর মানব'।" এমন অকাট্য যুক্তিগ্রাহ্য নানা অনুসঙ্গ-প্রসঙ্গ উঠে এসেছে মঈনের আলোচ্য প্রবন্ধে।

'ইহা শব্দ' বইয়ের তৃতীয় প্রবন্ধ, 'হিবগেনেস্টাইনের দর্শন : ভাষা, চিন্তা, বিশ্ব ও বাস্তবতার স্বরূপ'। এই রচনাতে 'সৃষ্টির সিঁড়ি' বইয়ে প্রকাশিত রচনার কিছু পুনরাবৃত্তি রয়েছে। তারপরও হিবগেনেস্টাইনের দর্শন আরও ভালো করে বুঝবার ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধটি অনেকটা অতিরিক্ত সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

হিবটগেনেস্টাইনের দর্শনে জীবন ও ভাষার মধ্যস্থ সম্পর্কের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জীবনের সঙ্গে ভাষার যে-সম্পর্ক তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা হাজির করেন তিনি। মঈন চৌধুরীর ভাষায়– "হিবগেনেস্টাইনের দর্শন-চিন্তাকে দুটো পর্বে ভাগ করা সম্ভব, যাকে আমরা বলতে পারি, 'ট্রাকটাটাস পর্ব' এবং 'ফিলোসোফিক্যাল ইনভেস্টিগেশন পর্ব'। উল্লিখিত দুটো পর্বে যে দর্শন-চিন্তা হিবটগেনেস্টাইন উপস্থিত করেছেন তার যুক্তি-কাঠামো বিপরীতমুখী হলেও, বিষয় হিসেবে ভাষা ও চিন্তার কাঠামো এবং ভাষা-চিন্তার সীমাবদ্ধতা প্রাধান্য পেয়েছে।"

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কান্টের দর্শন যেমন 'চিন্তার সমালোচনা' হিসেবে উপস্থাপিত এবং গ্রাহ্য, অনেকটা সেভাবেই হিবটগেনেসস্টাইনের দর্শন 'ভাষার সমালোচনা' হিসেবে উপস্থাপিত। তাঁর Tractatus Logico-philosophicus বইটির পাঠ সম্পর্কে হিবটগেনেস্টইন বিশেষজ্ঞ ডেভিড পিয়ার্স বলেন, "The text of tractatus is formidably difficult part of the book makes it hard to find a clear point of entry into it."

উপরিউক্ত বইখানি তাঁর ট্রাকটাটাস পর্বে লিখিত; তখন তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বের বাস্তবতাসমূহই মানুষের ভাষার কাঠামোকে নির্ধারণ করে এবং এ-কারণে

ভাষা হচ্ছে বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ। পক্ষান্তরে ট্রাকটাটাস-উত্তর ফিলসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশন পর্বে এসে তিনি এক বিপরীত চিন্তা-মেরুতে অবস্থান নেন এবং নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উচ্চারণ করেন—ভাষার মাধ্যমেই যেহেতু বিশ্ব একজন মানুষের কাছে উন্মোচিত হয় সেহেতু ভাষাই প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারণ করে বাস্তবতার স্বরূপ এবং কাঠামো।

হিবটগেনেস্টাইন সম্পর্কে মঈন চৌধুরীর ভাষ্য,– "কিছু কিছু বিষয় প্রশ্নের সম্মুখীন হলেও, বেশিরভাগ বিষয়ই আমাদের কাছে এখনো গ্রহণযোগ্য। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিন্তা হল দর্শনের জগৎ থেকে 'ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা'র উচ্ছেদ, যা দেকার্ত, হিউমসহ সমকালীন জ্ঞানতত্ত্বকে গ্রাস করে রেখেছিল। কান্ট ও হেগেল 'আমি'-র প্রাধান্যহীন যে দর্শনের সূচনা করেছিলেন হিবটগেনেস্টাইনের দর্শনে এসে তা পূর্ণতা লাভ করেছে, এ কথা বলাই যায়।" পৃ. ৬

'ইহা শব্দ'র 'বাঙ্গাল জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে' রচনায় প্রতিটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের গোড়াপত্তন, বেড়ে-ওঠা এবং বর্তমান কালের পরিণতি নিয়ে ইতিহাস-নিঃসৃত যুক্তির নিরিখে আলোচনা করা হয়েছে। 'প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের (বংগালদেশের) বাঙ্গালরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে।' একথা লেখক বলে শেষ করতেই আবার বলছেন এর বিপরীত কথা : 'সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় বাঙ্গালরা নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পেলেও ইতিহাসকেন্দ্রিক আত্মপরিচয়ের সংকট এখনো তাদের কাটেনি।' লক্ষণীয় যে, সম্পূর্ণ স্বাধীন হলে তো আত্মপরিচয়ের সংকট থাকবার কথা নয়; তার মানে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়নি। সুতরাং এরকম পরস্পর ও স্ববিরোধে ঠাসা মঈন চৌধুরীর কোনো কোনো রচনা। এ-থেকে এ-ও প্রমাণিত হয়, কবি মঈন চৌধুরী প্রবন্ধ লিখেছেন বটে কিন্তু নিজস্ব চিন্তায় তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থিত নন। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো যা ভেবে-চিন্তে লিখতে চেয়েছেন কবি-হৃদয় সেই ভাবনাকে বস্তুনিষ্ঠ হতে দেয়নি—এভাবে চিরকাল বাঙালির চিরায়ত আহ্লাদ ও আবেগ চিন্তার পূর্ণাঙ্গতা থেকে টুকরো টুকরো করে খসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বানের মতো। অবশ্য এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে পূর্ণাঙ্গতা দেয় এমন একটি বড় প্রবন্ধ-সম্বলিত পুরো একটি বই-ই তো লিখেছেন লেখক—'ভাষা, মনস্তত্ত্ব ও বাঙালি/ বঙ্গাল সংস্কৃতি' নামে। সে-বইয়ের শেষে বিশেষ নোটে লেখা আছে, "পাঠক যদি বঙ্গাল জাতীয়তাবাদ নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান তবে লেখক রচিত এই 'ইহা শব্দ' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ 'বাঙ্গাল জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ' পড়ে দেখতে পারেন।"

এখানে 'ইহা শব্দ' বইয়ের যে-কটি প্রবন্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল, এর বাইরেও আরও কয়েকটি রচনা রয়েছে, সেগুলোও বিশেষভাবে চিন্তাসমৃদ্ধ।

চার.

'শব্দের সম্ভাবনা' বইয়ের প্রাককথন-এ লেখকের ভাষ্য, 'পাশ্চাত্যের কোনো দর্শন-তত্ত্ব আলোচনাকালে আমি বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতাকেও বিশ্লেষণ করেছি, আধুনিক দর্শন ও তত্ত্বসমূহ কীভাবে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে, তা দেখাতে চেষ্টা করেছি। গত তিন দশক ধরে সাহিত্যতত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে লেখালেখি করতে গিয়ে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দর্শন-তত্ত্বের বিশ্লেষণে কিছু নতুন চিন্তা-চেতনা যোগ করা সম্ভব। গ্রন্থভুক্ত কিছু প্রবন্ধে তাই আমি আমার চিন্তা-চেতনাকেও উপস্থাপন করেছি যুক্তিকে গ্রাহ্য করেই।'

আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের একান্ত নিজের চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে অন্যান্য বইয়ের তুলনায় বেশি মাত্রায়। মৌলিক চিন্তাও এ-গ্রন্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। মনের মাধুরী মিলিয়ে কোনো পূর্ব-নির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গি না-মেনে 'যেমন ইচ্ছে তেমনভাবে' এ বইয়ের প্রবন্ধগুলো খুব বেশি স্বাধীন-স্বকীয় ভাব-চিন্তা ও প্রকরণ নিয়ে হাজির হয়েছে। বলা যায় বড় বড় দার্শনিকের দর্শন আলোচনার মধ্যদিয়ে মঈন চৌধুরীকে যতটা চেনা-জানা যায়, তার তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছভাবে এ-বইয়ে তাকে চিনে ও জেনে নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

এ-বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ 'মানুষের মন : পরী ও রাজপুত্র প্রকল্প'-তে মঈন চৌধুরী এক জায়গায় মনের পরী অর্থাৎ দেবী বা বিশেষ করে মুসলমান পুরুষসমাজের কল্পনায় যে হুরপরী জায়গা করে থাকে, সেই ধর্ম কর্তৃক নির্মিত হুরপরী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, এই বলে যে, মুসলমান নারীর কল্পনাজগতে তো কোনো হুরপুরুষের অবস্থান নেই; আমার মতে, এটি একটি গুরুতর ও মৌলিক প্রশ্ন। জনাব মঈনের ভাষায়–"বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমান পুরুষ জনগোষ্ঠীর কোনো দেবী নেই। তবে তাদের আছে আরব্য-রজনীর ইতিহাস, বড়-বিবি, ছোট-বিবি, মেজ-বিবি, সেজ-বিবি-কেন্দ্রিক কামনা-বাসনা এবং সব শেষে বেহেশতের হুর ও পরীদের স্বচ্ছ নরম কোমল শরীরের স্বপ্ন। বাংলাদেশের মুসলমান মহিলাদের জন্য কী আছে? তাদের জন্য কিছু নেই, স্বামীর সেবা করে, ধর্মকর্ম ঠিকভাবে করলে, তারা বেহেশতে গিয়ে তাদের 'রাজপুত্র স্বামী'-কে (যে বাস্তবে হয়তো ছিল কাপুরুষ, পুরুষত্বহীন) ফিরে পাবে। কিন্তু সবশেষে নৃতাত্ত্বিক কারণেই একটা প্রশ্ন থেকে যায়; বেহেশতে ফিরে পাওয়া 'স্বামী' কি হুর-পরী ছেড়ে তার সেই পুরাতন বউ-এর কাছে ফিরে আসবে?" শব্দের সম্ভাবনা: পৃ. ১৩

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে শুধু মুসলমান সমাজের নর-নারীর কল্পিত হুরনর ও হুরনারীর কথা বলা হল। এই বলাকে প্রতীকায়িত করে আমরা দেবী মনসা, জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী, যক্ষিণী, কুষ্মাণ্ডিলী, অম্বিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা, বসুধারা, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী,

কালী, ভেনাস, আফ্রোদিতি, প্রমুখ নামের মধ্যদিয়ে স্বচ্ছ আয়নায় পুরুষবাদী এক বিশ্বচিতার স্বরূপের দেখা পাই ।

'আত্ম ও সমগ্রের সমালোচনা' প্রবন্ধে লেখকের দার্শনিকতা দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও প্রবন্ধটি ধীরে ধীরে সমসাময়িকতা ও তাৎক্ষণিকতার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে । বলা যায়, এই সম্পাদকীয়'র মধ্যে মঈন চৌধুরীর যদি সমালোচনা করতেই হয়, তাহলে আমি বলব তাঁর সবচেয়ে দুর্বলতা হল নিজের চিরায়ত চিন্তাকে, জগৎ-জীবন কেন্দ্রিক কষ্টার্জিত ভাবনাকে প্রায় সময়ই সমসাময়িক তাৎক্ষণিকতা এমনকি কখনো স্থূলতার হাতে তিনি সঁপে দিয়েছেন যেন সরল শিশু-মনে । এই ত্রুটি শুধু মঈন চৌধুরীর নয় এই সমস্যা পুরো ভারতের লেখকদের একটি বড় সমস্যা । এই সমস্যা ভারতে প্রকট হওয়ার কারণেই এখানে দার্শনিক-বিজ্ঞানী ক'জন আছেন আর ভাবুক-কবি কত-শত আছেন, সেটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি! এত এত ভাবুকতার প্রধান সমস্যা বোধ হয় এই যে, মহা ভারতবর্ষ মহা কোনো বিপর্যয় আজ অবধি প্রত্যক্ষ করেনি তাই তার মগজের মধ্যে যে-শেকড়, সেটা লম্বা ও তীক্ষ্ণ হয়ে তল ভেদ করে যতটা পৌঁছানোর কথা ছিল তার চেয়ে ক্ষীণকায় হয়ে নির্গতির অবয়ব দশদিকে ছড়িয়েছে বেশি । এজন্য একজন রবীন্দ্রনাথও বহু প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও গণিতকে এড়িয়ে গেছেন; দর্শনের বহু আভা ছড়িয়েছেন কিন্তু তার একটি রশ্মিকেও গণিত দিয়ে বিচার করেরনি; নিজেকে দার্শনিক করেননি ।

এছাড়া এ বইয়ের অন্য প্রবন্ধগুলো হল, 'সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্ব প্রসঙ্গ : সাহিত্য বিশ্লেষণ প্রয়োগ', 'সৃষ্টি ও দেশকাল', 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে', 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ' এবং 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি...' ।

এগুলোর মধ্যে 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে' প্রবন্ধটি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'ত্রৈমাসিক আবহমান' পত্রিকায় দায়িত্বরত অবস্থায় আমি ছেপেছিলাম । শুধু ছাপাই নয়, সম্ভবত এটির রচনাকার্যের অগ্রগতি ও সমাপ্তির পেছনে আমার দেয়া তাড়া ও অনুরোধ বিশেষভাবে কাজ করেছিল । প্রবন্ধটি আমার বিবেচনায় এই বইয়ের মধ্যে তো বটেই, এমনকি মঈন চৌধুরীর সকল প্রবন্ধের মধ্যেও একটি মৌলিক ও সুপাঠ্য প্রবন্ধ । উল্লেখ্য আগেই বলেছি এই বইয়ে মঈন চৌধুরীকে জানবার সুযোগ সবচেয়ে চাক্ষুষ হয়ে উঠেছে যার কারণ হিসেবে বলব, এই বইয়ের প্রায় সবকটি প্রবন্ধে বেশি প্রকাশ পেয়েছে লেখকের নিজস্ব মতামত ও চিন্তা । ফলে পাঠকের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এমন একটি বই যেন না-পড়ে ছেড়ে না-দেন । লেখক-গবেষকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, তারা বইটি এই কারণে পড়বেন, এই বইয়ের অধিকাংশ রচনা-সৃষ্টির প্রকরণটা একেবারেই ব্যতিক্রম; লেখকের নিজস্ব; এই প্রক্রিয়াটি নতুনত্ব দাবি করে বিধায় এটা কোনো কোনো

প্রাবন্ধিক-গবেষক বিবেচনার ভিত্তিতে নিজেদের রচনা-সৃষ্টির প্রকরণ হিসেবে গ্রহণও করতে পারেন।

পাঁচ.

ভারতীয় তথা বঙ্গাল বা বাঙালিকে কত গভীরভাবে তিনি পাঠ করেছেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর 'ভাষা, মনস্তত্ত্ব ও বাঙালি/বঙ্গাল সংস্কৃতি' নামক ছোট্ট বইটিতে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে মঈন চৌধুরী উদ্ধৃত করেছেন– 'শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত, কেননা বিচিত্র তার ছন্দ।' (ছন্দ : রবীন্দ্র রচনাবলী, ঢাকা-১৪০৬)।

বাঙালির এক বড় অহংকার ও আবেগের নাম রবীন্দ্রনাথ; কাজেই সহসা সাধারণত কাউকে দেখা যায় না রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করে বুঝতে। বলা যায় খুব অনায়াসেই আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল কথা বিনাপ্রশ্নে শুনে যাই এবং মেনেও নেই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'সংস্কৃতি চিন্তা'-কে বিশ্লেষণ করে কিছু মৌলিক এবং যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মঈন–

> 'ক. আত্মসংস্কৃতি আর শিল্প কিংবা শিল্পবোধ কি একই উপাদান?
> খ. পরিবেশ, প্রকৃতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদিকে বিচার-বিশ্লেষণে না এনে শুধুমাত্র আত্মার সংস্কারে সাংস্কৃতিক বিকাশ কি আদৌ সম্ভব?
> গ. ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' কি একটি অধিতাত্ত্বিক বাণী নয়? যদি এই বাণীতে যুক্তি থেকে থাকে, তবে কি আমাদের সংস্কৃতির সাথে শুধুমাত্র সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে?'

মঈন চৌধুরী ছোট্ট এ-বইটিকে বিশাল এক একটি বিষয়কে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছেন; কোথাও সফলও হয়েছন। বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি বিষয়ে একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়ার জন্য বইটি খুবই পাঠযোগ্য। টানালেখা এক প্রবন্ধে এ-বই শেষ হয়েছে; এখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে, লেখক-এর অনেক পঠন-পাঠনের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে, বোঝা যায়।

লেখক এক জায়গায় লিখছেন, "বাঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাতের কাছে না পেলেও কবি ও প্রাবন্ধিক পুস্কর দাশগুপ্তের একটি লেখা আমাদের সংস্কৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়কে কিছুটা হলেও তুলে ধরেছে বলে মনে হল। ভারতীয় চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন– 'অনেক খোঁজাখুঁজি

করে আমি অবশেষে এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, ভাষা, ধর্ম, আচার-বিচার ইত্যাদির ব্যবধান পেরিয়ে সারা ভারতে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য যদি থেকে থাকে তাহলে তা হল ভণ্ডামি।"(দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা, ১৯৯৫)

অনেক তরুণ বা উঠতি পাঠক-লেখক-গবেষক এই ছোট্ট বইটি পড়ে যেমন সাধারণভাবে উপকৃত হবেন আবার অনেকে ছোটখাট বিতর্কের সমাধান আবার কখনো ইতিহাসের কোনো কোনো বিশেষ অজানা বিষয় এখান থেকে জেনে যাবেন। আগেই বলেছি সবকিছুকে প্রশ্ন করে দেখা মঈনের বৈশিষ্ট্য। রামমোহন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রবীর ঘোষ ও পুস্কর দাশগুপ্তের কিছু মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন এভাবে– 'রামমোহন ইংরেজ শাসকদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে দেশীয় উচ্চবর্ণদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ বার বার বারিধারার মতোই বর্ষণ করেছেন এবং তাঁর কাজকর্মে যে চিন্তাধারা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হল–

(১) ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিভাবকত্ব মেনে নাও।
(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বরের করুণার মতোই এসে পড়েছে।
(৩) ইংরেজদের সাম্রাজ্যরক্ষায় সব রকমে সাহায্য কর।
(৪) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তাদের ঘৃণা কর। ওই বিদ্রোহীদের নির্মূল করতে ইংরেজদের সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে এস।
(৫) সভা-সমিতি গড়ে সেগুলোর মাধ্যমে ইংরেজদের জয়গান কর। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর।
(৬) সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের সুফল বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত কর।
(৭) ইংরেজদের কাঁচামাল রপ্তানি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে তৈরি জিনিস আমদানির ব্রিটিশ নীতিকে সমর্থন কর।'

(সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা ১৯৯৩)

আলোচ্য বইটি তিনি ১. পূর্বকথা; ২. ভাষা ও সংস্কৃতি; ৩. প্রকৃতি ও সংস্কৃতি; ৪. সমাজ ও সংস্কৃতি; ৫. অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, ৬. অনুচিন্তন এবং ৭. সংযোজন এই মোট সাতটি ভাগে লিখেছেন। বইয়ের সবশেষে পাঠকদের এ বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে জানবার জন্য তাঁর 'ইহা শব্দ' বইয়ের 'বাঙ্গাল জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি পড়বার আহ্বান জানিয়েছেন।

ছয়.

'মঈন চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ' বইয়ের 'সংযুক্তি: এক'-এ 'বাংলাভাষার বানান সংস্কার: কলিম খান – মঈন চৌধুরী বিতর্ক' বইটি সংযুক্ত হয়েছে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'আবহমান' পত্রিকায় পশ্চিম বাংলার লেখক-গবেষক কলিম খানের বাংলাভাষার বানান সংস্কার বিষয়ক একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায়। উল্লেখ্য উক্ত প্রবন্ধটি আবহমানে ছাপার জন্য কলিম খানের কাছ থেকে সংগ্রহ করবার ক্ষেত্রে আমাকে সহযোগিতা করেছিল নব্বইয়ের দশকের কবি তুষার গায়েন। প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার পরের সংখ্যায়ই এই প্রবন্ধের ওপর দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া লিখেছিলেন বাংলাদেশের কবি, প্রাবন্ধিক মঈন চৌধুরী। আবহমান-এর নির্বাহী দায়িত্ব ছিল আমার ওপর; তুষার গায়েনের সহযোগিতা নিয়ে মঈন চৌধুরীর প্রতিক্রিয়ার কলিম খানেরও একটি প্রতিক্রিয়া ছেপেছিলাম তার পরের সংখ্যায়।

যাই হোক পরবর্তী সময়ে মঈন চৌধুরীর উক্ত দুটি ও তার আরও একটি প্রতিক্রিয়া (যেটি আবহমান সম্পাদক ছাপেননি) নিয়ে মঈনের মোট তিনটি রচনা এবং কলিম খানের উক্ত দুটি রচনার সমন্বয়ে ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারির বইমেলায় নালন্দা প্রকাশনী থেকে বই আকারে প্রকাশ হয়। উল্লেখ্য শরমিন নিশাত সে-বইয়েরও সহযোগী সম্পাদক ছিল ।

উক্ত বইয়ের শুরুতে আমি 'প্রসঙ্গ-কথা' লিখতে গিয়ে মোটামুটি দীর্ঘ ভূমিকাই লিখেছিলাম। সেই 'প্রসঙ্গ-কথা' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "কলিম খানের সঙ্গে মঈন চৌধুরীর মূলবিরোধ ক্রিয়াভিত্তিক ও বিশেষ্যভিত্তিক বাংলাভাষা নিয়ে; তবে জনাব কলিম যে বাংলাভাষার লোকজনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সর্বভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারতের মতো সম্পদকে সর্বভারতীয় বলেছেন, তা জনাব মঈন চৌধুরী মেনে নিতে রাজি হননি। এসব প্রসঙ্গের পাশাপাশি বাংলাভাষার বানান সংস্কারের বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে দুজনেরই আলোচনায়।"

এ-বইটি প্রকাশের পর পাঠকের কাছ থেকে বেশ সাড়া পেয়েছি। বইটিতে ভাষাতত্ত্বের মতো বিষয়কে উপন্যাসের মতো আনন্দ নিয়ে পড়া যায় বলে অনেকে জানিয়েছেন এবং দুই বাংলাতেই ভাষার বানান নিয়ে যে নৈরাজ্য চলছে সে-দিক থেকে বইটির একটি যৌক্তিক গুরুত্ব দাঁড়িয়েছে বলেও বেশ কিছুসংখ্যক পাঠক জানিয়েছেন। আমি 'প্রসঙ্গ-কথা' নামে প্রকারান্তরে যে ভূমিকা লিখেছিলাম, সেই ভূমিকার প্রশংসাও কোনো কোনো বিদগ্ধ পাঠকের কাছ থেকে আমাকে শুনতে হয়েছে।

শরমিন নিশাত ও আমার সম্পাদনায় ২০০৭-এ বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র যাত্রা শুরু হয়। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার বিষয় ছিল 'দুর্নীতির মনতত্ত্ব'। উক্ত সংখ্যায় লেখক-গবেষক সলিমুল্লাহ খানের সঙ্গে মঈন চৌধুরীর একটি 'আলাপ' প্রকাশ হয়। মানুষ কেন দুর্নীতি করে, দুর্নীতি বিষয়টি আসলে কী, দুর্নীতি

ও সুনীতির পার্থক্যটাই-বা কী, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্নীতি কী-জিনিস ইত্যাদি বিষয়ে সে-আলাপে দার্শনিকভাবে নানা যুক্তি-তর্ক উঠে আসে। আলাপটি এই বইয়ে 'সংযুক্তি: দুই' শিরোনামে সংযুক্ত হল।

এ-বইয়ে 'সংযুক্তি : তিন' নামে যুক্ত হয়েছে আনু মুহাম্মদ-এর সঙ্গে মঈন চৌধুরীর আলাপ। আলাপের বিষয়, 'ফিল্যানথ্রপি: মোটিভ বিশ্লেষণ'। ২০০৮ সালের ২২ এপ্রিল এই আলাপটি 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে ধারণ করা হয় এবং হালখাতা'র ফিল্যানথ্রপি সংখ্যায় সেটি প্রকাশ হয়েছিল।

উল্লেখ্য, 'ফিল্যানথ্রপি' বিষয়টি হল, মানুষের নিঃশর্ত উপকার করা এবং এমনভাবে উপকার করা যাতে ডানহাত উপকার করলে বাঁ-হাতও জানতে না-পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে সমাজসেবা, মানবকল্যাণের নামে যে-বিদেশি অনুদাননির্ভর বিশাল অপকর্মযজ্ঞ, চুরি এমনকি ডাকাতিযজ্ঞ চলছে, এই অবস্থাকে উন্মোচন করবার উদ্দেশ্যেই 'ফিল্যানথ্রপি' সংখ্যাটি করা হয়েছিল। আনু মুহাম্মদ এবং মঈন চৌধুরীর এই আলাপের মধ্যদিয়ে ফিল্যানথ্রপির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন নতুন দিক উঠে আসে।

সাত.

সব মিলিয়ে মঈন চৌধুরীকে 'শতজীবী মেঘ নয়, মুহূর্তের সিংহ হয়ে বাঁচি'– এরকম স্রষ্টা মনে হবে না, হওয়ার কথাও নয়; কেননা মঈন ছাই দেখলেই উড়াইয়া দেখিতে চান ঠিকই কিন্তু তিনি অনীহ ছাইয়ের মধ্যে খুঁজে-পাওয়া কিছুকে ধারণ ও তা বাস্তবায়নে; বরং তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল খুঁজে-পাওয়া জিনিস যত গুরুত্বপূর্ণই হোক তাকে ফেলে রেখে পরবর্তী আবিষ্কারের জন্য বেরিয়ে পড়া।

দার্শনিক নিৎশের রূপকাশ্রিত একটি কাহিনী এরকম– 'হীরাকে একদিন জিজ্ঞেস করছে রান্নাঘরের কয়লা: কেন এত কঠিন তুমি? আমরা কি একই গোত্রের নই?' হীরা জবাবে বলে, 'আমিও তোমাকে জিজ্ঞেস করি ভাই, তুমি কেন এত নরম? তুমি কি তাহলে আমার ভাই নও? যদি সত্যি আমার ভাই হয়ে থাক তবে কেন এত অবনত, এত সমর্পণশীল? যদি নির্দয় না-হও তবে কীভাবে বিজয়ের উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে বেরোবে? কঠিনতায় যদি না-জ্বলে ওঠো, যদি শুধুই ভীত হয়ে নিজেকে পুড়তে দাও, কীভাবে সৃষ্টি করবে আমার সমান তালে? জেনে রাখো, স্রষ্টামাত্রই কঠিন। ভাই, ...এই তাহলে নতুন প্রত্যাদেশ জানাই তোমাকে, তুমি হয়ে ওঠো সত্যিকারের কঠিন।' ['এবং মুশায়েরা' পত্রিকা: নীৎশে সংখ্যা: শঙ্খ ঘোষ/ নীৎসে আর ইকবাল: পৃষ্ঠা: ৩] দর্শনের একজন অধ্যাপকের অনেক দর্শন সম্পর্কে মুখস্থবিদ্যা থাকতে পারে কিন্তু তিনি নিজে কোনো দর্শন ধারণ না-করলে তার ওই বিদ্যার্জন অর্থহীন। কাজেই যতই বলি, মঈন চৌধুরী তথাকথিত অধ্যাপকদের তুলনায় ভিন্ন কিন্তু সেই ভিন্নতা তখনই চাক্ষুষ হবে যখন সকল দর্শন, পথ-মত

সম্পর্কে জানার পর নিজের মত প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মাঠে নামবেন। সাধারণ মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে শুধু অক্ষর নয়, শব্দ নয়, ভাষা নয়, শুধু গ্রন্থ নয়– এ-সবেরই সঙ্গে মিলেমিশে যখন সব মানুষের মুক্তির আবাহন, মিত্র নির্বাচন আর শত্রুর দিকে নিজেকে কঠিন ক'রে ছুড়ে দেবেন তখনই একজন মঈন হয়ে উঠবেন প্রকৃত হীরা।

কিন্তু সমস্যা হল, এই রচনার শুরুতে আমি লিখেছিলাম, বিশেষ মতাদর্শের প্রতি মঈন চৌধুরীর একতরফা ঝোঁক নেই; ফলে বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যথেকে তাঁর ভালোলাগাটুকু তিনি গ্রহণ করেন বা ধারণ করেন। এই যে খণ্ড-খণ্ড, টুকরো-টুকরো আহরণ– এতে সমগ্রের ফল আসে না কিন্তু এ-কথাও তো ঠিক, এই খণ্ড আর টুকরো মিলেই সমগ্রের সৃষ্টি! সিদ্ধান্তে আসা চলে, মঈন চৌধুরী সমগ্রের ধারক না-হলেও সমগ্রের দিকেই তাঁর যাত্রা।...এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি বেশ খাটে, 'অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও অন্ধকার।' ['সঞ্চয়', আমার জগৎ]

গল্প

ছায়া ও কায়ার মায়া-বিস্তার

.....

অপূর্ব সাহা

বাতাসীর শরীরের গঠন বেশ অদ্ভুত। টিপিক্যাল বাঙালি নারীদের মতো নয়। সাধারণত গ্রিক দেবীদের দেহসৌষ্ঠব ভাস্করেরা যেভাবে ভাবে তার অনেকটাই কাছাকাছি। যেমন অতিমাত্রায় চিকন কোমর, মৃদু মাস্‌ল, উন্নত স্তন, গাঢ় ধূসর ত্বক, লম্বাটে কপোল, গাঢ় বাদামি রঙের দীর্ঘ চুল ইত্যাদি; কিন্তু এই তথ্যগুলো জানা নাই বাতাসীর; বাতাসী শুধু এই জানে সে আলাদা এক শরীরী গঠন নিয়ে জন্মেছে। সে মায়ের শরীর দেখেছে, বোন এবং বন্ধুদের শরীর দেখেছে; সব আলাদা, তার থেকে একেবারে আলাদা। তবে আলাদা হোক আর না হোক শরীর দেখতে তার ভালো লাগে। যেমন নিজেরটা, তেমন অন্যেরটা। ছোটবেলায় কলতলায় গোসল করার

সময় মায়ের শরীর দেখত সে; মায়ের সেই জিরজিরে নিষ্প্রাণ নিরস শরীরে ভালো লাগার মতো তো কিছু ছিল না; তবে কেন সে দেখত লোভীর মতো? উত্তর জানা নাই বাতাসীর।

একদিন পারুল আপা মানে বড় বোন— ভরা গাঙের মতো যৌবনবতী— ঘন-গভীর আমবাগানে অকস্মাৎ তার শরীর নিয়ে খেলেছিল; আপার ধনুকের ছিলার মতো টনটনে শরীরটা আজও চোখে গেঁথে আছে তার। বাতাসী তখন কিশোরী। সে কী ভালো লাগা!
কিন্তু আপা তো বাঁচেনি; বিয়ে হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে আপাকে। কী বীভৎস সেই পোড়া দেহটা; না, পোড়া দেহটা তার ভালো লাগেনি। একদম ভালো লাগেনি। দেহটা তো কাঁথার মতো করে অসংখ্য ফোঁড়ে সেলাই করা থাকে; আর সেই সেলাইয়ের একটামাত্র প্রধান গিট্টু থাকে যা সেলাইগুলোকে স্থিত করে রাখে; আগুনে পুড়ে গেলে দেহের সেই গিট্টুটা খুলে যায় আর সেলাইগুলো এলোপাতাড়ি আলগা হয়ে যেতে থাকে। অন্তত আপার শরীরটা দেখে বাতাসীর তাই মনে হয়েছিল।

কিন্তু টগর আপার ব্যাপারটা আলাদা। ওর গিট্টুটা খুলে যায়নি। ওর হয়েছিল কী— দেহসুতোগুলো পচে যেতে যেতে কমজোরি হতে হতে শেষমেষ বিশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছিল; একটা আরেকটার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ফলত দেহে কোনো বাঁক ছিল না, কোনো বাঁধ ছিল না, একটা আলুথালু অতিকায় মেঘখণ্ডের মতো দেহটা পড়ে ছিল উঠোনে। সেই কবে টগর আপা মানে তার মেজ-আপা পাচার হয়ে গেল। বিয়ের পরে পরেই। জনশ্রুতি আছে, স্বামীই তাকে মুম্বাই নিয়ে গিয়ে বেচে দিয়ে এসেছিল; শার্শা থানার লক্ষণপুর গ্রামে বিয়ে হয়েছিল আপার। পয়মন্ত সংসার ছিল, তবু কেন যে...পরে বুঝেছে বাতাসী সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে পাচার হয়ে যাওয়াটা ডাল-ভাতের মতো ব্যাপার। স্বামী স্ত্রীকে পাচার করে, বাপ মেয়েকে, ভাই বোনকে।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। মানুষ ভুলেই গিয়েছিল টগর আপাকে। টগরের স্বামী আক্কাস মোল্যা লোকদেখানো কান্নাও থামিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ এনজিও'র লোক এসে বলে, পাওয়া গেছে টগরকে, তবে বেঁচে নেই সে। কী করে পাওয়া গেল? মুম্বাইয়ের এক মানব-পাচার নিয়ে কাজ করা এনজিও একটা লালবাতি এলাকা থেকে মুমূর্ষু টগরকে উদ্ধার করে। ক্ষয়কাশে অর্ধেকটা ক্ষয়ে গেছে তখন। ফুসফুসে জমে গেছে অনেক জল। তারা তাদের নিজেদের আশ্রয়কেন্দ্রে টগরকে রেখে চিকিৎসাও করে, কিন্তু বাঁচাতে পারে না। মৃত টগর তখন পাসপোর্টহীন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী।

কিন্তু আদালত বলে, না, সে অপরাধী না, অপরাধের শিকার; তাকে দেশে প্রত্যাবাসন করা হোক। অবশেষে বাংলাদেশের একটা স্থানীয় এনজিও'র সহায়তায় টগরের লাশকে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়। দেহসুতোগুলো পচেগলে গেছে, দেহে কোনো বাঁক নেই, কোনো বাঁধ নেই, একটা আলুথালু অতিকায় মেঘখণ্ডের মতো নিথর দেহ; সর্বাঙ্গ অসৌন্দর্যে ভরা।

তবে সৌন্দর্য দেখেছে সে কানুর শরীরে। আফরোজা কানু। টগর আপার স্বামী আক্কাস মোল্যার দূরঃসম্পর্কের বোন। যশোর থেকে ঢাকায় এসে ওর কাছেই তো উঠেছিল প্রথম। দিনমজুর বাপটা সদ্য মারা গেছে তখন; ভাইরা খেতে-পরতে দিতে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করেছে। ওইরকম একটা ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে কানু তাকে আশ্রয় দেয় রাজধানী শহরে তার ডেরায়।

বস্তির একটা ঘরে একা থাকত কানু। বলত গার্মেন্টে চাকরি করে, কিন্তু আসলে যে কী করত জানে না বাতাসী। তবে টাকাপয়সার অভাব ছিল না তার। ভালো জামা-কাপড় পরত, দামি কসমেটিক্স ব্যবহার করত, পার্লারে চুল কাটাত। আর রাতে বাতাসীর শরীর নিয়ে খেলত। শরীরী প্রক্রিয়ায় যেতে ভালো লাগত না বাতাসীর, তবে কানুর নিরাবরণ দেহটা তাকে চুম্বকের মতো টানত। ডিম-লাইটের আলোয় কী অসম্ভব যে সুন্দর দেখাত। ঘুম ফেলে স্বপ্ন ফেলে খালি দেখতে ইচ্ছে করত। কিন্তু পিষ্ট হতে ভালো লাগত না, দম বন্ধ হয়ে আসত। ভয় ও ঈপ্সা। এই দুটো জিনিস তাকে এতটাই উতলা করে তুলত যে সে বাসাবাড়িতে কাজ করতে গিয়ে কাচের গ্লাস ভেঙে ফেলত, চুলা বন্ধ করতে ভুলে যেত। ভালো লাগছিল না ঐ ভালো-লাগা আর মন্দ লাগার দ্বৈরথ। তাই বুঝি পালানোর জন্য অনেকটা তড়িঘড়ি করে সে আলী আকবরকে বিয়ে করে ফেলল!

রিক্সাচালক আলী আকবর পরিশেষে তাকে এই বস্তিতে এনে ফেলে। পলাশীর বস্তি। গমগমে বস্তি; জীবন আর নোংরা মিলিয়ে এক জমাটি উৎসব। কিন্তু দেহ নাই। বাতাসীর নিজস্ব জীবনে দেহের জায়গায় দেহ-আকৃতির কতিপয় শূন্যতা। না নিজের দেহ, না আলী আকবরের দেহ। কী ব্যাপক শূন্য অন্ধকার, কী বীভৎস দেহহীনতা। নিজেকে দেখার কোনো নিজস্ব জায়গা নেই এখানে। শরীরী প্রতিবিম্ব ফেলার কোনো একান্ত আয়না নেই এখানে, কোনো ফুসরত নেই। আর বিয়ের আগে দেখা সেই ক্ষিপ্র, দুরন্ত আলী আকবর বিয়ের পর কেমন দেখতে দেখতে দেহহীন হয়ে গেল। রক্তহীন মাংসহীন হাত দিয়ে সে বাতাসীকে ধরে, ছোঁয়াছেনা করে...আরো কী কী করে...একটা শিশুও জন্ম নেয়। কিন্তু তারপর আর হাতটাও থাকে না। দুটো হাতের

জায়গায় ঝুল ঝুল করে ঝুলতে থাকে শীর্ণ অন্ধকার। শিশুর বয়স আট মাস। এই আট মাসে আলী আকবর একেবারে শূন্য হয়ে গেছে।

আর দেখ-না, চারদিকের পৃথিবীটাও কেমন আগাপাশতলা হাট হয়ে গেল! শুধু বেচাকেনা। কেউ হাঁকছে দাম, কেউ কিনছে পণ্য। সেই দামের কোনো গাছপাথর নাই; পণ্য তৈরি হচ্ছে আর হাটের ভেতর ঢুকে অগ্নিশর্মা হয়ে ফুঁসছে টগবগ করে। আগুনে হাত দেবে বলে মানুষ সর্বস্ব খরচ করে লোহার হস্তবর্ম কিনছে। কিন্তু সবাই না। তাহলে কী করে তারা তাদের হাত বাঁচাবে, শরীর বাঁচাবে পণ্যের ঝাঁঝ থেকে? শরীর তো কোনো ধারণা না, বস্তু। তার খাদ্য লাগে। তবেই তো তার সৌন্দর্য ফোটে। ফুলের মতো একটু একটু করে ফোটে; গাঁদাফুলকে কি মরুভূমিতে ফোটানো যায়?
অথচ দেখ, জ্বরের ঘোরে কন্যাশিশুটা থেকে থেকে কঁকিয়ে উঠছে। ওর খাদ্য নাই, ওষুধ নাই। এক সপ্তাহ ধরে জ্বর। এনজিওরা এই বস্তিতে ফ্রিতে কনডম দেয় আরো কী কী সব দেয়, কিন্তু রোগের ওষুধ দেয় না। আজ একজন আপাকে বলেছিল বাতাসী, আমার মায়েটারে একটু দ্যাখেন না, আপা।
কী হয়েছে ওর?
জ্বর।
আমরা তো জ্বর নিয়ে কাজ করি না।
কী নিয়ে কাজ করেন আপনারা?
এইচআইভি এইডস।
ও।
তুমি টেস্ট করিয়েছ? মেয়ের জ্বর তো ভালো কথা না। তোমার এইচআইভি থাকলে সেটা সন্তানের মধ্যেও যেতে পারে। আমাদের ভিসিটি সেন্টার আছে, কালই সেখানে আসো। টেস্ট করাও।
সেই থেকে মেজাজটা খিঁচে আছে। মেয়েটার হপ্তা ধরে জ্বর। ভালো একজন ডাক্তার দেখানো দরকার। পয়সা নাই।
এখন নিশ্চয় অনেক রাত। ক'টা বাজে? ঘড়ি নাই।
কে যায়?
আমি কুদ্দুস।
কুদ্দুস সম্ভবত এ বস্তির একমাত্র ঘড়িধারী ব্যক্তি। ভালোই হল। সময়টা জানা যাবে।
কয়ডা বাজে ভাই?
সোয়াদশ।

কুদ্দুস গির্জার ঘণ্টাধ্বনির মতো সময় নির্দেশ করে হারিয়ে যায়। আর তারপরই একটা ছায়া বিস্তৃত হতে শুরু করে ঘরের দরজায়। শীর্ণ ছায়া; ছায়া এবং কায়ার মাঝে মূলত কোনো তফাৎ নাই। ধীরে ধীরে কায়া স্পষ্ট হয়। আজ কায়াটাকে বড় বেশি ভঙ্গুর মনে হচ্ছে, যেন ভেতরে ঘুণের বাসা, আলতো আঘাতেই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে।

আলী আকবরের একটা খুব কঠিন অসুখ হয়েছে। অসুখটা যে কী জানে না বাতাসী তবে স্বরূপটা বোঝে। বুঝেছে কিছুদিন হল। ফাতেমার জন্মের পর থেকে এই ক'মাস সে বাতাসীর শরীরের ধারেকাছে ঘেঁষেনি; কেন? কারণ খুঁজতে খুজতে অবশেষে সেদিন একটা ইঙ্গিত পেয়ে গেছে বাতাসী। বাথরুমে প্রশ্রাব করতে ঢুকেছিল আলী আকবর; পাশেই টিপকলে কাপড় ধুচ্ছিল বাতাসী। হঠাৎ একটা জান্তব চিৎকার করে আলী আকবরকে লুঙ্গিসমেত পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে শেয়ালের কামড়-খাওয়া কুত্তার মতো ধেয়ে বের হতে দেখা যায়। তারপর ঘরে ঢুকে যন্ত্রণায় কঁকাতে থাকে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বাতাসীও ঢুকে পড়ে ঘরে।

তোমার কী হইছে?

আমার কিছু হয় নাই। পচা মরিচের মতো নিজের ঝাঁঝে নিজেই কাতর আলী আকবর।

তাইলে এত্ব এত্ব ওষুধ খাও ক্যান? মঘা ইউনানির গাদা গাদা দাওয়াই নজর এড়াতে পারেনি বাতাসীর। জংধরা তোবড়ানো ট্রাঙ্কের মধ্যে তাদের নিঃশব্দ বসবাস।

জলের ছিটে পাওয়া আগুনে তেঁতে ওঠা কড়াইয়ের মতো ছ্যাঁৎ করে উঠে আলী আকবর উত্তর দেয়, খাবো। যত খুশি খাব। তোর বাপের টাকায় খাই? তুই মুখ বন্ধ রাখ।

মুখতো বন্ধ রাখা যায় সহজে; কিন্তু মন কি বন্ধ রাখা যায়? বন্ধ রাখা যায় চৈতন্যের প্রবাহ? এ বস্তির উত্তর কোণার অধিবাসী গোলাপী সব শুনে বলেছিল, আলী আকবরের সিফিলিস হয়েছে; মরণব্যাধি। ডাক্তার দেখা নাইলে তুই-ও গেছিস!

বাতাসী এখন কোল থেকে জ্বরদগ্ধ ফাতেমাকে বিছানার উপর নামিয়ে দিয়ে, একটা বালিশের কঙ্কাল তার মাথার তলে গুঁজে দিতে গেলে একরত্তি বাচ্চাটা ওয়াও-ও-ও-ও-ও করে কেঁদে ওঠে। কাঁদুক। স্বামী এবং নিজের মাঝখানের শূন্যতায় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঝুলিয়ে দেয় সে। প্রশ্নটা ঝুলেই থাকে। আর সেই প্রশ্নের নিচে বাচ্চাটার দেহখানা একটা অলৌকিক আলো বিচ্ছুরণ করতে শুরু করে। সে আলোর রং আলাদা, আমাদের পৃথিবীর আলোর রঙের মতো নয়। অন্য পৃথিবীর আলো। আলোর তরঙ্গগুলো কেঁপে কেঁপে কিছু একটা বলতে চায়। বাতাসী কথাগুলো

বোঝার চেষ্টা করে। কী বলে ঐ মাসুম আলো? ...যখন আমি ভিন্ন পৃথিবী থেকে পরিস্ফুট হতে শুরু করেছি, বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছি, পৃথিবীর আলোর সাথে ঐক্য গড়তে শুরু করেছি, তখন তোমরা আমায় মৃত্যুদণ্ড দিতে চাও? তোমরা তোমাদের জীবনের প্রয়োজনে আমাকে বপন করেছ, জীবনের অপ্রয়োজনে তাকে বিনষ্ট করা কি ইনসাফ হবে?

আলী আকবর তৃতীয় পৃথিবীর মানুষ, সেই আলোকে—আলোর তরঙ্গায়িত কথাগুলোকে পাত্তা না-দিয়ে তেরচাভাবে হেঁটে যায় ঘরের অন্য কোণে, যেখানে মাটির কলসিতে পানি রাখা আছে। একটা মেলামাইনের রংচটা গাসে একাই পানি ঢালে। একাই খায়। যেন মুসাফির। একা পৃথিবীতে এসেছে, একাই ফিরে যাবে।
ওষুধপত্তর কিছু আনলে?
ফাতেমা কান্না থামায়; অলৌকিক আলোর বিকিরণও থেমে যায়।
আলী আকবর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দৃষ্টির মরাতাপে বাতাসীকে ভস্ম করে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে, ওষুধ কি গাছে ধরে? নাকি আকাশ দিয়া পড়ে? এহন থিক্যা খাওন বন্ধ, ওষুধ তো মেলা দূর...আমি আর কাম করবার পারুম না।

মাসকয়েক হল, আলী আকবর সম্ভবত— সম্ভবত কেন নিশ্চিত রিক্সা চালানোর কাজটা হারিয়েছে। হারানোরই কথা। শরীর প্রতিবাদ জানিয়েছে না? এখন সম্ভবত সে ভিক্ষা করে, আর ভিক্ষার টাকা দিয়ে গাঁজা-চরস এইসব খায়। খাবেই তো। বিদায়ী শরীরের শোক ভোলার আর উপায় কী?
ক্যান কাজ করতি পারবা না?
আমার শইলে ব্যাধি। এই প্রথমবার সে স্বীকার করে। যেন আমি অপরাধ করেছি এই যে আমাকে ধর, মারো, বিচার কর, জেল-ফাঁসি যা ইচ্ছা দাও। আমার আর প্রতিরোধের শক্তি নাই।
দড়িছেঁড়া বালতির মতো অতল কূপের অন্ধকার গহ্বরে পড়ে যেতে যেতে বাতাসী বলে, এ্যাখন কী হবে?
কী হবে?
কী হবে?
আমি তো শ্যাষ।

কী করব আমি? প্রশ্ন বাতাসীর। যদিও যা করে বাতাসীই করে। চারটা বাসায় বুয়ার কাজ করে মাসে প্রায় তিন হাজার টাকা রোজগার করছে। কিন্তু কী হয় ওতে? এই ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো একটা ঘরের ভাড়া দিতেই তো অর্ধেকটা চলে যায়। আর তিনটা পেটের আধার? হয় না, হয় না।

বাতাসীর প্রশ্নের উত্তর দেয় আলী আকবর— ক্লান্তি উষ্মা, দ্বেষ, জীবন-বিতৃষ্ণা সব মিলেমিশে তার বাকযন্ত্রে আর্তনাদ করে ওঠে একটা শ্বাপদ: নাইট কর। ওই গতরের কী দাম আছে অ্যা? ঘরে বসে গতরের পাব্বন করে কী লাভ হবেরে? তোর গতর সুন্দর মানি। খাওন না দিলে ওই গতর চিরে চিমসে হবে...

এবার মৃত্যু ঘটে বাতাসীর। নিষ্প্রাণ পড়ে থাকে দেহটা। ফাতেমার পাশে। অনেকক্ষণ। যেন একটা যুগ। যেন একটা শতাব্দী, যেন একটা কাল, মহাকাল...তারপর ফের প্রাণ পায় দেহটা। নড়ে ওঠে। শুরু হয় আলোর বিচ্ছুরণ। অন্য রঙের অন্য পৃথিবীর আলো।
টুংকি আর গোলাপিদের সাথে নাইট করতে বের হয় বাতাসী। রূপের যেন বান ডেকে গেছে শরীরে; রূপ না থাকলে রূপজীবিনী হবে কেমনে?
টুংকি বলে, বাতাসীরে আইজ বাতাসের মতোই লাগছে, কেমন পলকা, শোলার মতো, সোন্দর। হাত দিলেই ভাইঙ্গা যাবে।
বাতাসী বলে, হ। আমি আজ নতুন হাওয়া।
গোলাপি বলে, হাওয়া? আমি তো জানি হাওয়া হচ্ছে পৃথিবীর পরথম মাইয়া-মানুষ।
বাতাসী বলে, হুম। পৃথিবীর শেষ মাইয়া-মানুষও ওই হাওয়াই।
তারপর ওরা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের রাজধানী নামক হাটের ভেতর। মুক্ত বাজারের ভেতর ওরা ছিটিয়ে পড়ে। বড় চাঁদ উঠেছে আকাশে, অনেক জোছনা রাস্তায়, অলিতে-গলিতে।
দোয়েল চত্বরে দুজন যুবকের মুখোমুখি হয় বাতাসী।
তোমার রেট?
তুমরা দু'জন?
হ্যাঁ।
কোথায় নিয়ে যাবা তুমরা?
তোপখানা রোড।
সারারাত?
হুম।
পনেরোশ' টাকা লাগবে।
পাবে।

হাত বাড়ায় বাতাসী। একটি ছেলে পকেট থেকে ৫০০ টাকার একটি নোট বের করে বাতাসীর হাতে দিলে তার মনে হয় হাতের ভেতর একটা গুলিভরতি সাব-মেশিনগান এসে গেছে; শরীর ব্যেপে সন্তরণ করতে শুরু করে একটা ধাতব শক্তি।
বাকিডা?

সকালে পাবে।

বিশ্বাস করে বাতাসী। ছেলে দু'জন উচ্ছৃঙ্খল নয়, আর দেখে বোঝা যায় ধনবান। টাকা নিয়ে খ্যাচরামি করবে না। শক্তি সঞ্চালনের ধারায় যোগ হয় সুখ-প্রবাহ। ফাতেমাকে সে কালই একজন ভালো ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে। জোছনা আর সোডিয়াম আক্রান্ত রাস্তায়, একটা নষ্ট-ভ্রষ্ট দৃশ্যপটে, একটা নিরাপত্তাবোধের চাপবলয়ের ভেতর বাতাসী শরীরে এক অব্যাখ্যাত অনুভূতি বোধ করে। ডাস্টবিনের জঞ্জালের মধ্যে সোনার মাকড়ি খুঁজে পাওয়ার মতো এক অনুভূতি।

ওরা থেমে থাকা গাড়িতে উঠে পড়ে। যুবকদ্বয় বসেছে পেছনের সিটে, তাকে বসতে দিয়েছে সামনে চালকের পাশে। ইচ্ছে করলে দু'জনের মাঝখানে বসিয়ে তাকে তারা মথিত করতে পারত; কেননা বিক্রিত পণ্যের উপর বিক্রেতার আর কোনো অধিকার থাকে না। কিন্তু তা করেনি। পুলকিত হয় বাতাসী। যুবকদ্বয় অদ্ভুত; দু'জনেররই মেয়েদের মতো লম্বাচুল। পরনে জিন্স আর লম্বা ফতুয়া। দুজনেরই দীর্ঘ পেটানো শরীর।

গাড়ি গিয়ে থামে তোপখানা রোডে একটা হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের সামনে। ওরা লিফটে অনেক উপরে উঠে যায়। চাবি দিয়ে একটা ফ্লাটের লক খুলে ভেতরে ঢোকে। আর কেউ নেই। শুনশান বাসা। উচ্চবিত্তীয় আসবাবে ভরতি। বাতাসী ভাবে, যুবকদ্বয়ের একজন এ বাসার ছেলে, অন্যজন তার বন্ধু। বাসার অন্য সদস্যরা হয়তো বিদেশ বা অন্য কোথাও ট্যুরে গেছে। সেই ফাঁকে বখাটে ছেলে তার বন্ধুকে নিয়ে মৌজ করছে। কিন্তু যুবক দু'জনের চোখদুটো অদ্ভুত। লাল লাল, কেমন নেশা ধরা। উদাসীন। এরা কারা? বাতাসীর চেনা ভুবনের মানুষ এরা নয়; মনে হয় অন্য ভুবনের মানুষ।
যুবকদের একজন অন্যজনকে বলে, চল্ কিছু খেয়ে নিই।
চল্। উত্তর দেয় অন্যজন। বাতাসীর দিকে ফিরে সে বলে, তুমিও চল।
এতক্ষণে ক্ষিধেটা টের পায় বাতাসী। ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে।
খুব খায় ওরা তিনজন। আর এই ভোজনপর্বে বাতাসী ওদের দু'জনের বেশ কাছাকাছি চলে আসে।
একজন বলে, আমার নাম চারু। বেশ অদ্ভুত নাম। কখনও শোনেনি বাতাসী।
অন্যজন বলে, আমি সব্যসাচী। এ নাম আরো অদ্ভুত!
তুমি?
বাতাসী।
তুমি আমাদের আসল নাম বলতে পারো। আমরা অন্য কাস্টমারদের মতো না।

আমি আসল নামই বলিছি।
ও।

ওরা খাওয়া শেষ করে একটা ঘরে এসে ঢোকে। এটা কারো শোবার ঘর। পরিপাটি বিছানা। বিছানার উল্টো দিকে বিশাল সাইজের একটা ড্রেসিংটেবিল। এত স্বচ্ছ আয়না কখনও দেখেনি বাতাসী। ঘরের অন্যপাশে একটা খোলা জানালা। গ্লাস একদিকে সরানো, পর্দাটাও ওঠানো। হু হু করে বাতাস ঢুকছে ঘরে। বাতাসের বেগ দেখে বাতাসীর মনে হয় এটা বারো কিংবা চোদ্দতলা হবে।

ওদের একজন বলে, তুমি বিছানার উপর উঠে বস। বাতাসী নির্দেশমতো বসে। খাটে পা ঝুলিয়ে। আয়নায় চোখ পড়ে; আয়নার প্রতিবিম্বে ওটা কে? তুই তো অনেক সুন্দর রে বাতাসী। তুই তো সেই গ্রামে দেখা সরস্বতীর প্রতিমার মতো সুন্দর।
যুবকদ্বয় ফ্লোরের উপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। একজন ফতুয়ার পকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে সামনে রাখে। বাতাসী জানে ও দুটোতে গাঁজা পুরা আছে।
অন্যজন বলে, তুমি তোমার পোশাকগুলো খুলে ফেল।
বাতাসী কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো বসে থাকে। কী করবে? কিছুতো করার নাই। ওর শরীরতো এখন বিক্রি হয়ে যাওয়া পণ্য। বিক্রি হয়ে যাওয়া পণ্য, এটা মনে হতেই আড়ষ্টতা কেটে যেতে শুরু করে। ওইরকম স্বচ্ছ আয়নায় নিজেকে অনাবৃত দেখার লোভ বিস্তার লাভ করতে শুরু করে।

তারপর সে কম্পিত হাতে একটা একটা করে আবরণ উন্মোচন করে। আয়নায় তাকিয়ে দেখে, অপরূপ অপরূপ! এই রকম একটা শরীরী-সম্পদ সে অবহেলা করে নষ্ট করে ফেলছে! খাদ্যের অভাবে ভুগিয়ে ভুগিয়ে চিড়ে-চিমসে করে ফেলছে? এ তো অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়।
খাটের উপর পা ঝুলিয়ে নগ্ন বসে থাকে বাতাসী প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে। নিজের সৌন্দর্যে নিজেই জ্বলেপুড়ে যেতে যেতে। যুবক দু'জন ফ্লোরে বসে স্টিক ধরিয়ে টানছে আর ওকে দেখছে মাঝে মাঝে। অদ্ভুত তো!
আচ্ছা তোমরা কে গো? তোমরা কী কর?
একজন বলে, আমি শিল্পী। ছবি আঁকি।
অন্যজন বলে, আমি ভাস্কর। মূর্তি বানাই।
প্রথমজন বলে, তুমি ওভাবেই বসে থাকো। আমরা তোমাকে ছোঁব না।
অন্যজন বলে, আমরা রাতভ'র তোমাকে দেখব।
বাতাসী বলে, আজব তো! আমারে শুধাই এই জন্যি টাকা দিবা?

হুম ।

আমারে কী দেখবা?
একজন উত্তর দেয়, তোমারে না, তোমার শরীরটা দেখব শুধু ।
অন্যজন বলে, না না । শরীরের ভেতর দিয়ে তোমাকেও দেখব ।
একজন বলে, ঠিক দেখব না । পাঠ করব । পাঠ করা বোঝ? মানে পড়া । মানুষ যেমন বই পড়ে, আমরা তোমার শরীর তেমন করে পড়ব ।
অন্যজন বলে, তুমি কি জানো যে তুমি একটা অসম্ভব সুন্দর শরীরের মালিক?
বাতাসী মিথ্যে বলে, না জানিনে । তোমরা ভারী কঠিন মানুষ । কঠিন কথা কও ।
বাতাসী বলে আর অসম্ভব এক আনন্দে ভেসে যেতে থাকে ।

একজন বলে, না আমরা খুব সহজ মানুষ । জটিল জিনিসকে সহজ করে প্রকাশ করার জন্য তোমার সাহায্য নিচ্ছি । অন্যায় করছি, পাপ করছি । সহজ মানুষেরা সহজে পাপ করে ।
আর ঠিক তখন বিদ্যুৎ চলে যায় । ঘন অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরে । অন্ধকারে তিনটি অনঢ় শরীর, নিস্তব্ধ । কয়েক সেকেন্ড, তারপরই চুই চুই করে জোছনা ঢুকতে শুরু করে জানালা দিয়ে । তারপর হু হু করে ঢুকে পড়ে জোছনা । বাতাসী তাকায় আয়নায় । একটা ভাস্কর্য; অর্ধেক নারীমূর্তি । একফালি মুখমণ্ডল । একটি স্তন । অর্ধেকটা কোমরের বাঁক ।
যুবক দু'জনের কেউ একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে । মাই গড! মাই গড! এই রকম একটা ভাস্কর্যের স্বপ্ন দেখছি সেই জন্মের পর থেকে...

গল্প পাঠের অনুভূতি

.....

জাকির তালুকদার

গল্পলেখকের নাম আমাকে জানানো হয়নি। গোলাঘর-এর এটাই বিশিষ্টতা। লেখকের নাম নয়, শুধু গল্পই বিবেচ্য।

গল্পের শুরুটা যথেষ্ট স্মার্ট। আহ্বান করে পাঠককে। এগিয়ে যাওয়ার গতি মোটামুটি সরলরৈখিকই বলা চলে। তবে মনস্তাত্ত্বিক মোচড় রয়েছে। শরীরকেন্দ্রীক, আরও নির্দিষ্ট করে বললে, নারীশরীরকেন্দ্রীক মনস্তাত্ত্বিক গল্প। গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়ের শরীর নিয়ে বিড়ম্বনার গল্প অসংখ্য রয়েছে বাংলাসাহিত্যে। সেগুলোর চর্বিতচর্বনে পরিণত হওয়ার যথেষ্ট আশংকা থেকে যায় একই বিষয় নিয়ে আবার গল্প লিখতে বসলে; সেক্ষেত্রে এই গল্পটি ব্যতিক্রম হবার চেষ্টা করেছে শুরু থেকেই। এখানে বাতাসীর নিজের টান নারীশরীরের দিকে। নিজে নারী হলেও নারীশরীরের সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য দেখাই তার অবচেতনের সৌন্দর্যচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। লেখক এই বিষয়টিকে কোনো ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেননি। এবং এই ব্যাখ্যার অনুপস্থিতি গল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলে মনে হয় না। সেটি লেখকের শক্তির পরিচয়। আমিও আখ্যান নিয়ে কোনো বিশেষণের প্রয়োজন দেখি না, কারণ সেটি পাঠক নিজেই পাঠ করে নেবেন। আমার মতে, লেখককে যেদিকে আরো দৃষ্টি দিতে হবে, তা হচ্ছে ভাষার শক্তির অনুশীলন। আমাদের বেশিরভাগ লেখকের কাছে ভাষা হচ্ছে টেক্সট-এর বাহন। কিন্তু ভাষা নিজেও একটি টেক্সট-এ পরিণত হয় শক্তিমান কথাশিল্পীর হাতে। সর্বোপরি বলা যায় অনেকদিন পরে একটি উত্তরআধুনিক গল্প পাঠের স্বাদ পাওয়া গেল এই গল্পটির মাধ্যমে।

মন্তব্য: এই গল্পটি যদি আমাদের সমসাময়িক বা অগ্রজ গল্পকারের লেখা হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে তার গল্পনির্মাণশক্তির অবনতি হয়েছে। আর যদি কোনো নতুন লেখকের লেখা হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে তিনি যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল।

ভারতীয় শিল্পাদর্শ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

ভারতশিল্প কোনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তদবিষয়ে এখনও কেহ কোনরূপ সর্ববাদি-সম্মত স্থির সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে পারেন নাই। তাহার সকল কথাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা। তাহা এখনও যথাযোগ্যরূপে লিখিত হইতে পারে না। এখনও উপকরণ-সংগ্রহের সকল চেষ্টা আরব্ধ ও পরিসমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, বর্তমান অবস্থায়, ভারতীয় শিল্প প্রতিভা-বিকাশের প্রকৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইবার আশা করা যাইতে পারে না। সম্প্রতি অধ্যাপক হাভেল আবার একখানি গ্রন্থ[১] প্রকাশিত করিয়াছেন। এ বিষয়ের যত অধিক আলোচনা হইবে, ততই সত্যনির্ণয়ের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। সুতরাং এরূপ উদ্যম সংবর্ধনা লাভের যোগ্য। আরও একটি কারণে ইহা অধিক সংবর্ধনা-লাভের যোগ্য। যাহা আমাদের কর্তব্য, তাহা একজন ভিন্ন দেশের লেখক করিতেছেন; আমরা আমাদের নিজের দেশের কথাও তাঁহার প্রসাদে অধ্যয়ন করিতেছি।

উদ্দেশ্য সাধু। উদ্যম প্রশংসনীয়। গ্রন্থখানির আদ্যন্ত সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ। কোনও কোনও পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের গ্রন্থে কেবল ভারতশিল্পের নিন্দাবাদ। ইহাতে তৎপরিবর্তে প্রশংসাবাদ। সুতরাং এরূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আগ্রহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার সকল কথা ইতিহাসের কথা বলিয়া মানিয়া লইবার উপায় নাই। সুতরাং ইহাতেও অভাবপূরণ হইল না। তথাপি, ইহাতে ভাবিবার কথার অভাব নাই।

গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তগুলি যে মূলভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তাহা সর্ববাদি-সম্মত না হইলেও, গ্রন্থকারের পক্ষে দৃঢ় ভিত্তি। তিনি যেরূপ দৃষ্টিতে ভারতশিল্পকে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাহাই তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের দৃঢ় ভিত্তি। সে দৃষ্টি কবিত্বপূর্ণ-উদারতাপূর্ণ-সৌন্দর্য লোলুপতাপূর্ণ। তাহা সকল সময়ে ঐতিহাসিক গবেষণার শুষ্কপদ্ধতির অনুসরণ করিতে সম্মত না হইলেও, স্থান-কাল-পাত্রের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া, ভারত শিল্প-প্রতিভার মূল প্রস্রবণের সন্ধান-লাভের জন্যই লালায়িত।

ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যের যে সকল লুপ্তাবশিষ্ট গ্রন্থ বর্তমান আছে, তাহার প্রতি সে দৃষ্টি এখনও যথাযোগ্যভাবে নিপতিত হয় নাই। বরং একদিকে যেমন পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের বহুবর্ষব্যাপী অনুসন্ধানে লব্ধ নানা সিদ্ধান্ত অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, অন্য দিকেও, সেইরূপ অবলীলাক্রমেই ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্য-নিহিত শিল্প-বিবরণের প্রতি অনাদর প্রকাশিত হইয়াছে।[২] তথাপি এরূপ গ্রন্থ উপাদেয়। কারণ, গ্রন্থকারের ভক্তি শ্রদ্ধা ও রচনা-প্রতিভা ইহাকে বিচার-বিতণ্ডার শুষ্কক্ষেত্র হইতে দূরে সংস্থাপিত করিয়া, বক্তব্যবিষয়কে কাব্যের ন্যায় মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। বুঝিবার চেষ্টাকে পরাহত করিয়া, বুঝাইবার চেষ্টাই সকলের উপর তাহার উচ্চ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এমনকি যে সকল দুরূহ তত্ত্ব অনির্বচনীয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহাও যেন গ্রন্থকারের প্রতিভা-স্পর্শে সরলতা লাভ করিয়া, সকল সমস্যারই বিশদ ব্যাখা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এরূপ চেষ্টা সকল স্থলে সর্বাংশে সফল হইতে পারে না বলিয়াই, সফল হইতে পারে নাই। তাহাতে গ্রন্থের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ অনেকদিনের সভ্যদেশ। বেদ ও উপনিষৎ তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন। কিন্তু শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কালের একখানিও চিত্র বা প্রতিমা বর্তমান নাই। এই ঐতিহাসিক বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের নিজের কোনোরূপ শিল্পাদর্শ বর্তমান থাকিলে, তাহা সভ্যতা-বিকাশের প্রথম প্রভাত হইতে বিকশিত হইয়া উঠিত ; তাহাতে এতকাল-বিলম্ব সংঘটিত হইতে পারিত না। কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই, ভারত-শিল্পকে পরানুকরণ-লব্ধ বলিয়াও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষ যেমন অনেক দিনের সভ্যদেশ, তাহার পুরাকীর্তির অতি পুরাতন নিদর্শনও সেইরূপ অনেক মাটির নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উপরে উপরে, দশ বিশ হাত, মাটি আঁচড়াইয়া, অতি পুরাতন কীর্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়াই, 'ছিল না' বলিবার উপায় নাই। অধ্যাপক হাভেল স্পষ্টাক্ষরে ইহার উল্লেখ করিয়াও, মানিয়া লইয়াছেন– ভারতশিল্প চিত্রে ও প্রতিমায় বিকশিত হইয়া উঠিতে সত্য সত্যই কিছু বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছিল! তিনি এই কথাটি একটি ঐতিহাসিক কথা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন কেন, তদবিষয়ের কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই।

এই কথাটি মানিয়া লইয়া, ইহাকেই অধ্যাপক হাভেল তাঁহার অভিনব গ্রন্থের মূল-সূত্র-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই মূল-সূত্র বিচারসহ না হইলে, গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, ইহাকে একটি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াই, তাহার কারণ পরম্পরার আবিষ্কার-সাধনের চেষ্টা করিতে গিয়া, অধ্যাপক হাভেলের প্রতিভা যে সকল কারণের অবতারণা করিয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য। তাহা এইরূপ।–

বিলম্ব ঘটিয়াছিল সত্য। কিন্তু তাহার যথাযোগ্য কারণ পরম্পরার অভাব ছিল না। সে কারণকে 'অজ্ঞতা' না বলিয়া 'বিজ্ঞতা' বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, অতি পুরাকালের আর্যসমাজ, অনার্য-সংস্পর্শ-পরিহার কামনায়, সকল প্রকার জ্ঞানগৌরবই নিতান্ত সংগোপনে রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল ; আর্যেতর জনসমাজের সংস্পর্শে তাহা যাহাতে কিছুমাত্র কলুষিত হইতে না পারে, তজ্জন্য যথাসাধ্য আত্মগোপন করিয়াছিল। সুতরাং শিল্প-প্রতিভা বিকশিত হইতে বিলম্ব ঘটিবারই কথা।

ইহার প্রমাণ, প্রধান প্রমাণ, গ্রন্থোক্ত একমাত্র প্রমাণ লিপিতত্ত্ব। লিপিকৌশল কোনওক্রমে আয়ত্ত করিবামাত্র, অন্যান্য সভ্যসমাজ তাড়াতাড়ি তাহাদের গভীর চিন্তাপ্রসূত সাধনলব্ধ পরমতত্ত্ব নিয়ে অবলীলাক্রমে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্যসমাজ সেরূপ অশোভন ব্যগ্রতা প্রকাশে বিলক্ষণ ইতস্তত করিয়াছিল ; সাধনলব্ধ পরমতত্ত্ব নিয়ে সহসা লিপিতে, চিত্রপটে, বা ভাস্কর্যে অভিব্যক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশিত করিতে পারে নাই। তাহাদের সম্মুখে বাধাবিপত্তির অভাব ছিল না। তাহাতেই, মর্যাদাহানির আশঙ্কায় তাহাদিগকে সাবধান হইতে হইয়াছিল। তখনকার আর্য-অনার্য-সমাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বর্তমান ছিল। সুতরাং, অনার্য-সংস্পর্শ-পরিহার-কামনায়, তখনকার আর্য সমাজকে দূরে দূরে,- আত্মসমাজের অভ্যন্তরে,- সর্বথা আত্মনিষ্ঠ হইয়াই বাস করিতে হইয়াছিল।

তাহাদের মানসপটে যে চিরসুন্দরের দিব্যজ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত না, তাহা নহে। তাহারা তাহাকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য লিপির, চিত্রের, অথবা ভাস্কর্যের শরণাপন্ন হইতে সম্মত না হইয়া, নিভৃত হৃদয়-মন্দিরে তাহার পূজা করিয়াই কৃত কৃতার্থ হইত। সেই জন্য তাহাদের সে কালের শিল্পপ্রতিভার আদি প্রস্রবণ, সেই চিরসুন্দরই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

যাহারা মানবসভ্যতার আদিযুগে সেই চিরসুন্দরকে দেখিয়াছে, চিনিয়াছে, উপভোগ করিয়াছে, তাহার সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভেদতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জড় ও জীবের মধ্যেও ঐক্য বন্ধনের সন্ধানলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহারাই তো মানব-সমাজের অকৃত্রিম আদি শিল্পী। তখন পৃথিবীর অন্যান্য জনপদ অজ্ঞানান্ধকার আচ্ছন্ন থাকিয়া, নীরবে অগৌরবে কালযাপন করিত।

এই কবিত্বপূর্ণ আলেখ্য শিল্পশিক্ষকের পদোচিত-প্রতিভাব্যঞ্জক তুলিকার বিন্যাসে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, ইহা সুন্দর। ইহা ইতিহাস হইলে, মানবজাতির ইতিহাসের অত্যুজ্জ্বল রত্নমুকুট।

তথাপি ইহাকে ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতে সাহস হয় না। যাহারা চিরসুন্দরের সন্ধান লাভ করে, তাহারা কি আত্ম-গোপন করিতে পারে?

সেকালের ভারতীয় আর্যসমাজ কি সত্য সত্যই আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিত? তখনকার অনার্য-সমাজ নিবিড় বনানীর অভ্যন্তরে, আর্যসমাজ হইতে

বহুদূরে, ভয়ে ভয়ে আত্মগোপন করিয়া বাস করিত, সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই পরাভূত হইত। আর্যসমাজ কি তাহাদিগের সংস্পর্শ-শঙ্কায়, মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বিমর্দিত করিয়া, নীরবে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল?

যাগযজ্ঞ ছিল, উৎসব আনন্দ ছিল, নৃত্যগীত ছিল, তারস্বরে মন্ত্রবাচন করিবার প্রথাও প্রয়োজন ছিল, রাজধানী, রাজদুর্গ, রাজপ্রাসাদ ছিল, হৃদয়ে সাহস, বাহুযুগলে অমিত বল, লোকজয়ে অপরাজিত উৎসাহ বর্তমান ছিল। কেবল কি চিত্রে, বা ভাস্কর্যে পরমতত্ত্ব অভিব্যক্ত করিবার সময়েই তাহারা মৌনব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল? বিনা প্রমাণে, এত বড় কথা মানিয়া লইতে সাহস হয় না। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্য সাহস করিয়া এত বড় কথার সাক্ষ্যদান করিতে পারে না। অনুসন্ধানলব্ধ ঐতিহাসিক তথ্য ইহার সকল কথারই বিপরীত প্রমাণ পুঞ্জীকৃত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে উপহাস করা সহজ, অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অস্বীকার করিতে পারিলেও, সকল সংশয় নিরস্ত হয় না। যাহারা চির-সুন্দরের সন্ধান লাভ করিয়াও, দীর্ঘকাল মৌনব্রত রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহারা আবার কী কী কারণে, সহসা মুখর হইয়া উঠিয়াছিল? মুখর হইয়া উঠিয়াছিল সত্য ; তাহা অসংখ্য পাষাণ প্রতিমায় অভিব্যক্ত। কিন্তু কেন?

অধ্যাপক হাভেল ইহার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। কোন্ সময় হইতে আর্যসমাজ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি কেবল তাহারই পরিচয় দিবার জন্য লিখিয়াছেন,– খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে ইহার আরম্ভ। সেই সময় হইতেই ভারতশিল্পের প্রকৃত অভ্যুদয়। কারণ, সেই সময় হইতেই বেদবাক্য লিপিবদ্ধ হইবার সূত্রপাত।[৪]

ইহাও ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতে সাহস হয় না। খ্রিস্টাবির্ভাবের বহুপূর্বে, এমন কি, শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কালেরও বহুপূর্বে বেদমন্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ; চিত্র ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে ইহার প্রমাণ লাভের সম্ভাবনা আছে।

যে যুগের চিত্র বা প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই শিল্প-প্রতিভার আদি যুগ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। চিত্র বা প্রতিমা মানব-হৃদয়নিহিত নিগূঢ় ভাব-সম্পদের বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র। যে যুগে সেই ভাবসম্পৎ অর্জিত হইয়াছিল, সেই যুগই শিল্প-প্রতিভার আদি যুগ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার নাম 'বৈদিক যুগ'। সেই যুগের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে, ধ্যান-ধারণার মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই, ভারত-শিল্পের প্রকৃত আদর্শের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এ বিষয়ে অধ্যাপক হাভেল সত্য সত্যই প্রকৃত তথ্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কেবল শিল্পাদর্শ কেন, ভারতীয় আর্য সভ্যতার সকল আদর্শই বৈদিক যুগে অভিব্যক্ত হইয়াছিল,– উত্তরকালের আর্য সভ্যতা তাহারই পরিণত ফল। তজ্জন্য

এখনও বহু যুগের বহু বিপ্লবের অবসানেও, আর্য সভ্যতার সকল স্তরেই তাহার প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। শিল্পের স্তরেই তদ্বৎ।

তাহার আদর্শ ইহলোকে নহে, পরলোকে ;– সান্ত পদার্থে নহে, অনন্তে ;– আকারে নহে, ভাবে। সেই জন্য ভারতশিল্পে একটি অনন্য-সাধারণ স্বাতন্ত্র্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা ভারতবর্ষের সুনীল আকাশতলের চিরশান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। দীর্ঘকাল অন্য-সংস্পর্শের বাহিরে থাকিতে পারিলে, তাহা এখনও সেই ভাবেই বর্তমান থাকিতে পারিত। তাহার মূল প্রকৃতি আধ্যাত্মিকতা।

অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন,– অন্তত কিছুদিনের জন্য, আধ্যাত্মিকতা ক্রমে ক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণের আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের বাহুল্যে তাহা যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে আবার তাহা শক্তিলাভ করিয়া, আধাত্ম্যদৃষ্টির প্রসার সাধন করিয়াছিল।[৫]

এই যুগ অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থোক্ত দ্বিতীয় যুগ–ভারতশিল্পের অভ্যুদয়-যুগ–ভাবের আদান-প্রদানের কল্যাণযুগ,–নিখিল-মিলন যুগে বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য ভারতবর্ষের গৌরব-যুগ। এই যুগে ভারতবর্ষ নিখিল মানবসমাজের সংস্পর্শ লাভ করিয়া, পুরাতন গিরি-গহ্বরের বাহিরে আসিয়া, মুগ্ধনেত্রে অগণ্য নূতন আদর্শের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই যুগে ভারতবর্ষ মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরের আলোক গ্রহণ করিয়া, ভিতরের আধ্যাত্মিকাকে নূতন নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাতেই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানবিকতার সমন্বয় সাধিত হইয়া গিয়াছিল।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই মিলনযুগকেই ভারতশিল্পের আদিযুগ বলিয়া গ্রহণ করায়, অধ্যাপক হাভেল তাঁহাদিগকে 'ভ্রান্ত' বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহাকে অভ্যুদয়-যুগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকেই কেহ কেহ আদিযুগ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিলে, উপহাস করা শোভা পায় না। যে বৈদিক যুগকে অধ্যাপক হাভেল আদিযুগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে (তাঁহার মতে) বিকাশ ছিল না, ভাবুকতা ছিল ; চিত্র ছিল না, ভাস্কর্য ছিল না, অভিব্যক্তি ছিল না ; কিন্তু তাহার মূল প্রস্রবণরূপে আধ্যাত্মিক-ভাবুকতা বর্তমান ছিল। বীজকে বৃক্ষ বলিতে অসম্মত হইলে কাহাকেও উপহাস করা শোভা পায় না;– এই ভাবুকতার যুগকেও শিল্পের আদিযুগ বলিতে অসম্মত হইলে, কাহাকেও উপহাস করা শোভা পায় না। কিন্তু ইহাকে সিদ্ধান্ত না বলিয়া বিতণ্ডা বলিলেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। কারণ, উভয় মতের 'সামান্য-লক্ষণ' একই প্রকার। উভয়েই মানিয়া লইয়াছেন, শাক্যবুদ্ধদেবের পূর্বে শিল্পপ্রতিভা চিত্রে বা ভাস্কর্যে অভিব্যক্ত হয় নাই। এক পক্ষ বলিতেছেন,– অভিব্যক্তির যুগই শিল্পের আদিযুগ ; আর এক পক্ষ বলিতেছেন,– তাহার পূর্বে যে ভাবুকতার যুগ বর্তমান ছিল, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আদি-যুগ।

দুর্ভাগ্যক্রমে, উভয় পক্ষই শাক্যবুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য শ্রমস্বীকার করিতে অসম্মত। তখনও শিল্প ছিল, অভিব্যক্তি ছিল ; তখনও আলোক ছিল, সভ্যতা ছিল; বরং ব্রাহ্মণের আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের বাহুল্যই শিল্পকে বিকশিত করিবার জন্য তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকাণ্ডের অবতারণা না করিলে, ভাব কর্মে অভিব্যক্ত হইত না ;– আদর্শ শিল্পে পরিণত হইত না ;– অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত রূপ লাভ করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকাণ্ডের আতিশয্যে জন-সমাজকে ইহসর্বস্ব সাংসারিকতা হইতে দূরে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিলে, শাক্য-বুদ্ধদেবের সাধন-লালসা বিকশিত হইতে পারিত না। ব্রাহ্মণ পথপ্রদর্শক না হইলে, অনির্বচনীয়কে বাক্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, প্রতিমায়, অভিব্যক্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষ ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। সুতরাং প্রচলিত পাশ্চাত্য মতে প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া, গ্রন্থকার অজ্ঞাতসারে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের ন্যায়, তিনিও শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী যুগকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষের প্রথম শিল্পযুগ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমরা এখন কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব? আমরা কি ইহাই বিশ্বাস করিব যে,– (১) বৈদিক যুগে ধারণা ছিল, অভিব্যক্তি ছিল না?– আদর্শ ছিল, শিল্প ছিল না? (২) আর্যসমাজকে সভয়ে সযত্নে আত্মসমাজের অভ্যন্তরে বাস করিতে হইত বলিয়া, অনার্য সংস্পর্শ পরিহার কামনায়, আর্যগণকে সুদীর্ঘ মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া, শিল্পপ্রতিভা চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল? (৩) ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া, নিয়ত বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়াও, তাহার দিব্যজ্যোতিকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন? (৪) তাঁহারা ক্রিয়াকলাপের আতিশয্যে আত্মহারা হইয়া, শিল্প-শক্তিতে সহায় রূপে জাগাইয়া না তুলিয়া, তাহাকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন? (৫) যে শাক্য-বুদ্ধদেব "সর্ব্বং অমিত্যং দুঃখ্যং" এই মূলমন্ত্র প্রচারে অনন্যকর্মা হইয়াছিলেন, তিনিই কি ভারতবর্ষের ভাবের নিরুদ্ধ স্রোতকে কারামুক্ত করিয়া, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানবিকতাকে–সাংসারিকতাকে চিরসম্মিলিত করিয়া দিয়া, ভারত-শিল্পের জন্মদান করিয়াছিলেন? আমরা যদি এ সকল কথা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইতে পারি, তবে অধ্যাপক হাভেলের সকল সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে পারিব। কিন্তু আমাদের পুরাতন সাহিত্য তাহার প্রবল অন্তরায় ; আমাদের শ্রীমূর্তি নিয়ে তাহার প্রবল অন্তরায়, আমাদের গুরুপরম্পরাগত শিক্ষাদীক্ষা তাহার প্রবল অন্তরায়।

একবার পাশ্চাত্য-সমাজে গুরুপরম্পরাগত ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়া, বেদমন্ত্রার্থ অবগত হইবার চেষ্টা আবির্ভূত হইয়াছিল। আচার্য গোলড্স্টুকর তীব্র প্রতিবাদে সকলকে সাবধান করিয়া দিবার পর, আবার স্রোত ফিরিয়াছে ;– আবার গুরুপরম্পরাগত ভাষা ব্যাখ্যা অবলম্বন করিবার অধ্যয়নরীতিই প্রতিষ্ঠালাভ

করিয়াছে। এত কালের পর, শিল্প-তত্ত্বের অধ্যয়নে পুনরপি সেই উদ্দাম কল্পনামুখর হইয়া উঠিতেছে ; স্বমত-সমর্থনের জন্য মনের মতো ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়া, তাহার উপরে সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। ইহাকেও আবার প্রকৃত পথে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবে,– 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'

টীকা-সূত্র

1. The Ideals of Indian Art.

2. Convinced as I am that the learning of the orientalist, however profound and scientific it may be, is often most misleading in aesthetic criticism, it has always been my first endeavour, in the interpretation of Indian ideal, to obtain a direct insight into the artist's meaning, without relying on modern archaeological conclusions and without searching for the clue which may be found in Indian literature,— Introduction.

3. Hitherto archaeological excavations in India have been little more than a scratching of the superficial layers. When the sandy deserts of Rajputana and the lower starta of the alluvial deposits of the Indus and the Ganges, and other sacred rivers, are explored as scientifically and systematically as the sand of Egypt and the soil of Crete we may learn a great deal more of the indigenous Indian Art which preceded the Asokan period,— P. 18.

4. But the visions of the Vedic seers only materialised to the wonderful sculpture and painting of the great period of Indian Art, before the Mahomedan invasion,— that is from the fourth of to the tenth centuries A. D,— when Vedic literature was first committed to writing.— P. 11.

5. The spirituality of the Vedic age was gradually obscured for a time at least by the complicated ritualism of Brahmana Priesthood, and it was the teaching of Buddha which gave the next great impulse to the development of Indian art widening the intellectual outlook and correlating the abstract ideas and spiritual vision of the Vedic age with human conduct and the realities of life,— P. 13

উৎস : 'ভারতশিল্পের কথা' গ্রন্থ ।

মুসলমান / প্রবন্ধ

বাংলার মুসলমানগণের মাতৃভাষা

.....

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

মাতার মুখনিঃসৃত ভাষাই মাতৃভাষা । যে ভাষায় আমরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কথাবার্তা কহি, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী সকলের সঙ্গে অক্লেশে ভাবের আদান প্রদান করি, তাহাই মাতৃভাষা । মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই সর্বপ্রথম মায়ের মুখে যে ভাষা শুনিতে পায়, মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষা আয়ত্ত করে, তাহাই তাহার মাতৃভাষা । নবজাত-শিশু প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে হইতে পিতা-মাতা প্রভৃতি পরিজনের সংস্রবে আপনা-আপনি যে ভাষা শিক্ষা করে, তাহাই তাহার মাতৃভাষা, তাহাই তাহার স্বভাবপ্রদত্ত ভাষা । একদিকে মাতার স্তন হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শিশুদেহ পুষ্টিলাভ করে, অন্য দিকে মাতৃভাষা হইতে রসাকর্ষণ ও উন্মুক্ত প্রকৃতি হইতে ভাব-নিয়ে গ্রহণ করিয়া তাহার মানসিক বৃত্তিসমূহ উন্মেষিত হইতে থাকে । মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য, মাতৃভাষাও তেমনই তাহার প্রকৃতি-দত্ত ভাষা ।

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালীর মাতৃভাষা। বঙ্গদেশবাসী হিন্দুর ন্যায় বঙ্গদেশবাসী মুসলমানদিগকেও বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। হিন্দুগণের মতো পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালী মুসলমানেরাও বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এই ভাষাই তাঁহাদের সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ভাষাতেই তাঁহারা চিন্তা করেন, এই ভাষাতেই তাঁহারা সাংসারিক যাবতীয় কর্ম নিষ্পন্ন করেন, এবং এই ভাষাতেই জাগতিক ভাবসমূহ তাঁহাদের হৃদয়ে সংহত হইয়া ভাবপ্রবাহ ও অনুভূতির সৃষ্টি করে। এই ভাষাই পুরুষ-পরম্পরাক্রমে তাঁহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। এই ভাষাই 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' তাঁহাদের 'প্রাণ আকুল করিয়া' তুলিতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দুশিশুর মতো বাঙ্গালী মোসলেম শিশুও মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মুখ হইতে এই ভাষাই শিক্ষা করিয়া থাকে, এবং একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ মনে করিয়া সর্বপ্রথম এই ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ করে। সূতিকাগৃহে সর্বপ্রথম যে ভাষায় হাতে-খড়ি হয়, শিক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া যে ভাষার আশ্রয় ও সাহচর্যের গ্রহণ অনিবার্য হইয়া পড়ে, এবং সংসারের কর্মক্ষেত্রে– জীবনের সর্ববিধ প্রয়োজনে যে ভাষার নিত্য প্রয়োজন হয়, বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজ হউক, আর মুসলমান সমাজ হউক, সর্বত্র সে ভাষা এই বাংলা ভাষা। বঙ্গের পলীতে পলীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে যদি কোনও ভাষার সনাতনী প্রচার ও অবাধগতি থাকে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যদি কোনও ভাষার প্রয়োগ বাঙ্গালীর থাকে, সে ভাষা এই বাংলা ভাষা। বাঙ্গালীর– তা হিন্দুর হউক, বা মুসলমানের হউক,– বাঙ্গালীর শুদ্ধান্তঃপুরে, বাঙ্গালীর বৈঠকে, বাঙ্গালীর মজলিসে, বাঙ্গালীর মেলায় যদি কোনও ভাষার অপ্রতিহত গতি থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালা ভাষা। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই স্বাভাবিক সহজলভ্য ভাষা, সমাজের অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট এই দেশ-প্রচলিত ভাষাই বাঙ্গালী মুসলমানদের মাতৃভাষা। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও ভাষাকে ন্যায়ত তাঁহাদের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না।

যে জাতির মাতৃভাষা হইতে জাতীয় ভাষা স্বতন্ত্র, কর্ণধার-বিহীন তরণীর সহিত সে জাতির তুলনা করা যাইতে পারে। উক্তরূপ তরণী যেমন বায়ুচালিত ইতস্তত ধাবমানা হয়, কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্যপথে চলিতে পারে না, উক্ত জাতিও কোন নির্দিষ্ট পথের অনুসরণে অক্ষম হইয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে থাকে। তাহার জাতীয় ভাষার সাহিত্যে উচ্চ আদর্শ থাকিলেও পরস্পর বিধি হেতু মাতৃভাষার ভিতর দিয়া তাহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিতে না পারিলে তাহাতে প্রতিক্রিয়ার উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং সে ভাষা ও সাহিত্যে জীবনীশক্তি থাকে না, এবং তাদৃশী জাতীয় ভাষা হইতে সে জাতি কোনও উপভাষা লাভে সমর্থ হয় না। ইহাতে তাহার জাতীয় জীবন আদর্শহীন হইয়া পড়ে, কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মতো ক্ষিপ্রগতিতে অধোগমনে বাধ্য হয়। জাতিই বলুন আর সমাজই বলুন, তাহাকে

জাতীয় ভাষার সাহিত্য হইতে জীবনীশক্তি ও উহার আদর্শ খুঁজিয়া লইতেই হইবে,– জাতীয় ভাষার সাহিত্য হইতে রসাকর্ষণ করিতে হইবে, নচেৎ তাহার উন্নতি অসম্ভব। কেবল দুই-চারি জন শিক্ষিত ব্যক্তি লইয়া কিছু জাতি বা সমাজ হয় না, আপামর সাধারণ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলকে লইয়াই জাতি বা সমাজ গঠিত হয়। জাতীয় বা সমাজদেহের অণুতে পরমাণুতে পর্যন্ত প্রবাহ সৃষ্টি করিবার একমাত্র উপায় মাতৃভাষা। জাতীয় বা সমাজ-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সবল ও চেতনাময় করিয়া তুলিবার পক্ষে মাতৃভাষাই একমাত্র মহৌষধ– একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। যে জাতির জাতীয়ভাষা ও মাতৃভাষা এক নহে, সে জাতির উভয় ভাষাই পঙ্গু,– উভয় ভাষাই শক্তিহীন হইয়া পড়ে। জাতীয়ভাষা মাতৃভাষার খাতে প্রবাহিত হইয়াই সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করিয়া থাকে। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, যে জাতির ভাষা ও সাহিত্য যত শক্তিশালী ও উন্নত সে জাতি সংসার-রঙ্গক্ষেত্রে তত উন্নত ও পরাক্রমশালী। পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের এই কথার যাথার্থ্যে সন্দেহ থাকিবে না।

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, বাঙ্গালার আধুনিক মুসলমানগণের সম্মুখে কোনও উচ্চ জাতীয় আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত নাই। দুই নৌকায় পা দিলে মানুষের যে অবস্থা হয়, বাঙ্গালার মুসলমানদের অবস্থাও প্রায় তাহাই। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে তাঁহারা অদ্যাপি জাতীয় ও মাতৃভাষা এবং জাতীয় সাহিত্য-রূপে সার্বজনীন ভাবে গ্রহণ করেন নাই। যে ভাষার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ কিছুতেই ছিন্ন হইবার নহে, সে ভাষাকে জাতীয় ভাষা-রূপে গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আরব্য, পারস্য, উর্দু প্রভৃতি ভাষার একতমকে জাতীয়-ভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে চাহেন, এবং তাহাই সমাজের ও জাতির পক্ষে শুভকর বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া যান যে, মুখে বা কাগজে-কলমে তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও আবহাওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। দুই-চারি জন শিক্ষিত লোক সভা-সমিতিতে মন্তব্য বিধিবদ্ধ করিয়া উর্দু প্রভৃতি ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু বাঙ্গালার বিশাল সমাজদেহের শিরায় শিরায় মর্মে মর্মে বঙ্গভাষার মতো ঐ ভাষা প্রবেশ করান তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। স্বাভাবিক সহজপ্রাপ্য দেশীয় নদীকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীয় খাল হইতে পানীয়জল সংগ্রহ করিবার চেষ্টার ন্যায়, বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে উর্দু প্রভৃতির প্রচলনচেষ্টাও একান্ত উপহাস্য। মুখের জোরে যিনি যাহাই বলুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। সেই ভাষাকে পরিহার করিয়া আরব্য পারস্যের মতো মৃত ভাষাকে বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের উর্দুভাষাকে জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব ও চেষ্টা শুধু যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, এমন নহে; উহা সমাজের পক্ষে– দেশের পক্ষে বিষম অনিষ্টকরও বটে। এরূপ চেষ্টা তো কখনও ফলবতী হইবেই না; ফলে এই হইবে যে, উর্দু প্রভৃতির প্রচলনের নিষ্ফল চেষ্টায় এমন কতকটা শক্তির অকারণ

অপচয় ঘটিবে, যে শক্তি সুপথে পরিচালিত হইলে সমাজের ও দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারিত। এরূপ বিফল প্রয়াসে না উর্দু প্রভৃতি ভাষা, না মাতৃভাষা– কোনোটাই তাঁহাদের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। ইহাতে সমাজ দেশের সাহিত্য হইতে উপযুক্ত রস ও জীবনীশক্তি না পাইয়া ক্রমে নিস্তেজ ও দুর্বল হইতে থাকিবে। বর্তমানে বঙ্গীয় মুসলমানসমাজ যে ঠিক এই দুর্দশায় উপস্থিত হইয়াছে, একটু গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

আরব্য-পারস্য ভাষা এক সময়ে– কোনও এক সুদূর অতীতে– কল্পনাতীত কালে বঙ্গীয় মুসলমানের আদিপুরুষগণের মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা হয়তো ছিল। তাই বলিয়া আজও ঐ সকল মৃত ভাষাকে মাতৃভাষা বা জাতীয়-ভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থন করা যায় না। একদা দেশে ও রাজদরবারে পারস্য ভাষার খুব প্রাদুর্ভাব ছিল সত্য, কিন্তু তাহা কখনও সার্বজনীন মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা ছিল না। কালের অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভাষাসমূহ মোসলেম সমাজ হইতে এতই দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদিগকে এখন একবারে বিজাতীয় ও বিদেশীয় ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষা শিখিতে আমাদিগকে যে কষ্ট ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়, আরব্য-পারস্য ভাষা শিখিতেও আমাদের তদপেক্ষা অল্প ক্লেশ ও পরিশ্রম হয় না। আমরা দেখিতে পাই, মুসলমানেরা যখন যেখান হইতেই যে ভাষা সঙ্গে লইয়া ভারতে আগমন করুন না কেন, ভারতের যে অংশে যাঁহারা পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই অংশের প্রচলিত ভাষাকেই– দুই দিন আগে হউক, আর পরেই হউক,– আপনাদের ভাষা করিয়া লইয়াছেন। বঙ্গদেশে মুসলমানগণের বঙ্গভাষা-ব্যবহার আমাদের সেই কথারই সমর্থন করিতেছে। আমাদের এই কথা হইতে কেহ এরূপ মনে করিবে না যে, আমরা আরব্য-পারস্য প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার বিরোধি। বস্তুত, আরব্য-পারস্য কেন, জ্ঞানের জন্য জগতের কোনও ভাষা-শিক্ষারই আমরা বিরোধি নহি। আরব্য ভাষা যে ধর্ম-ভাষারূপে মুসলমানগণের শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক, আমরা তাহা অস্বীকার করিব না। আমাদের শুধু আপত্তি এই যে, ঐ সকল ভাষা কিছুতেই বাঙ্গালার মুসলমানগণের জাতীয়-ভাষা-রূপে গৃহীত হইতে পারে না, এবং তাহা করিবার পক্ষে বিফল চেষ্টা করাও কাহারও উচিত নহে। ঐ সকল ভাষাকে জাতীয়-ভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে যাওয়া, আর আপন সমাজের কর্ণচ্ছেদ করা, একই কথা বলিয়া মনে হয়। অনেক হিন্দুও এইরূপ ভ্রান্তিবশত সংস্কৃত ভাষাকে তাঁহাদের জাতীয় ভাষা বলিয়া থাকেন। সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্য ভাষা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের দেবভাষা বা ধর্মভাষা হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় ভাষা কোনও মতেই হইতে পারে না। ইউরোপে সমস্ত খ্রিস্টান জাতি গ্রিক ও ল্যাটিনকে যেরূপ 'ক্ল্যাসিকাল' ভাষা মনে করেন, অস্মদ্দেশে সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্য ভাষাও

তদবস্থাপন্ন। দেশপ্রচলিত আপামরসাধারণের বোধ্য ও নিত্য-ব্যবহৃত জীবন্ত ভাষাই সকল জাতির জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। তাহা হইলেই সেই জাতি সেই ভাষার সাহায্যে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষাই একমাত্র তদ্রূপ ভাষা। তদ্ভিন্ন আর কোনও ভাষাই বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা হইতে পারে না।

উর্দু ভাষা যতই সুন্দর, শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় হউক না কেন, বঙ্গদেশে মুসলমান-সমাজে তাহা কখনই বাঙ্গালা ভাষার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মাতৃভাষাকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করিয়া অনেক সময় কথোপকথনে উর্দু ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ কার্যের ফল কিরূপ বিষময় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাঁহারা কেহ একবারও তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন না। যদি জানিতাম যে, বাঙ্গালার হাটে ঘাটে, বাঙ্গালার মেলায় মজলিসে, বাঙ্গালার প্রত্যেক গৃহস্থের অন্তঃপুরে, বাঙ্গালার প্রত্যেক বিষয়-ব্যাপারে আপামরসাধারণ সমস্ত বাঙ্গালী-মুসলমানের মধ্যে শুধু উর্দুই প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা হইলে, আমাদের কোনও বক্তব্যই ছিল না। যে দেশের পনেরো আনা লোক কথায় লেখায় বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার করে, তাহাতে এরূপ স্বৈরাচার করিবার পূর্বে স্বজাতির হিতকামীমাত্রেরই তাহার ফলাফল একটু চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য। ফলে মুসলমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষাকে আপনাদের জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া না লওয়ায় একদিকে সমাজ তাঁহাদিগকে হারাইতে বাধ্য হইতেছে, এবং অন্য দিকে তাঁহাদিগকেও সমাজ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হইতেছে। কোথায় তাঁহারা উচ্চ শিক্ষাদীক্ষার অধিকারী হইয়া তাঁহাদের জ্ঞানালোক দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন সমাজকে আলোকিত করিবেন, না তৎপরিবর্তে তাঁহারা সমাজের গণ্ডীর বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছেন! মানুষ কিছু শুধু নিজের জন্য জীবনধারণ করে না। বিধাতার আশীর্বাদে নানা গুণের অধিকারী হইয়াও যদি দেশের ও সমাজের উপকারেই না-আসিলাম, তবে আমার এত গুণজ্ঞানের সার্থকতা বা প্রয়োজনই-বা কী? জগৎপিতা দুর্লভ মানব-জীবনে ও পশুজীবনে বিপুল পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ কথা ভুলিয়া যান যে, সমাজ তাঁহাদিগকেই আলোক-বর্তিকা করিয়া– তাঁহাদিগকেই ধ্রুবতারা জ্ঞান করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য সমুৎসুক। তাঁহারা যদি আপনারই অন্ধকার কক্ষে লুক্কায়িত হইয়া শুধু নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তবে তাঁহাদের দুর্গত দেশে– তাঁহাদের দুরবস্থ সমাজে আর আলোক-বিকিরণ করিবে কে? বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে সৈয়দ আহম্মদ কই, বিপিনচন্দ্র কই, সুরেন্দ্রনাথ কই? ওই শুনুন, প্রতিধ্বনি অদূরবর্তী গঙ্গাবক্ষে ব্যাহত হইয়া উত্তরে বলিতেছে– কই, কই, কই !

বলিতেছিলাম, উর্দুভাষাকে বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় ভাষারূপে প্রচলিত করিবার চেষ্টা তো কদাপি ফলবতী হইবেই না,– অধিকন্তু তাহাতে এই অনিষ্ট হইবে

যে, উর্দু বা বাঙ্গালা ভাষা কোনোটাই তাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারিয়া, উভয় ভাষাই অকর্মণ্য হইবে। মাতৃভাষা ও জাতীয়-সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কোনও জাতি কখনও বড় হইতে পারে না। কেন না, জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় জীবনের প্রাণ। জাতীয় সাহিত্যই জাতীয়-জীবন-তরীর দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া থাকে, এবং জাতীয় সাহিত্য হইতে রসাকর্ষণে করিয়াই সমাজ-দেহ পুষ্টিলাভ করে। আজ হিন্দুসমাজে এই অভাবনীয় পরিবর্তনের হেতু কী? তাঁহাদের মধ্যে এই নবজীবনের সূত্রপাত কি বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেই হয় না? হিন্দুসমাজের মর্মে মর্মে এই যে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার মূল কি বঙ্গ-সাহিত্য নহে? একই জলবায়ুর প্রভাবে একই দেশে বাস করা বাঙ্গালার দুইটি সহোদর জাতি পরস্পর বিভিন্ন-মুখ হইতেছে কেন, আমাদের মধ্যে সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, বঙ্গসাহিত্যই হিন্দুসমাজের এই পরিবর্তন-সূচনার মুখ্য কারণ, এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অবহেলাই মুসলমান সমাজের এই নির্জীবতার প্রধান হেতু।

হিন্দুসমাজে বঙ্গসাহিত্য এখন যেরূপ অতর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে সমাজদেহে এরূপ তীব্র বিক্ষেপ ও নূতন প্রতিক্রিয়া হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। বঙ্গসাহিত্যের প্রসার ও প্রভাব-বৃদ্ধি ব্যতীত হিন্দুসমাজে এত শীঘ্র এমনভাবে জাতীয় ভাব স্ফুরিত হইতে পারিত না! বঙ্গসাহিত্যই তৎসমাজের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এমনভাবে চেতনাময় করিয়া তুলিয়াছে। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের অভাবেই বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজ আজও 'যে তিমিরে সে তিমিরে' রহিয়া গিয়াছে, এবং আরও বহুদিন এ ভাবে থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। যেখানে হিন্দুসমাজে শত শত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা চলিতে পারে, সেখানে মুসলমান সমাজে একখানি মাত্র সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে না,– এ কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে মুসলমান-সমাজ যে আজও উন্নতি-পথের কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহাদেরই প্রতিভাবলে উহারা আজ জগতের সাহিত্য-পরিবারের সঙ্গে বাণিজ্য-স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং সে জন্য হিন্দুগণকে কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না,– তজ্জন্য মুসলমানদের নিশ্চেষ্টতাই সম্পূর্ণ দায়ী।

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি মুসলমানগণ সাহিত্যানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায়, তাঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, এখনও অনেকে বঙ্গভাষাকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করেন। হিন্দুদের মধ্যে বঙ্গভাষার বিপুল প্রসারের ফলে তাঁহাদের ধর্মভাষা সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত গ্রন্থরত্নই বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে। তাহার ফলে মাতৃভাষার সাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের অক্ষয়কীর্তি পূর্ব-পুরুষগণের প্রাণপ্রবাহ অনুভব করিতে পারিতেছেন। বঙ্গীয় মুসলমানগণও যদি এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আরব্য-পারস্য হইতে তাঁহাদের মহনীয়কীর্তি পূর্ব-পুরুষগণের গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালায়

রূপান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষা তাঁহাদেরও জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইত, এবং তাহাতে বঙ্গের উভয় সমাজের উন্নতির হেতু ও মিলনের চিরস্থায়ী সেতু নির্মিত হইত। পক্ষান্তরে, বাঙ্গালা ভাষাও সংস্কৃতের ন্যায় আরব্য ও পারস্য ভাষার মহামূল্য রত্নমালায় বিভূষিত হইয়া এবং অপূর্ব মহিমা ধারণ করিত, এবং তাহা এখন হিন্দুগামী বলিয়া আমাদের অনুযোগ করিবার কারণ থাকিত না।

মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে জাতীয় ভাষারূপে বরণ করিয়া তাহার সমুচিত সমাদর ও অনুশীলন না করায়, মুসলমানসমাজের যে কী অনিষ্ট হইতেছে, তাহা ভাষায় অভিব্যক্ত করা সহজ নহে। প্রাচীন বঙ্গে বহু বহু মুসলমান কবি যেরূপ সযত্ন সেবায় বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন করিতেছিলেন, সেই যত্ন ও উদ্যম যদি এতদিন পর্যন্ত অবিরাম-প্রবাহে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে আজ আমাদের সাহিত্য বিপুল বিস্তার ও অসীম শক্তি লাভ করিত। আমাদের জাতীয়তা-বর্ধন-কল্পেও তাহা অশেষ সহায়তা করিতে পারিত, এবং বঙ্গসাহিত্যও ইসলামের ভাস্কর-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিত। বাঙ্গালাভাষা ভিন্ন অপর কোনও ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানগণের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, ইহা আমাদের, পূর্বপুরুষগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে তাঁহারা সেই শুভকার্যে ব্রতীও হইয়াছিলেন। হিন্দু কবিগণ যেমন রামায়ণ মহাভারতাদি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থরাজি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিতেছিলেন, মুসলমান কবিগণও তেমনি তাঁহাদের পূর্বাচার্যগণের গ্রন্থাবলি বাঙ্গালায় নিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একমাত্র এই অকৃতীর চেষ্টায় এ পর্যন্ত ৮০ জন মুসলমান কবি আবিষ্কৃত হইয়াছেন।

এই হিসাবে সমগ্র বঙ্গে কত কবির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আপনারাই অনুমান করুন। বহুশত বৎসর বাঙ্গালায় আধিপত্য করিয়া মুসলমানগণ যে বাঙ্গালা ভাষাকে নিজের বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজ্য-মহিমার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বাভাবিক ও সুন্দর 'আত্মভাব' বিলুপ্ত হইয়া না গেলে, আজ বাঙ্গালী মুসলমানের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত, সন্দেহ নাই। বঙ্গের বর্তমান মুসলমানগণ যদি তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তে অবহেলা করিয়া কোনও নূতন জাতীয় ভাষার আমদানি ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা কখনও সাফল্য লাভ করিবে না। প্রত্যুত, সে চেষ্টা নিজ হস্তে নিজের মস্তকে কুঠারাঘাতের সহিত তুলিত হইতে পারিবে।

আরও একটা কথা আছে। বঙ্গদেশ হিন্দু ও মুসলমানের দেশ এবং হিন্দু ও মুসলমান লইয়াই বাঙ্গালী জাতি গঠিত। এই দুই জাতির মধ্যে একটি সাধারণ ভাষা প্রচলিত থাকিলে তাহাতে জাতীয়তা গঠনের যেরূপ সহায়তা হইবে, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্মিলন সাধনের প্রয়োজন কী, তাহা বোধ হয় এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। একমাত্র বঙ্গভাষাই বঙ্গের দুইটি সহোদর সমাজকে পরস্পরের প্রতি প্রীতিশীল ও অনুরাগ-সম্পন্ন করিতে

পারে। প্রায়ই ভাষার ভিতর দিয়াই তাঁহাদের পরস্পরের চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটিতে পারে, এবং এই ভাষাই তাঁহাদের ক্ষুদ্র বর্ণগত পার্থক্য ঘুচাইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিপুল অখণ্ড জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এই বিষয়ে বাঙ্গালার মুসলমানগণের হৃদয়ে সুমতির উদয় হউক, বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

উৎস : পত্রিকা *সাহিত্য*, শ্রাবণ, ১৩২১ সংখ্যা। পরে 'সংহতি' প্রকাশনী থেকে গৌতম ভদ্র'র 'মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আত্মসত্তার রাজনীতি' গ্রন্থে 'সংযোজন' হিসেবে গ্রন্থভুক্ত।

.....

ব ই / আ লো চ না

.....

সি দ্ধা র্থ শ ং ক র জো য়া র্দা র

বইয়ের নাম : **আদর্শ রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ**
লেখক : গালিব আহসান খান
প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২
মূল্য : ১৪৫ টাকা

বাংলাদেশের সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি, নীতিচিন্তা ও ভবিষ্যতের নানাবিধ সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন সমাজ বিশেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক ও নীতিদার্শনিকেরা বহুমাত্রিক বিশেষণ করে চলেছেন অনেকদিন ধরে। কেউ কেউ দেশকে নিয়ে গভীর নৈরাশ্য ব্যক্ত করেছেন, আবার কেউ শুনিয়েছেন অমিত সম্ভাবনার কথা। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের মাঝে তারা প্রস্তাব রেখেছেন সমস্যা

নিরশনের নানা কৌশলের; শুনিয়েছেন 'শান্তির অভয় বাণী'। বাংলাদেশের নানাবিধ সংকট সমাধান তথা কাঙ্খিত এক আদর্শিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের সম্ভাব্য ধারণাগত প্রস্তাবনা সম্বলিত চমৎকার এক গ্রন্থ আমরা পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খানের নিকট থেকে। গ্রন্থটির নাম *আদর্শ রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ*। গতানুগতিক ঘটনার বর্ণনা নয় কিম্বা নিছক তথ্যের সমাবেশও নয় বরং গ্রন্থটিতে প্রকটিত হয়েছে সম্পূর্ণ দার্শনিক বিশেষণ সম্বলিত চিন্তার বহুমাত্রিকতা। লেখক অনেকটাই নির্মোহ অবস্থানে থেকে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের একটা রেখাচিত্র অংকন করেছেন; সম্ভাবনার কথা বলেছেন এই দেশকে ঘিরে। বাংলাদেশের আছে সুদীর্ঘ দিনের গৌরবময় ঐতিহ্য। অর্জনও তার পর্বতসম। কিন্তু সেই বিস্তৃত অর্জনের অন্তরালে রয়ে গেছে এক ভয়ানক বোধহীনতায় আক্রান্ত বাংলাদেশ। নীতিহীনতার বীভৎস কৃষ্ণগহ্বরে হারাতে বসেছে সোনার এই দেশটা। এখান থেকে কীভাবে উত্তরণ সম্ভব, কীভাবে আমরা দুঃখহীন মংগলময় এক কাঙ্খিত বাংলাদেশ পেতে পারি, সেই দুঃখ মোচনের এক নিরন্তর তাগিদ থেকেই সম্ভবত অধ্যাপক খান লিখেছেন গ্রন্থটি। এ যেন নৈরাজ্যকর গ্রীসের উদ্ভুত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পেটোর লেখা *রিপাবলিক* গ্রন্থেরই মত। গ্রন্থটিতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বাস্তবতার এক অপূর্ব সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। একটা আদর্শ রাষ্ট্রের কাঠামো কী হতে পারে সেটার নানামুখী বিশেষণ যেমনি আছে এখানে, অন্যদিকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকে কীভাবে সেই প্রস্তাবিত ছাঁচের মধ্যে ফেলা সম্ভব তার নানামূখী মূল্যায়ন আমরা পাই এখানে। সুতরাং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভংগীর এক অপূর্ব মেলবন্ধন এখানে লক্ষ্যনীয়। যারা হতাশা ব্যক্ত করেছেন এই দেশকে নিয়ে যারা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে লোভ-হিংসার উম্মাদনায় নৃত্য করেছেন তাদের জন্য এই মডেল হতে পারে এক উচিৎ শিক্ষা ও সতর্কবার্তা। আমার মনে হয়েছে ভবিষ্যতে এর ব্যবহারিক গুরুত্ব হয়ে দাঁড়াবে অনেক বেশী কার্যকর। মোট সাতটি প্রবন্ধ নিয়ে গ্রন্থটি।

প্রবন্ধগুলোর বেশীর ভাগই ইতোপূর্বে বিভিন্ন গবেষনাধর্মী জার্নালে প্রকাশিত। এগুলোর রচনাকাল ভিন্ন হলেও দারুণ এক সংগতি আছে এগুলোর মাঝে। চিন্তার ধারাবাহিকতা নিয়ে এসব গবেষণাপত্র সমসাময়িক সমাজ দর্শনের এক চমৎকার দ্যোতনা। মোটাদাগে বিষয়বস্তুকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে আছে সম্পূর্ণ ধারণাগত প্রস্তাবনা অন্যদিকে আছে এর ব্যবহারিক তাৎপর্য। অর্থাৎ একদিকে আছে মানবাকাঙ্খার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে সুচিন্তিত চেতনার প্যারাডাইম অন্য অংশে আছে বাংলাদেশকে সেই কাল্পনিক ছাঁচে প্রকাশ করার ব্যবহারিক তাগিদ।

অধ্যাপক খান বাংলাদেশকে নিয়ে যে সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছেন তার একটা প্রস্তাবিত প্যারাডাইম তিনি গড়ে তুলেছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে। তিনি মনে করেন, একটি আদর্শ রাষ্ট্রে মানুষের দুঃখ থাকা উচিৎ না। অর্থাৎ

রাষ্ট্র মানুষের দুঃখ-নিরোধের সহায়ক পরিবেশ তৈরী করবেন এবং তা কোনক্রমেই যেন অযাচিত হস্তক্ষেপে মানুষের বেদনা বাড়িয়ে না তোলে সেটা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ'জন সমসাময়িক দার্শনিক- গৌতম বুদ্ধ ও পে-টোর চিন্তার সমন্বয়ের কথা ভেবেছেন তিনি। গৌতম বুদ্ধের চিন্তার ভিতর যে মনোবিদ্যক ও নৈতিক দিক আছে আবার পেটোর মাঝে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান পাওয়া যায় তার সুষম সহাবস্থানের মাঝেই এ ধরণের প্রয়াস বাস্তবায়ন সম্ভব। আদর্শ রাষ্ট্রের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রকরণের মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে ঠিকই কিন্তু এ দুয়ের মাঝে দেওয়া-নেওয়ার মিথক্রিয়ার মাঝেই সম্ভবতঃ সেই কাঙ্খিত ফল লাভ সম্ভব। ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারততীর্থ' কবিতায় ঠিক এই কথাটা বলেছিলেন এ ভাবে- 'দেবে আর নেবে মেলাব মিলিবে যাবে না ফিরে/ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' ড. খানের চিন্তা আমাকে সেই কথায় স্মরণ করিয়েছে বারংবার যখন তিনি লিখেছেন, 'আদর্শ রাষ্ট্র তত্ত্বের বাস্তবায়ন যোগ্য প্রাচ্য প্রকরণের সাথে তাত্ত্বিকভাবে পূর্ণতার অধিকারী পাশ্চাত্য প্রকরণের একটা সমন্বয় আমরা করতে পারি সেটা হবে আদর্শ রাষ্ট্রের নতুন ও সঠিক প্রকরণ'।

তবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় আদর্শ রাষ্ট্রকে ঠিক আমরা যেভাবে চিন্তা করি তা কখনই বাস্তবায়ন যোগ্য নয়। কারণ এটা অনেকটাই মনুষ্য ভাবনার কাল্পনিক চিত্র। তাই বলে সেটার কল্পনা করতে দোষের কী? পূর্ণতার তো শেষ নেই। নেই কোন চূড়ান্ত আদর্শ। তাই বলে চিন্তা কি থেমে আছে? থেমে থাকা সম্ভব নয় কস্মিনকালেও। আমাদের মাতৃভূমি নিয়ে, বিশেষ করে যখন আমরা একটা কালোত্তীর্ণ মডেল নিয়ে চিন্তা করি, তখন এই ভাবনার কাছে আসতেই হবে।

বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কীভাবে আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তা নির্ভর করছে তার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা, মানবাধিকার পরিস্থিতি ও জনসংখ্যার লাগামহীনতাকে নিয়ন্ত্রনের উপর। ব্যক্তিক জীবন বিকাশ ও তার শুদ্ধতার পথে রাষ্ট্র যেন বাধার সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী। কেননা আমরা জানি একটি অত্যাচারী সরকার ভয়ংকর বাঘ থেকেও হিংস্র। ব্রার্ট্রান্ড রাসেল ১৯৩৮ সালে *পাওয়ার* গ্রন্থে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রহীনতার মাঝ দিয়ে রাষ্ট্রীয় হিংস্রতা কেমন হতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, রাষ্ট্র যদি তার লাগামহীন ক্ষমতাকে নিস্তেজ না করে তাহলে সে রাষ্ট্র হয়ে উঠবে বীভৎস এক শার্দুল। রাষ্ট্রের এই সতর্কবাণীর অনুরণুন দেখতে পাওয়া যাবে ড. খানের মূল্যায়নের মাঝে। সুতরাং অতি শৈশব কাল থেকেই নীতি শিক্ষা যেন প্রতিটা মানুষকে প্রভাবিত করে সেদিকটা নজর দেওয়া আবশ্যক। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এথিক্স সেন্টার গড়ে তোলার উপর তিনি জোর দেন। এর পর প্রশ্ন আসে, তাহলে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের সর্বাধিক মংগল বয়ে আনতে পারে? অব্যশই গণতন্ত্র। লেখক অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার মাঝে কিছু না কিছু ত্রুটি উলেখ করে বলেন গণতন্ত্রই হতে পারে মানুষের

সর্বাধিক কাম্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তার নিজের কথায়, 'এভাবে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রই হবে গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্র কাঠামো'। যদিও গণতন্ত্রের কাঠামোর মাঝে মতবিরোধ আছে, জ্ঞানী-অজ্ঞানীর সমান অধিকার আছে তবুও এর থেকে মানবিক চিন্তা আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। সর্বোপরি নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রত্যাশিত রাষ্ট্র কাঠামো। অধ্যাপক খান নৈতিক শিক্ষার প্রকৃতি, প্রকরণ ও তার বাস্তবায়ন নিয়ে দীর্ঘ অধ্যায়ে বিস্মৃত কাঠামো পুনবিন্যাস করেছেন। জীবনের নানা পর্যায়ে কীভাবে নৈতিক শিক্ষা কাজে লাগানো সম্ভব তার পদ্ধতিগত দিকগুলো ধাপে ধাপে বর্ণনা করেছেন লেখক। এখানে লক্ষ্যনীয়, বিভিন্ন পেশার মধ্যে তার নৈতিক কর্মধারা কেমন হওয়া উচিৎ তার বিবরণ ও দিয়েছেন চমৎকারভাবে। পরিশেষে বলা যায় ড. গালিব আহসান খান তাঁর দ্বান্দ্বিক নিরপেক্ষবাদ নামে যে নতুন দার্শনিক চেতনার অবতারণা করেছেন তা নিসন্দেহে রাষ্ট্র ও তার নৈতিকতার জন্য একটা নতুন আশাবাদ। আর এ ক্ষেত্রে নিশ্চয় অনেকটাই সে চিন্তার সহায়ক হিসেবে পরিগণিত হবে লাল-সবুজের ছোট্ট এই বইটা।

.....

ভিন্ন ভাষার কবি ও কবিতা / নিবন্ধ

নিজার ক্বাব্বানি'র কবিতা: সংবেদন ও মননের দ্বন্দ্ব

.....

রথো রাফি

নিজার ক্বাব্বানি জন্মেছিলেন ১৯২৩-এর ২১ মার্চে। আর ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল তার এই পার্থিব ভাষা-অতিরিক্ত জীবন থেমে যায়।

সিরিয়ার কূটনীতিক ছিলেন তিনি। তিনি কবিতা লেখার পাশাপাশি প্রকাশনা ব্যাবসার সাথেও নিজেকে জড়িয়েছিলেন। সারল্য ও সৌন্দর্যের মিশেল ঘটেছে তার

কবিতায়। বিষয় হিসেবে প্রেম, যৌনতা, নারীবাদ, ধর্ম, আর আরব জাতীয়তাবাদ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে।

সিরিয়ার রাজধানী শহর দামেস্কাসে জন্মেছিলেন, এক মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান তিনি। কাব্বানি বড়ো হন মিত-নাহ আল-শাহম-এ, পুরোনো দামেস্কাসের কাছেরই জায়গাটির অবস্থান । বাবার বন্ধু আহমদ মনিফ আল-আইদি'র শিক্ষালয় ন্যশনাল সায়েন্টিফিক কলেজ স্কুলে ১৯৩০ ও ১৯৪১ এর মাঝখানে পড়াশোনা করেন। পরবর্তিতে দামেস্কাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে পড়াশোনা করেন। ১৯৪৫ সালে তার এই আইনের ডিগ্রি অর্জন করেন। অপরুপা আমাকে বলেছিলো– এ নামে তার প্রথম কাব্য গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যলয়ে থাকা কালেই বের হয়েছিলো। এ সংগ্রহটি ছিলো প্রেমের কবিতার। দামেস্কাসের সংরক্ষণশীল সমাজে বেশ আলোড়ন তুলেছিলো বইটি, কারণ এর ভেতর নারী-শরীর নিয়ে অনেক চমকে দেয়া কথা ছিলো, যা সিরীয় মানসকে আঘাত করে। আর এই আলোড়নে নিজেকে অধিক গ্রহণযোগ্য করে নিতে তিনি শিক্ষামন্ত্রী মুনির আল-আজলানিকে কবিতার বইটি পাঠান। এই মন্ত্রী তার বাবার বন্ধু ছিলেন আর নেতৃস্থানীয় এক সিরীয় নেতা। তিনি কাব্বানির কবিতার প্রসংশা কওে বইয়ের জন্য একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন।

আইনের পড়াশোনা শেষে সিরিয়ার পররাষ্ট্রীয় মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত হন, এবং কনসাল বা কালচারাল এটাসে হিসেবে বইরুত, কায়রো, ইস্তাম্বুল, মাদ্রিদ ও লন্ডনে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ সালে, যখন ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক গঠিত হলো চীনা এম্বাসিতে কাব্বানি এর ভাইস-সেক্রেটারী নিয়োজিত হলেন। আর চীনে অবস্থানকালেই তিনি তার অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন, বেশকিছু ভাল কবিতা এ সময়েরই লেখা। ১৯৬৬ সালে আগপর্যন্ত তিনি তার কুটনীতির চাকরি চালিয়ে যান। এরপর নিজেই এ চাকরিতে ইস্তফা দেন। এসময়েই তিনি বইরুতে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান খুলেন।

কাব্বানির বয়স যখন ১৫, তখন তার ২৫ বছর বয়েসী বোন আত্মহত্যা করে। সে ভালবাসে না এমন একলোককে বিয়ে করতে অস্বীকার করে, আর এ ইচ্ছে জলহ্জলি না দিতেই সে আত্মহত্যা করে। বোনের অন্ত্যেষ্টির সময়েই কাব্বানি সামাজিক এই দুরবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন। যদি তাকে প্রশ্ন করা হতো, আপনি কি বিপ্লবী? তিনি উত্তর করতেন, "প্রেম আরব বিশ্বে একজনকে অপরাধী বানিয়ে ফেলে, আর আমি চাই এই অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি। আমি আমার কবিতার ভেতর দিয়ে আরবের লোকজনের মন, সংবেদন, আর শরীরকে স্বাধীন করে তুলতে চাই। নারী ও পরুষের সম্পর্ক আমাদের সমাজে স্বাস্থ্যকর নয়।" তিনি তার সমকালে সবচেয়ে তুখোর নারীবাদী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

১৯৬৭ সালে আরবের পরাজয় তাকে ব্যাপক প্রভাবিত করে। এই আরব ইস্যুটি তার কবিতায় শোকের ছায়া ফেলে। এই পরাজয় কবিতায় শরীরি প্রেমের বিষয়ের সাথে প্রত্যাখান ও প্রতিরোধের বিষয়কে মিশিয়ে দেয়। পরাজয়ের কিতাবে'র পাদটিকা নমের কবিতাটি এর একটি ভাল উদাহরণ। কবিতাটি আরব হীনমন্যতা নিয়ে আত্মসমালোচায় উপচে উঠেছে। আরবের কি ডান কি বাম রাজনৈতিক বিতন্ডাতে এ বিষয়টি ক্রোধের সঞ্চার করে।

নিজার কাব্বানির দুইবোন উইজাল ও হাইফা, আর তিন ভাই– মো-তাজ, রশিদ, ও সাবাহ। নিজারের পরবর্তিতে সবচেয়ে খ্যতি অর্জন করেন এই সাবাহ কাব্বানি । সিরীয় রেডিওর পরিচালক ছিলেন তিনি আর ১৯৬০-এ সিরীয় টিভির পরিচলকও হয়েছিলেন। পরবর্তিতে, ১৯৮০ দশকে যুক্তরাষ্টে নিয়োজিত সিরীয় এম্বাসেডরও হয়েছিলেন।

নিজার কাব্বানির বাবা তোফিক কাব্বানি সিরীয় হলেও, তার মা ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভুত। তার বাবার একটা চকলেট কারখানা ছিলো। তিনি সিরীয়ায় ফরাসি ম্যান্ডেটের বিরোধীদের সহযোগিতা করতেন। তার এই মতাদর্শিক অবস্থানের জন্য বহুবার জেল খেটেছেন। আর এসবই নিজার কাব্বানির বেড়ে উঠাকে ব্যাপক প্রভাবিত করেছে, যার পরিণাম একজন নিজস্ব-ধরনে এক বিপ্লবী কবিতে পরিবর্তিত হওয়া। কাব্বানির পিতামহ আবু খলিল কাব্বানি আরবের নাটকের একজন বড়ো সৃজনশীল ব্যাক্তিত্ব ছিলেন।

নিজার কাব্বানি দুইবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথমবার তারই চাচাতবোন জাহরা আকবিকের সাথে, এ সময় আদবা নামে এক মেয়ে আর তওফিক নামে এক ছেলের জন্ম হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বিলকিস আল-রাউয়ি নামের এক ইরাকি নারীর সাথে। এক কবিতা পাঠের উৎসবে বিলকিসের সাথে কাব্বানির দেখা হয়েছিলো। লেবাননের গৃহযুদ্ধ চলাকালে বইরুতের সিরীয় এম্বসিতে গেরিলাদেও বোমা হামলায় নিহত হন এই নারী। তার মৃত্যু কাব্বানির উপর গভীর শোকের ছায়া ফেলে। বিলকিস নামের বিখ্যাত কবিতায় তিনি তাকে নিয়ে নিজের শোক প্রকাশ করেছিলেন, পুরো আরব বিশ্বকেই তিনি বিলকিসের মৃত্যুও জন্য দায়ী করেন ও কবিতায়। বিলকিসের সাথে দাম্পত্যকালে ওমর নামের এক ছেলে আর জয়নাব নামে এক মেয়ের আগমন ঘটে তাদের জীবনে।

বিলকিসের মৃত্যুর পর কাব্বানি বইরুত ছেড়ে যান। একবার জেনেভা আরেকবার প্যারিস এভাবেই কাটতে থাকে সময়। একসময় লন্ডনে স্থায়ী হন। জীবনের শেষ ১৫টি বছর ওখানেই কাটিয়ে দেন তিনি। ৭৫ বছর বয়সে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে চিরনিদ্রায় চলে যান তিনি।

অর্ধ শতাব্দির কবিতা চর্চার ভেতর দিয়ে কাব্বানি ৩৪টি কবিতার বইয়ের এক বিশাল ভাঁড়ার গড়ে তোলেন। স্তনের শৈশব, সাম্বা, তুমি আমার, কবিতা, প্রিয়

আমার, শব্দে আঁকা, গা-না-করা এক নারী, দস্যু কবিতা, প্রেমের কিতাব, প্রেমের শত চিঠি, আইনের বিরুদ্ধে কবিতা, আমি বলছি তুমি ছাড়া আর কোনো রমনী নেই, মিশরীয় বেহেয়ার ডায়েরি, বিলকিসের জন্য কবিতা, প্রেমকে থামাতে পারে না কোন রক্তিম আলো, উন্মাদ কবিতা, রাগ-উৎসারী কবিতা, প্রেমই আমার প্রভু হয়ে থাকবে, পাথর শিশুদের নিয়ে ট্রিয়লজি, কার্মাথিয় প্রেমিকদের গোপন নথি, এক আরব জল্লাদের জীবনী, তোমাকে বিয়ে করেছিলাম- হে স্বাধীনতা, তুমি আমার দুঃখের কান্না কি শুনতে পাচ্ছো?, পরাজয়ের বইয়ের পাদটিকা, নারীর প্রশংসায় পঞ্চাশ বছর, জেসমিনের বর্ণমালা ইত্যাদি ।

কবিতার বাইরেও অনেক গদ্য লিখেছিলেন তিনি । আমার কবিতার গল্প, কবিতা কী, শব্দরা জানে রাগের পরিচয়, কবিতা নিয়ে, যৌনতা ও বিপ্লব, কবিতাতো সবুজ এক প্রদীপ, পাখিদের ভিসা লাগে না, আমার কবিতায় নারী ও আমার জীবন– এমনই কয়েকটি বই । আরবের বহু বিখ্যাত গায়ক তার বহু গীতিকবিতাই কণ্ঠে তুলেছেন– মোহাম্মদ আব্দেল ওয়াহাব, আব্দেল হালিম হাফেজ, ফাইরোজ, কাথেম আল-শাহের, খালিদ আল-শাইখ, উম্ম কুলথাম, লাতিফা, মজিদা আল রুমি, আসালাহ তেমনি কজন । এসব গান আরব বিশে খুব জনপ্রিয়ও বটে । তার অনেক কবিতাতেও সুর দিয়েছেন কণ্ঠ শিল্পীরা ।

দুই.

অর্থ উদ্ধার আর স্বীকারোক্তি আদায়ের লক্ষ্যে যারা কবিতাকে চেয়ারের পায়ার সাথে বেঁধে থার্ড ডিগ্রি নির্যাতন চালায়, তাদের কথা ভাবছি না, এ মুহূর্তে । তাদের কথাও ভাবছি না যারা কবিতা থেকে অর্থগোপনের তীব্র জেহাদ করে থাকে । বরং তাদের কথাই ভাবছি, যারা প্রায়-অর্থস্বচ্ছতাকেই নক্ষত্রমাত্রায় উত্তীর্ণ করেছেন, আবহমানের এই অন্ধকারে । তাদের কথা ভাবতে গিয়ে কতজনের ভীড়ে ক্বাব্বানিও আমার চোখে চট করে অন্তত এক কণা আলো ছড়ালেন । আর তাই আমার ভাষাবাধা সত্বেও, বাংলায় একে দৃশ্যমানতা দানের এই ক্ষুদ্র তাড়াহুড়ো । উৎসভাষা আরবি থেকে নয়, ইংরেজি থেকেই । এ কাজ তাই দুধের স্বাদ ঘুলে মেটানোর মতোই ।

তার কবিতা পড়তে গিয়ে আমার দেশের দুজনের নাম চট করে মনে এলো– আল মাহমুদ, আর শামসুর রাহমান । আর অবশ্যই ল্যাটিন আমেরিকার কবিতার পাঠকমাত্রেই পাবলো নেরুদার কথাতো মনে আনবেই । কে না জানে তাদের সবারই রয়েছে এক প্রেমটলমল মন । আর আছে নিজ সংস্কৃতি আর সমকাল নিয়ে তীব্র সচেতনতা । এ তিনের ত্রিবণীসঙ্গম ঘটেছে নিজার ক্বাব্বানির কবিতাতেও । এ যেমন নির্বাসনের তিক্ত স্বাদ এনে দিয়েছে তাকে, তেমনি নিজ দেশেই শুধু নয়, পুরো মধ্যপ্রাচ্যেই তাকে সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিদেরও একজনে পরিণত করেছে ।

তার তীব্র ও আন্তরিক উচ্চারণগুলো ব্যক্তির সুউচ্চ মানবিকচূঁড়াটি থেকে গড়িয়ে পড়ে অভিমানী অশ্রুর মতো পাঠক সমতলে– আর পুরো আরব বিশ্বের ইতিহাস-ধারার সমান্তরালে বেজে উঠে এই কবিতা-মনন। কল্পনা করি, ও-ভাষায় নিশ্চয় তার কবিতার অক্ষররাজি মুক্তোর মতোই ঝলমল করে। তবে কোন সুরে, কোন স্পন্দনে, ও কোন ছন্দে তারা হিল্লোলিত হচ্ছে– আরবি জানি না বলে আমার অজ্ঞতই থেকে গেলো ওসব। ইংরেজিতে পড়লেও তার কবিতার অতুল হীরকস্বচ্ছতা আর অপূর্ব উদ্বেলতা ঠিকই টের পাই আমি–আর আফসোস বাড়ে ।

ক্বাব্বানির কবিতা পড়তে গেলে মধ্যপ্রাচ্যে তার সমসাময়িক কবি নিজের দেশের এডোনিস, প্রতিবেশীদেশের মাহমুদ দারবিশ, কিংবা খানিকটা দুনিয়া মিখাইলের কথাও স্বাভাবিকভাবেই মনে আসবে। এসব কবির মতো তার উপরেও এয়াদা আমিচাই, আমিরী বারাকা, এলেন গিন্সবার্গ, আঁর্তোর র‍্যাবোর প্রভাব রয়েছে। আর কয়েক শতাব্দি দূরের কবি জন ডানের কাব্য কৌশল, শক এফেক্ট, দূরবর্তী বা প্রায়বিপরীত উপাদান বা বিষয়ের প্রগাঢ় ইঙ্গিত উৎসারী আকস্মিক-বিজলি-সম্মিলন তার কবিতাকেও দিয়েছে আন্তরিক দীপ্তি। আর এই কৌশল ওপাড় বাংলার সামপ্রতিক কবি রনজিৎ দাশেরও বড়ো অবলম্বন ।

আরো অনেকের মতো তারও কবিতা পড়তে গিয়ে মনে হলো, রাজনৈতিক কবিতা যে প্রায়শই কবিরা লিখে উঠতে পারেন না, তা যে বিষয়টির দোষে নয়, বরং বিষয়টি ঘিরে কবির কারুদক্ষতার স্বল্পতার কারণেই, ক্বাব্বানির কবিতা পড়লে আশা করি তা বুঝতে অসুবিধা হবে না অনেকেরেই।

ভাবলাম আমার এই আনন্দটুক, আমার এই তিক্ত অনুভবটুকু, পাঠকের সাথেও ভাগ করে নিই, আর যারা রাজনৈতিক কবিতার বিরোধী, বিশেষত বিতৃষ্ণাবশত, তাদের সাথেও, সে কারণেই এই অনুবাদে হাত দেয়া। তবে রাজনৈতিক কবিতা যারা অনবরত লিখে গেছেন, আর সব বিষয়কে একেবারেই প্রান্তে ঠেলে দিয়েছেন, এই বিতৃষ্ণার পেছনে কিছুটা দায় তাদেরও রয়েছে ।

যোগাযোগ-অনিবার্যতার পূজারী হয়ে স্বচ্ছতা আর অতিসরলতাকে গুলিয়ে ফেলার ভেতর দিয়েই আমরা ঊন-কবিরা কাব্যিশূন্য-বিবৃতির জমি প্রসারিত করতে থাকি। কবিতা প্রপাগা-ায় পর্যবসিত হয়। স্বচ্ছতা, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, ও নির্দিষ্ট মতাদর্শকে ফলিয়ে তুলতে গিয়ে সরলতার শিকার হলে চলে না কোনভাবেই। আর এমন কর্ম বিপুলভাবেই ঘটে রাজনৈতিক কবিতায়। রাজনৈতিক কবিতার ক্ষেত্রে এ অভিযোগ শুদ্ধসহি কবিদের পক্ষ থেকে জোরেসোরে ধ্বনিত হলেও, এ কথা রাজনীতিবিরাগ কবিতার ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য।

তবে বিবৃতি যে সবসময়ই ক্ষতিকর তা কিন্তু নয়, প্রতিভাধরের হাতে দুটি দূরবর্তী বিবৃতি পাশাপাশি বসে মন্তাজ-মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়ে এক তৃতীয়মাত্রা, মানে

কাব্যিক রূপও পরিগ্রহ করতে পারে। আর সেক্ষেত্রে এর কাব্যিকতার ভরবিন্দুটি দুটো বিবৃতির সাদা ও শূন্য ফাঁকটিতেই সজীবতা পায়।

শুদ্ধ সাহিত্যের-যে অমরতা-বোধী বা শ্বাশতকালীনতার প্রতি যে-অগাধ-টান তার সাথে হাজার বছরের ধর্মীয় বিশ্বাসেরও একটা প্ররোক্ষ সম্পর্ক আছে মনে হয়। পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের দুঃখ-কষ্ট শ্রমঘামের বিনিময়ে স্বাচ্ছন্দ্য না জুটলেও, মৃত্যুর পরে তা অমরতাসহ জুটবে– এমন একটা বিশ্বাসের মৃদু নিঃশ্বাস কি লেগে নেই এই শুদ্ধ কবিতার গায়ে! কিন্তু কোন আধুনিক মানুষই আর এ বিশ্বাসে স্থিত নয়। শরীরের অমরত্ব ফুরোনোর পর আত্মার অমরত্বের আকাঙ্খার মতোই এই বাচিক-অমরতা– এই হলো ট্রাজেডি। বিপরীতে, অবিশুদ্ধ সাহিত্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সাড়া দিলেও তারও আছে প্রয়োজন ফুরোনোর পরও আয়ুর অধিক টিকে থাকার ইচ্ছে, লোভক্ষোভও, যদিও তা অমরতা নয় কিছুতেই। তবু কোন্ কবি বাঁচে তিনশ বছর– এমন একটা দীর্ঘশ্বাস তাই শুদ্ধ কবিতার লেখকের মতো তাই অবিশদ্ধ কবির গায়েও এসে লাগো।

কোন একটি সংকট আর একে ঘিরে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেলে অশুদ্ধ কবির রাজনৈতিক কবিতা সার্থক হয়ে উঠে ঠিকই, একইসাথে এর সার্থকমৃত্যুও নিশ্চিত হয়। এদিক দিয়ে ভাবলে, রাজনৈতিক কবিতা যেনো ওষুধি গাছ, একবার ফল দিয়েই মরে যায়। কিন্তু বিশ্বপরিস্থিতি এতোই হতাশার যে, অনেক সংকট এমনকি বেঁচে থাকে হাজার বছর (আর এমনসব সংকটে বেশি সাড়া দেয় শুদ্ধ কবিরা, দীর্ঘজীবি সংকটে দীর্ঘজীবন নিশ্চিত হয় বলে কি!), পরিণতিতে অশুদ্ধ কবিরও দুর্ভাগ্য আর দুঃখের আয়ু হাজার বছরব্যাপী দীর্ঘ হয়ে যায় (আর শুদ্ধ কবিদের অভিযোগকে প্রায় সত্যে পরিণত করে: সমাজ পরিবর্তনে কবিতা কোন কাজে আসে না)। যদিও এসব অশুদ্ধ কবিতা অমরতার স্বপ্ন দেখতে চায় না কোনভাবেই! চায় না, কারণ, এর মানে এক চিরঅসুখ, এক সমাধানহীনতা, যার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছ আশ্বাসের মতো রাজনৈতিক কবিতাগুলো, না হলে প্রতিবাদ আদৌ জমে উঠবে কি? আর বস্তুত তা অশালীন, মানে এই অমরতা, এ শর্তে।

অন্যভাবে ভাবলে, সৌন্দর্যের সর্বজনীনতাতো বিলুপ্ত হয়েছেই। তদুপরি, সত্য আর সর্বজনীনতা বা সত্যের সর্বজনীন চেহারাটিও অবলুপ্ত হওয়ার পর সম্ভবত রাজনীতিই হয়ে উঠে দাঁড়ানোর জায়গা। আর এই বিষয়টি উত্তরাধুনিকদেরও আরাধ্য। সত্য আর ক্ষমতা-যে যমজ, আর তাদের ডাবলহেলিক্স-যে জীবনকে পেঁচিয়ে রেখেছে সবখানেই, সাপের মতো, সে কথা ভুলতে চাইছে না কেউ আর। কিন্তু তখনো সাপের বিষ যে সাপের আত্মরক্ষার জন্যই, অন্যকে নির্যাতনের জন্য নয়, মানে নির্যাতনবিরোধীগরল, সে কথাও ভুলতে চাচ্ছে না কেউ আর। আমরা তো জানি, সাপের বিষে ওষুধ হয়, আর মেডিসিন গ্রহণে এমনকি নিরাজ নন 'মিশেল ফুকো'ও! আর সত্যেও দোহাই পেড়ে ক্ষতা-যে পীড়নপ্রকট হয়ে উঠে, সে কথা মনে

রাখলেতো সেই প্যারাডক্সটিও সামনে আসে, শত্রুকেও বিশল্যকরণে ডাকা! তবে, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর প্রতিকারতো বঞ্চনা, উপেক্ষা আর অসুস্থতার বিরুদ্ধে, প্রয়োজনের বিরুদ্ধেতো নয়।

অশুদ্ধ সাহিত্যের মাঝে রয়েছে যোগাযোগের তীব্রতা, প্রয়োজনের ডাকে সাড়াপ্রদানের সাহস ও সততা, অর্থাৎ ব্যাক্তির সামাজিকমাত্রাটির উপর ভর রেখে শ্রেয়োবোধই এর চালিকা শক্তি যেনো। অন্যদিকে এসমস্ত গুণের চাপে এ হারিয়ে বসে ব্যঞ্জনার সমৃদ্ধি ও জাদুগুণ। আবার শুদ্ধ সাহিত্যের রয়েছে উদ্বোধনের তীব্রতা, ব্যঞ্জনার ঋদ্ধি কিন্তু এসব গুণের চাপে এর অর্জন হয়ে দাঁড়ায় সমকাল-নিঃস্বতা, আর যোগাযোগ-দারিদ্য, অর্থাৎ সমাজের ব্যক্তিকমাত্রাটির উপর ভর রেখে সৌন্দর্যবোধই এর চালিকাশক্তি যেনো। অশুদ্ধ সাহিত্যের রয়েছে প্রতিরোধী অনুভূতির এক জরুরি পরম্পরা, অন্যদিকে শুদ্ধ সাহিত্যের রয়েছে এক আনন্দ অনুভূতির পরম্পরা। একটিতে রয়েছে মনন-সহ হয়ে উঠার প্রবণতা, অপরটিতে রয়েছে সংবেদন-সহ হয়ে উঠার চাপ।

শুদ্ধ আর অশুদ্ধ কবিতা একে অপরের পরিপূরক হওয়ার বদলে কেন এক বিপরীত মূল্যে দাঁড়িয়ে গেলো? একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ হওয়ার বদলে কেন বিচ্ছিন্ন ও বিপরীতমুদ্রা অর্জন করলো এই জরুরত ও আনন্দ? আমাদের তো কোনটা ছাড়াই চলে না।

এর পেছনে আসলে বিংশশতকই প্রধানত দায়ী। মার্কসীয় রাজনীতির বিপুল উত্থান, বিপরীতে শিল্পবিপ্লবের ভেতর মনন ও ধনে ধনাঢ্য ব্যাক্তির বিকাশের অসম্ভব সুযোগ, এর বিপরীতে বর্ধমান মাত্রায় সাধারণ মানুষের তীব্র উচ্ছেদ হওয়া, মানসিক বিচ্ছিন্নতা, এসবের তীব্রতায় সৃষ্ট দ্বি-ভাজিত বিশ্বের চলমান ঠা-া ও গরম যুদ্ধটাও ছড়িয়ে পড়েছে সাহিত্যবিশ্বে বেশ গভীরভাবে। আর সাহিত্য রসের চেয়ে, নানান রাষ্ট্র, পার্টি ও পার্টিজানলোকের কাছে সাহিত্যের মূল্যায়নে রাজনীতিই হয়ে উঠেছে একমাত্র দিকনিদের্শী উপাদান। আর মূল্য যে সাহিত্যের জন্য ক্ষতিকর এ বিষয়টি বিংশতকের অনেকআগেই আবিস্কার হয়ে গেছে, আর পূঁজিবাদের বিকাশ শুরুর দিনগুলোতে এ ব্যাপক প্রতিষ্ঠাও পেয়ে গেছে। ফলে সাহিত্যের প্রান্তীয় অবস্থান পুজির বাজারে নির্ধারিত হয়ে যায়, স্নায়ুযুদ্ধের আগেই। বা মার্ক্সীয় উত্থানেরও বহু আগেই। সাহিত্য যতো বিশুদ্ধ হতে লাগলো ততই তার গা থেকে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৈতিকতা, ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদি কেন্দ্রিয় দৃশ্যমানতা হারাতে থাকে। বড়জোড়, শব্দ, ও বাক্যের আড়ালে সুপ্ত উপাদান হিসেবে, যেনো পাতার আড়ালে পাতাখোকো পোকার মতোই, ঘুমিয়ে থাকে। সাহিত্যের এই সংকুচিত রূপ থেকে উপযোগবাদী পাঠকরাও সটকে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। সাহিত্যের বিদ্যাবাগিস রূপটি দুর্বল, ও অবলুপ্তপ্রায় হয়ে উঠে পুঁজিবাজারে।

বামরাজনীতির উত্থান বারবার বিদ্যাবাগিশরূপটিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে ভিন্ন চেহারায়। এর ফল হয়েছে ডানপন্থী জগতের তীব্র বিরোধীতার মুখে পড়া, চূড়া বিরোধীতা। কখনো জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও, সহিত্যেও এ রূপটি পুজি-ভাবাদর্শের বিপরীতে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে বলে এর শ্রদ্ধেয় চেহারাকে কেটেছেটেবেটেবিবর্ণপ্রান্তীয় করে তোলা হয় বেশ ভালভাবেই। তবে বলা হয়ে থাকে, এখন এই রাজনৈতিক রূপটিকেও নিজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে আজকের এই বাজার সভ্যতা।

যদিও ধমীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যাবাগিশ সাহিত্যরূপটির চর্চা আজও করে, পুঁজিবাদী বিশ্বের এ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। নেই আসলে, মানুষের মননও ইতিমধ্যেই অনেক নড়ে গেছে বলে। নেহায়েত নিষ্ক্রীয় বিশ্বাসের প্রতি অনুমোদনবশত এর দিকে হঠাৎ হঠাৎ ফিরে তাকিয়েছে আজকের বেশকিছু মানুষ, যা আঁচর কাটেনি কখনোই সমাজশরীরে। ফলে এ হিসেবের বাইরেই থেকে গেছে, এমনকি গতশতাব্দির পুরো সময়পরিধিতেও। এ অবস্থার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে কবিতার উপর, সাহিত্যের অন্য যেকোনো জঁরের তুলনায়। ফলে, গরিষ্ঠজনেরই মত হয়েছে যে, ব্যবহারকে নিশ্চিত করার ভেতর দিয়ে মূল্য সাহিত্যকে নিঃশেষ করে ফেলে, আর কবিতাকেতো একেবারে খুনই করে ফেলে।

বাংলাদেশে এ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের হাত হয়ে বুদ্ধদব বসুর সক্রিয়তায় প্রবল হয়ে উঠেছে ত্রিশের দশকে। অস্কার ওয়াল্ডের আর গ্যাটের ওয়াইল্ড ইনফুলয়েন্স আধুনিক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতা যুগিয়েছে, একই সাথে পরবর্তী দশকের কবিদেরকে বিদ্রোহে বাধ্য করেছে। এর প্রভাব আজও বইছে বাংলা কবিতা।

চল্লিশে এই ছুতমার্গের বাইরে যেতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে কবিতা দর্বল ও প্রায় যুগের জটিলতার তুলনায় তার সাদামাটা রূপটির উর্ধ্বে উঠতে পারে নি বলে। আবার এই সাদামাটা রূপটি গড়াতে গড়াতে বাংলার মাটিতে সুক্তিযুদ্ধের প্রবল ছোঁয়া লেগে জমে উঠার বদলে আরো সরলসোজা হয়ে পানসে হয়েছে, যদিও অজস্র কবির মাঝে এর প্রভাব পড়েছে, আর এ ধরনের কবিতার বন্যায় বাংলাদেশ ভেসে গেছে, তাদের বুদ্ধদেব বসুর প্রতি ভক্তি থাকলেও, এমনই ঘটেছে। আর এই পানসে অবস্থার এরই বিপরীতে ক্রিয়া করে আশির দশকে আবার বাংলাদেশে শুদ্ধ সাহিত্য নিজের জায়গা করে নিতে চেয়েছে, কিন্তু এবার আর শুদ্ধ সাহিত্যে সেরকম দক্ষ হাত জুটেনি। কিছু ভাল ফসল যে ফলেনি তা নয়, তবে এও নিঃস্ব করেছে নিজের সাহিত্যকে সমকাল, দেশ, সংস্কৃতি, তার দেশিক ও বৈম্বিক রাজনীতির সাথে পূর্ণমাত্রায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার ভেতর দিয়ে। তো আশির হাত ধরে কবিতায় জাদুগুণ ফিরে এসেছে, কিন্তু এর যে বিষয়ষৌষ্ঠবতা, আর জনমগ্নতা তার অভাবে হাড়মাংসহীন একটা লাবণ্যবর্তী চামড়ার অধিকারীই হয়েছে কেবল এ দশকের

কবিতা– এটাই প্রবল চেহারা আশির কবিতার। উপহারশূন্য একটা অপূর্ব মোড়কের মতো, ভাললাগার জায়গা থেকে এরও শিশুমোহন একটা প্রয়োজনীয়তা আছেই বৈকি।

নব্বইয়ে এসে তরুণতর কবিরা অবিশুদ্ধ আর এই শুদ্ধ সাহিত্য দুটিতেই মজে থেকেছে, আর এর মিশ্র একটা রূপ জারিত হয়েছে তাদের হাতে, তবে পরিমাণে আরো স্বল্প, আশির কবিদেও মতোই।

কেউ যখন শুদ্ধ সাহিত্য পড়ে উচ্চারণ করে উঠে বাহ, কী ভাল লেগেছে। তখন এই ভাললাগাতো আমাদের অজ্ঞাতে ব্যবহার-মূল্যইকেই প্রকাশ করে যায়, কারণ তা অবিশুদ্ধ সাহিত্যের মতোই ব্যক্তিকে উজ্জীবিতই করেছে, আর তাতো কোন না কোন মূল্যের ভিত্তিতেই শুধু সম্ভব হতে পারে, হোক তা পাঠকের অজ্ঞাতেই। তো শুদ্ধ-সাহিত্য এভাবে চিরকালই ব্যর্থ হয়ে এসেছে, নিজের অজান্তে। বলছি তার লালিত সাহিত্য বিশ্বাসের ব্যর্থতার কথাই। অন্যভাবে বললে, এই ব্যর্থতা চিরপ্রার্থিতই তাদের কাছে।

অথচ যখনই কবিতায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আসে, তারা এই 'বাহ'-এর বিপরীত জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন। সে প্যারাডক্স তাদের রয়েছে। তবে তা পাঠকে নয়, শুদ্ধ সাহিত্যের উৎপাদকদের মাঝে। কোন সাহিত্যিক যখন বলেন, কবিতায় আমার রাজনীতি ভাল লাগে না, তখন তা ব্যক্তিরুচির পরিচয় বহন করে– সে এক কথা। আর যখন বলেন, রাজনৈতিক কবিতা ভাল নয়, তখন ব্যাপক আপত্তি করার কারণ রয়েছে- এ হলো একেবারেই ভিন্ন কথা।

কবিতা যদি পাঠকরুচির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, ভাললাগার উপরে এর বেঁচে থাকা নিশ্চিত হয়, তাহলে রাজনৈতিক কবিতাই কেবল একমুহূর্তে সবচেয়ে বেশি পাঠক জয় করেছে– স্টেডিয়ামভরা পাঠকতালি রাজনৈতিক কবিতার কপালেই জুটেছে, সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অতীতের মায়াকোভস্কি, আন্দ্রে ভজনস্কি, ইয়েভতেশেংকো, এডোনিস, ক্বাব্বানি বা মাহমুদ দারবিশের নাম না বলে কি পারা যাবে!

তবে কবিতার বিষয়টি ওই গণ হাততালির চেয়েও গভীর। কেননা তাদের কতজন কবিতাকে হাততালি দিয়েছে, আর কতজন কবিতাকে তুচ্ছ করে নিজের পার্টিজান মানসকেই তালি যোগিয়েছে– সেখবর কিন্তু আমাদেরই নিতে হবে। কবিতার জন্যইতো হাততালিটুকু চায় কবি, শুধু মতাদর্শটির জন্যতো নয়, যা কবিতার বাইরেও সুলভ। মতাদর্শের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন না কবি, বরং একে ধারণ করার পরও তার রচিত পংক্তিগুলোর কবিতা হয়ে উঠুক তাইতো চান। সেক্ষেত্রে তিনি নিজেই সবচেয়ে বেশি জানেন, কোন মাপে তিনি তার কবিতাকে মাপছেন, পুরস্কৃত বা দ-িত করছেন– পাঠকের হাততালিতেই বা সে-হিসেব কতটা

প্রতিফলিত। তো এই ফাঁরাকগুলো মাথায় না রাখলে, কবিতার বাইরেই ছিটকে পড়তে হবে কবিকে।

অন্য কথাটি হলো, বিশুদ্ধ কবিতার এতো যে পাঠক, তার অধিকাংশই বিনোদনকেন্দ্রিক কিনা তাও খেয়াল করতে হবে। অধিকাংশ পাঠক কাব্যবোধের বদলে নিজের বিনোদন-সংস্কার বা নিখাদ জৈবিকসংবেদন বা যৌনজাদুকেই হাত তালি দিয়েছে কিনা সে কথাকেও।

অন্যদিকে, একটা উত্তাল সময়ের মানবগোষ্ঠীকে তার সময়ের ভাবনার সাথে যে চূড়ান্ত একাত্মতা, তাই তাকে সবার সাথে সাদৃশ্যময় করে তোলেছে, ও সরল উচচারণকে অধিক কাব্যিক বলে মনে করেছে সে সময়ের মানুষ। এসব থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু আজকের কাব্যিক মানদ- বিচার করতে যাওয়া কতটা যৌক্তিক সে-কথা ভাবাও জরুরি। পরবর্তী সময়ের খাপে পূর্ববর্তি সময়ের কবিতাকে খাপ খাইয়ে নেয়ার মাঝেও একটা বাতিলকরন,হ্রাস করণ বিষয় রয়েছে। সময়ের স্পন্দন থেকে কবিতাবে বঞ্চিত করার একটা প্রক্রিয়া চালু হয় এর ভেতর দিয়েও।

তাছাড়া সাহিত্যে ব্যক্তি রুচি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে একজন ব্যক্তির রুচি বা রুচিহীনতা অন্যদের রুচি বা রূচিহীনতাকে অনুমোদন বা বাতিল করতে পারে না। কিন্তু সাহিত্যিকদের ক্ষমতা আর তার নির্দিষ্ট পাঠকদের উপর নিজের রুচির জানান দেয়ার ভেতর দিয়ে কোন একটা পাঠক শ্রেণীকে আপাত নিরুৎসাহিত করা যায়। সে কাজটাই করে থাকে শুদ্ধ সাহিত্যের লোকজনেরা। সমপরিমাণে অবিশুদ্ধ সাহিত্যিকেরাও তা করে থাকে, পার্টিজান কবিরাতো তা করেই।

তবে মজার ব্যাপার আমার ভাষার বর্তমান শুদ্ধ কবিরাও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক কবিতা হাপুসহুপুস করে গিলে তৃপ্তি পেয়েছেন বলেই জানি, এ আমার ব্যক্তি অভিজ্ঞতা। আর সেটা আমার দেশের নতুন প্রজন্মের সাথেই বেশি মানানসই, যেহেতু আমিও এদের পাশাপাশি চলমান। ভিন্ন দেশ বা ভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদর কথা তেমনতো জানি না। আমার সমকালীন কবিদের অন্তরঙ্গ বা পারিবারিক বা বন্ধুমহলে এই অপ্রকাশিত রুচির প্রকাশ ঘটে। তবে সামাজিক বা রাজনৈতিক এলাকায় লেখকের রুচির ঘোষণা বিপরীত বা একমুখী হয়ে পড়ে। যদিও হতে পারতো পুরিপূরক, এক অপরের। আবার বর্তমানের রাজনৈতিক কবিরাও শুদ্ধ কবিতার প্রতি তেমন পরান্মুখ বলে মনে হয়নি কখনো। তবে, অতি-উড়ুক্কু পাঠকের কথা বলছি না।

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে একেক কবির সামর্থ বিবেচনায়ওতো কবিতার বিষয় পরিধি সংকুচিত বা প্রসারিত হয়ে থাকে– সেকথা মাথায় রাখলে বিষয়টি কেবল কবির রুচির ব্যাপারেই সীমিত থাকে না, রুচির সাথে হাতের কলমের সংঘর্ষেও পরিণত হয়। তাই কবিতার ভেতরে নিজের সামর্থ্যের পরিচয় ঢেকে রাখার সুপ্ত রাজনীতিও এই রুচির জানান দেয়ার ভেতরে কবির অজ্ঞাতে জারি থাকে অনেকটা।

তদুপরি সৃজনের অনিশ্চিয়তাও, কবিকে প্রভাবিত করে, তিনি যেই ধরনের কবিতা রচনায়তেই ব্যপৃত থাকুন না কেন।

আর একটি কথা, সমস্ত বড়ো কবিরাই এই নেহায়েত বিশুদ্ধতার হাত সংকটের দিনে একটু সময়ের জন্য হলেও ছেড়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী, আফ্রিকা, দুই বিঘা জমি, সাধারণ মেয়ে, সত্যকাম এসবই সেই সংকট সময়ের সৃষ্টি। ইয়েটসের দ্য সেকেন্ড কামিং, ইস্টার ১৯৩৮, এন আইরিশ এয়ারম্যান ফরসিজ হিজ ডেথ– এসবের প্রসঙ্গ কিভাবে বিবেচনা করবো আমরা? কিংবা তার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভীড়ে যাওয়া– এ বিষয়টিকেই বা কীভাবে মূল্যায়ন করবো আমরা?

আমরা যখন রুচির দোহাই পাড়ি, নাহ ভালো লেগেছে, তখনো একথার জানান দেই না যে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক রুচি কতটাযে সময় প্রহৃত, আর নিজের অজ্ঞাতেও তা কতযে পরিবর্তনপ্রত্যাশী। আমরা একসময় কাউকে পড়ে মুগ্ধ হই, কয়েক বছর বা দশক শেষ হওয়ার পরই টের পাই সেই লেখককে ঘিরে আমাদের ভেতরে পানসে অনুভূতির আগমন। তখন কি লেখক খারাপ হয়ে পড়ে, তখনওতো পরবর্তি প্রজন্ম তাকে আকড়ে থাকতে দেখা যায়! আর নেহাত ভাললাগা কোন লেখকের উৎকর্ষের মানদ- হিসেবে খুব একটা কাজে আসে না। তাহলে যে যতো বেশি আমাকে দখল করে রাখে সেই লেখকের লেখাই কি ভাল লেখা? তাহলে নিজের কালের বাজারী জনপ্রিয় লেখকই উৎকৃষ্ট হয়ে পড়ে না কি? আমাদের সমালোচকরা যে বলে থাকেন, বেশ জনপ্রিয় কয়েকজন কবির কবিতাও নাকি ভাল না– এ বলার কারণ কি তার জাদুশূন্যতা, সমালোচককে ভাল লাগাতে ব্যর্থতা– নাকি আরো অধিক কিছু? নিশ্চয় অধিক কিছু, সে হলো নতুনত্ব আর বিষয়গৌরব অভাব, আর বিষয়কে ঘিরে গভীর ও পরিপূর্ণ অনুসন্দানের স্বল্পতা, সমাজনির্ধারিত চলন সীমাকে সংরক্ষণশীল লোকের মতো মান্য করে চলা, আরো অনেক কিছুই। অন্যদিকে, যে নিজের প্রজন্মকে মাতিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো, সেই প্রজন্মের ভাললাগাকেই বা আমরা বাতিল করবো কিভাবে! সামষ্টিক অনুমোদনের স্বার্থে, নাকি নিজের ব্যক্তিরুচির স্বার্থে? তো এই জটিলতাকেও মাথা রাখা দরকার আমাদের। আবার শুদ্ধ সাহিত্যিকের এক প্রজন্মের ভাললাগার পর আরেক প্রজন্মে এর সামনে মুখ থুবড়ে পড়াকেই বা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো আমরা?

দ্দদ্ধ সাহিত্যেও মূল কি কালে কী স্থানের দিক থেকে দূর গীসের গভীরে ছড়ানো। আর ইরোপের মনোমতো সাজানোগোছানো, যদিও গীস ইউরোপের একার সম্পদ নয়। তবে এই ইউরোপ সম্মত নন্দনতত্ব আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়াপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অনেক কিছুই ঠিকঠাক ধরতে পারে না। সেকথা আমাদেও ভুলে গেলে কি চলবে? এই বৈচিত্যও আমাদেও স্বাস্থ্যপ্রদ রোদ।

গ্রেট হতে হতে পুরাণিক গল্প হয়ে ওঠা লেখকরা তাদের নামই কেবল ভাসিয়ে রেখেছেন জনবলয়ে, তো তার লেখা নিয়ে সেই জাতিমাসন ব্যাপৃত নয় আর ততটা, যদিও তাকে শ্রদ্ধাটুকু করেই। আর বহুদূরের লেখকের কাব্য কৃতিকে সবটা নেওয়া যদি সম্ভব না হয়, এই দীর্ঘস্থায়ীত্ব এক অর্থে লেখকের ব্যাপ্তিকে কেমন হ্রাস করে থাকে, একই সাথে এ ধরনের প্রশ্নের পেছনে থাকে যে প্রজন্ম প্রশ্নটি তুলছে তার নিজস্ব রুচির শাসন। তো সেই রুচিও যেখানে আর সঠিক মাপকাঠি নয়, তো সেক্ষেত্রে কি জীবিতরাই শুধু মাপকাঠি হবে? আর জীবিতদের এই মাপ কাঠিকে যতোটা দৃঢ়তা দেয় পূর্বজরা, ততটুকুই কি পূর্বজরা অনুমোদিত হবে? তো এই বেঁচেবর্তে থাকা, বা টিকে থাকাও লেখকের লেখার সাপেক্ষে যতোটুকু শ্রদ্ধার, আনন্দের ভাবি, ঠিক ততটুকু গ্লাণীকরও বটে। লেখকরুচির নাট্যে বলয়িত হয়ে বা পাঠকরুচির নাট্যে তরঙ্গিত হয়ে ম্রিয়মানা শিখার মতো ধুকে ধুকে জাগা বিপুলতর অন্ধকারে– এর বেশি কী আশা করা যায়, এতো আশংকা ও আকাঙ্খার এই জটিল অরণ্যে।

আজকে যারা রাজনৈতিক কবিতার বিরোধী, তাদেরকে বলা যেতে পারে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, আর পূর্ব ইউরোপের যেসব কবি আমাদের দেশের গত দশকের ও আজকের পাঠক ও কবিদের কিছুটা হলেও ছুঁয়ে গেছে, তারা সবাই কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক বিশ্বাসের বীজ ছিটিয়েই কবিতাজগতে কৃষকতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সহজেই ভাসকো পোপা, হুলোব, নিকানোর পাররা, চেশোয়ার মিউশ, সিম্বোর্সকা সহ আরো অনেকের নাম বলতে হয়। আর আমার জানামতে আমাদের দেশের আজকের রাজনৈতিক কবিতার বিরোধীদেরও রুচি তারা জয় করে নিয়েছিলেন।

এদিকে, ব্যক্তি চেতনা যদি সমাজ নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে বলতে হয়, যত দূরেই যাও না কেন, আর নিজের যতো গভীরেই ডুব দাও না কেন, সবখানেই তার দেখা পাবে। তার আশ্লেষমগ্নই থাকবে, তা থেকে পালাতে পারবে না। তো রাজনীতি এ সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য উপাদান। অবচেতনার ভেতরেও এর শক্ত ঘাটি থাকতে বাধ্য। রাজনীতিসিক্ত হয়ে উঠতে বাধ্য যেকোন বিষয়ই। তবে রাজনৈতিক বিষয়, আর কোন বিষয়ের রাজনৈতিক হয়ে উঠার মধ্যে একটা সামনেপেছনে বা দৃশ্যমানতার মাঝে একটা কেন্দ্রপ্রান্ত, বা একটা প্রচ্ছন্ন-প্রকটতার পার্থক্য রয়েছে। আর সে কথাটাই বলে দেয়, শুদ্ধ কবিতায় রাজনীতি ভাষায় দৃশ্যমান থাকলেও সমাজসম্মত অর্থ উৎপাদন বা সংবেদনরীতির শিকার হয়ে তা প্রান্তীয় বা প্রচ্ছন্ন অবস্থাটিই কেবল আঁকড়ে থাকতে পারে, প্রধান উদ্ভাসনা লাভ করে না। তা অদৃশ্যমানতারই নামান্তর। বিশুদ্ধ কবিতায় যেকোন বিষয়ের প্রচ্ছন্ন-রাজনীতিটুকুই শিল্পের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত। না হলে তা ইঙ্গিতনাশ তথা কবিতা-নাশ-সম্ভবা হয়ে উঠে। আর এর বিপরীতে সমাজবলয়ে সিদ্ধ হয়ে রাজনৈতিকভাবে প্রধান ইস্যু

হয়ে ওঠা একটি বিষয়কে কাব্যিক করে তোলার মাঝে বিষয়টির রাজনৈতিক উদ্ভাসনার প্রধান্যকে তারা মেনে নিতে পারে না। সত্য যে, বিষয়টির অতি-পরিচিতি নিজেরই কাব্যিক বাধা হয়ে উঠে। তবে তা অনেকটা ফর্মালিস্টিক সংস্কারও বটে। কবিতা শুধু অজ্ঞাতেরই কারুভাষ ঘটায় না, অতিজ্ঞাতের মাঝেও আনে অপরিচয়ের আভা, মানে নবমাত্রায় উদ্ভাসনের জাদু। তো পরবর্তী অংশটি সমপরিমাণেই অস্তিত্বশীল কাব্যিক জগতে– আর তা ইস্যুভিত্তিক ও রাজনৈতিক বা অশুদ্ধ কবিতাতেও কি সমভাবে প্রযোজ্য নয়?

তো আবার ক্বাব্বানিতে ফিরে আসি। তাকে পড়তে পড়তে আরো কত জানেরই না নাম মনে আসে।

ভালবাসি যখন
সমস্ত গাছপালাই
আমার দিকে ছুটে আসে খালি-পায়ে...

এই পংক্তি তিনটি পড়তেই চট করে মনে এলো রণজিতের উদ্ভিদ কবিতাটি যেখানে তিনি ভালবাসার সাথে সংশয়কে মিশিয়ে নিজের করে নিয়েছেন, আত্মসাৎ কী চমৎকারভাবেই না আত্মীকরণ হয়ে উঠেছে!

আরেকটি কথা, অন্তর্জগতের কবিতা তো পাঠকের কাছে বহিজগতের উপাদান– তো পাঠক যখন পড়ে তখন কি তা কবির অন্তর্জগতকে আবিস্কার করে কবিতায়, নাকি পাঠক নিজের অন্তজর্গতকে বিনির্মাণ করে ওই কবিতার আশ্রয়ে? তো পাঠকের কাছে সবই বহির্জগতের বস্তু। আর সেক্ষেত্রে অন্তর্জগতের কবিতার ওইযে ভাজিনিটির দাবী, তা ভাষা প্রথমত একটি বর্হিজাগতিক উপদান হওয়ায়, মন নিজেই বহিজাগতিক বিন্যাসপ্রাপ্ত, আর কবিতাটি পাঠকের কাছেও বহির্জগতের বস্তু হিসেবেই আবির্ভূত– এভাবে বললে সমস্ত শুদ্ধ কবিতাই দ্বিগুন বর্হিজাগতিক!

ক্বাব্বানির কবিতা পড়তে গিয়ে আমাদের কবিতা জগত নিয়ে একটা সংস্কার চোখে পড়লো, সে হলো কাব্বানিকে দ্রোহী হতে গিয়ে, প্রগতিশীল হতে গিয়ে, নিজের ধর্মীয় সংস্কৃতিকে এড়িয়ে যেতে হয়নি, তার ধর্মীয় সাংস্কৃতিক উপাদান ও শব্দগুলো তার কবিতাকে সুঠাম করেছে, অথচ আমাদের দেশে তিনটি ধর্মের সাংকৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ– যদিও আমাদের কবিরা সনাতন সংস্কৃতির উপাদান নিয়ে কোন ছুঁতকারতায় ভোগেন না, আর বুদ্ধ সংস্কৃতির নানা উপাদান ব্যবহার করে নিজেদের প্রগতিশীলতাকেই দৃঢ়তা দেন, আর মুসলিম সংস্কৃতিক উপাদান এড়িয়ে চলার ভেতর দিয়ে নিজেকে যেনো প্রতিক্রিয়াশলতার হাত থেকেই রক্ষা করেন– অথচ তিনটি গ্রহনে বর্জনে এর মুখোমুখি হয়েই আমাদের প্রকাশ দৃঢ় হতে পারে। ক্বাব্বানি যেনো মুখোমুখি হয়েছেন এসবের, এড়িয়ে যাননি। তাতে যেমন

প্রতিক্রিয়াশীল হননি তিনি, তেমনি প্রগতিতেও টান পড়েনি তার। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে কিছুটা ব্যাতিক্রম বলা যায় আলমাহমুদ, শামসুর রাহমান আর ফরহাদ মজহারকে। এক্ষেত্রে একক কবিতা হিসেবে আলমাহমুদের সোনালি কাবিন কবিতাটি নিংসন্দেহে একটা মাইলফলক, যাতে এই তিন সংস্কৃতিগত উপাদানের সাথে মিশেছে প্রগতিশীল ভাবনা, আর ব্যক্তির তীব্র দ্রোহ।

ক্বাব্বানির ছুঁতোয় এত কথা শেষ করার আগে, বলতে হয়, সব কবির মতো তারও আছে স্ববিরোধ। রাজনৈতিক প্রতিরোধে যে বিষয়কে তিনি অবলম্বন করেন, নারীবাদী ইস্যুতে তাকেই আবার খারিজ করে দেন। কিংবা এর অন্য অর্থও হতে পারে, আসলে কোন বিসয় বা বিম্বাসকে পুরো খারিজ করেন না, বরং একই উপাদানের ইস্যু অনুসারে এর সুবিধা ও সীমাই হয়তো পরোক্ষে জানিয়ে দিয়ে যান একাধিক কবিতার ভেতর দিয়ে আমাদের।

এমন ভাবনা পেয়ে বসলে, মাঝে মাঝে মনে হয়, স্ববিরোধ ছাড়া সৃজনই অসম্ভব। তবু তা গোচরীভূত হওয়া ভাল, আজকের দিনে। যেমন বিশুদ্ধতা ভাল বলার সাথে সাথে, হিটলারের নাশকতার কথাও আমাদের জানতে হবে। গুণের ভজনা ভাল, কিন্তু একইসাথে আমাদের জানতে হবে, হাজার বছর ধরে চতুর্বর্ণাশ্রমের ভেতর বৈশ্যদের জীবনের অসম্ভব অবমাননা। শুভ্রতা ভাল, কিন্তু মনে রাখতে হবে এর ভেতর দিয়ে কালো জাতিগুলোর প্রতি অমানবিক নির্যাতন। সৌন্দর্য ভাল, তবে মনে রাখতে হবে সত্যকে চাপা দেয়ার ক্ষেত্রে এর পারঙ্গমতা। সঙ্গীত ভাল, মনে রাখতে হবে, এর বিষয়মুক্ততা, চূড়াবিমূর্ততা। বাস্তব ভাল, মনে রাখতে হবে এর রুক্ষতা, স্থবিরতা ও অসহনীয়তা। প্রগতি ভাল, মনে রাখতে হবে এর বৈচিত্রবিনাশী চেহারা! কী–আর থাকে তবে, বিশুদ্ধতা, অবিশুদ্ধতা, রাজনীতি, কিংবা রাজনীতিহীনতা– কোন একটির প্রতি বিশুদ্ধ মোহবিস্তারের পেছনে! তবু এ সবই যেনো আছে মৃত্যুর মতো এক মহৎ প্রয়োজনে, অবলীন হয়ে, আমাদের সাথে, আমাদের চারপাশে!

এন্থনি লাভ পিককের লেখা এক চিঠিতে ১৮১৯ সালের পিটারলোর গণহত্যা সম্পর্কে বর্ণনা পড়ে পার্সি বিসি শেলি লিখেছিলেন 'দ্য মস্ক অব এনার্কি' কবিতাটি, তারই তিনটি লাইন:

"Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you-
Ye are many — they are few".

তবু শক্তি, ক্ষমতা, ভোগ, উপভোগ আর সচেতনতার ক্ষেত্রে হাজার বছরেও গরিষ্ঠরাই লঘিষ্ট রয়ে গেলো, বিপরীতে অতি লঘুরাই হয়ে রইলো গরিষ্ঠ। এই

দুঃখজনক অবস্থাটি, এই অসহ পরিস্থিতি কবিদের দিয়ে সবসময়েই কি রাজনৈতিক কবিতাগুলো লিখিয়ে নেবে না? আর সবার মতো আমিও চাই রাজনৈতিক কবিতার অবসান, কিন্তু হতাশার কথা হলো চলমান ব্যবস্থার ভেতরে এও সম্ভবত অসম্ভব, দূর ভবিষ্যত অবধি!– তা আসলে অপ্রতিরোধ্য ডিস্টোপিয় বাস্তবতা। আর ব্যাক্তির অর্জিত যে সৌন্দর্য্যবোধ তা তাকে দিয়ে চিরকাল শুদ্ধ কবিতাও লিখিয়ে নেবেই– আপন সৌন্দর্যবোধের স্থিতিশীলতা তথা দীর্ঘায়ু মুখ দেখতে চেয়ে– যা আসলে এক পরবর্তনশীল প্রিয়-ইউটোপিয়ার দিকে অভিগমন আর অপ্রতিরোধ্য।

.....

প্র ব ন্ধ / অ র্থ নী তি

চার দশকের অর্থনীতি

.....

আ তি উ র র হ মা ন

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম আর অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বমানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ, বাংলাদেশ। এই বিজয়ে আনন্দের পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ ও ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তেভেজা মুক্তিযুদ্ধের কথা কখনো ভুলবার নয়। একাত্তরের এই মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, যাঁরা জীবন দিয়েছেন সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের আর যে মহানায়কের দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে পেরেছি, সেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আজ গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ। অসংখ্য নাম না-জানা শহিদ। তাঁদের মৌল আকাঙ্ক্ষা ছিল মুক্তি। সকল ধরনের মুক্তি। স্বাধীনতার পর চার দশক পার করেছে বাংলাদেশ। একটি দেশ বা জাতির ইতিহাসে চার দশক হয়তো খুব বেশি সময় নয়, একটি প্রজন্মেরও কম। তবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জাতীয় অগ্রগতির জন্য এই

সময়কাল তেমন কমও নয়। বাস্তবে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত চার দশকে অনেক সাফল্য যেমন অর্জন করেছে, তেমনি এর বেশকিছু ব্যর্থতাও আছে। এই প্রেক্ষাপটে চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রত্যাশা ও অর্জনের একটি পর্যালোচনা 'চার দশকের বাংলাদেশ : অর্থনীতির নবযাত্রা' শীর্ষক এই বক্তৃতার মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। শাহবাগে তরুণ প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধাভিমুখী চেতনার উন্মেষক্ষণে এই আয়োজন গভীর তাৎপর্য বহন করে। আমাদের সচেষ্ট স্বাধীনতার ফলস্বরূপ হালের গতিময় অর্থনীতির বিশ্লেষণ ও আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার গ্রহণের এইতো সময়।

২। একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পেছনে ছিল গভীর সব স্বপ্ন ও প্রত্যাশা। সেই স্বপ্নে ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ থেকে মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং আত্মনির্ভরশীলতার অঙ্গীকার। বাংলাদেশের অভ্যুদয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্বে সংঘটিত হলেও একটি কথা মনে রাখতে হবে, এই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল চালিকাশক্তি ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে চরম আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণেই বেগবান হয়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভাষা আন্দোলনের সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যেসব আন্দোলন দানা বাঁধে সেগুলোর পেছনে বাঙালির অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি সক্রিয় ভূমিকা রাখে। তবে, ষাটের দশক থেকে এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্বরূপ আরো স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হতে শুরু করে জনগণের কাছে। সে সময়কার কিছু দেশপ্রেমিক বাঙালি অর্থনীতিবিদের গবেষণা ও বিশ্লেষণে উঠে এসেছিল বৈষম্যের প্রকৃত চিত্র। তাঁদের হিসাব থেকেই জানা যায় যে, জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান বৃহত্তর অংশ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ থাকত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কর আদায় হত এ এলাকার জন্য মোট বরাদ্দেরও বেশি। বৈদেশিক সাহায্যের বেশির ভাগ বরাদ্দ পেত পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিপণ্য রপ্তানির (মূলত পাট ও চা) পুরোটাই ব্যয় করা হত পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের একটি পোস্টারে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়। জনসংখ্যায় বাঙালিরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে বছরে রাজস্ব ব্যয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে তিনগুণেরও বেশি। চাল, আটা ও তেলের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে ছিল দ্বিগুণ। কেন্দ্রীয় সরকার ও সামরিক বিভাগের চাকরির প্রায় ৯০ শতাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের দখলে। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপরও নিপীড়ন নেমে আসে। এসব বৈষম্য ও বঞ্চনা পুঞ্জিভূত হয়ে ক্রমশ রূপ নেয় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, যার বহিঃপ্রকাশ ও

সফল সমাপ্তি ঘটে একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের এসব শোষণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যেই ঐতিহাসিক ছয়-দফা উপস্থাপন করেন বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিক্ষুব্ধ বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের সমুচিত জবাব দেয় সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে। ঐ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। পরিণামে ১৯৭১ সালের পুরো মার্চ মাস ধরেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে চলে অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মূল কথাটিও ছিল সকল ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি। অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিও বেশ স্পষ্ট করেই উঠে এসেছিল তাঁর ঐ অতুলনীয় ভাষণে। উত্তাল মার্চের ২৬ তারিখের প্রথম প্রহর থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

৩। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশের পথচলা শুরু হয় আলো-আঁধারের মধ্য দিয়ে। আলোর দিকটি হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তির যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলাদেশের জনগণের, তা পূরণ হয়। আকাঙ্ক্ষা ছিল সামাজিক বৈষম্য দূর করা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত, গতিশীল এবং উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। আর আঁধারের দিকটি হল উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যপীড়িত ও ভঙ্গুর অর্থনীতির হাল ধরতে হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে শুধু দারিদ্র্যই ছিল না, দারিদ্র্য দূর করার জন্য যে হাতিয়ারগুলো থাকা প্রয়োজন, সেগুলোও বাংলাদেশের ছিল না। ছিল না অর্থ, অবকাঠামো কিংবা দক্ষ জনশক্তি। তখন বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ, অর্ধাহার-অনাহার কবলিত, বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অভাব-অনটনের দেশ হিসেবে। দেশের বন্দর, পরিবহন ব্যবস্থা ও শিল্প-কারখানা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত। পাট ও চা-এর মতো কয়েকটি পণ্যে সীমিত ছিল রপ্তানিবাণিজ্য। রেমিট্যান্স আসত না। ছিল না বিদেশি মুদ্রার তেমন কোনো রিজার্ভ। আইএমএফ সদস্যপদ ছিল না। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নাজুক ও ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেখে অনেকেই হতাশ হয়েছিলেন এবং এর স্থায়িত্ব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার সত্তর দশকের বাংলাদেশকে বিদেশি সাহায্যনির্ভর 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। নরওয়ের অর্থনীতিবিদ ফাল্যান্ড ও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ পারকিন্সন বাংলাদেশকে বলেছিলেন 'উন্নয়নের পরীক্ষাগার'। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত বই 'বাংলাদেশ : টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট'-এ তারা লিখলেন, 'এ রকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন করতে পারে, তাহলে পৃথিবীর যে কোনো দেশের পক্ষেই উন্নয়ন সাধন সম্ভব'। এই

অর্থনীতিবিদদ্বয় ২০০৭ সালে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে কিছুটা হলেও সরে আসতে বাধ্য হন, 'তিন দশক এবং তার বেশি সময়ের সীমিত ও বর্ণাঢ্য অগ্রগতির ভিত্তিতে মনে হয় বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব'। অর্থাৎ এককালের নেতিবাচক ধারণা পোষণকারীরা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে এখন বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। নামকরা সব বিশ্ব গণমাধ্যমের চোখেও হালের বাংলাদেশের বিস্ময়কর অগ্রগতির ভঙ্গিটি প্রতিনিয়তই ধরা পড়ছে। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণায় এখনো বাংলাদেশ উন্নয়নের পরীক্ষাগার, তবে ইতিবাচক অর্থে। এত কম মাথাপিছু আয়ের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের সুসংহতকরণ এক সাথে চলতে পারবে কিনা, সুশাসনের অসম্পূর্ণতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব সত্ত্বেও এত প্রবৃদ্ধি হল কেমন করে, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার পর্যাপ্ত উন্নতি না হলেও এ রকম প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা যাবে কিনা, এসব বিষয়ে বাংলাদেশকে এখন উন্নয়নের পরীক্ষাগার বলা হচ্ছে। কেউ-বা রোল মডেলও বলছেন।

৪। বৈদেশিক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বহুজাতিক বিনিয়োগ সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাক্সের পূর্বাভাসের গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট। এক দশক আগে সংস্থাটি চারটি দেশের সম্ভাবনার কথা বলেছিল। দেশগুলো ছিল ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া এবং চীন। তাদের পূর্বাভাস সত্যি হয়েছিল। পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যুক্ত করে দেশগুলোর আদ্যক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে এই অর্থনৈতিক জোটের নামকরণ হয় ব্রিকস (BRICS)। সম্প্রতি গোল্ডম্যান স্যাক্স সম্ভাবনাময় আরো ১১টি দেশের একটি নতুন তালিকা তৈরি করেছে। এ দেশগুলোর অর্থনীতিও এগিয়ে আসছে বলে এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'নেক্সট ইলেভেন'। এই উদীয়মান এগারটি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। সংস্থাটি বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছে, দেশটির বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার বেশির ভাগই তরুণ। এদের মাধ্যমে দেশটির ভবিষ্যৎ বদলে দেয়া সম্ভব। আমারও বিশ্বাস, সচেতন তরুণসমাজই বাংলাদেশের সম্ভাবনার প্রতীক। তাদের প্রত্যয়, প্রযুক্তিপ্রিয়তা, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সাহস ও দক্ষতাই বাংলাদেশকে দ্রুতলয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এছাড়া, জেপি মরগান পাঁচটি ফ্রন্টিয়ার অর্থনীতির নাম উল্লেখ করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সব ধরনের সুযোগ বাংলাদেশে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের পূর্বাভাসে বলেছে, ২০৩০ সাল নাগাদ 'নেক্সট ইলেভেন' সম্মিলিতভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২৭টি দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। লন্ডনের জাতীয় দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান লিখেছে, ২০৫০ সালে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির বিচারে পশ্চিমা দেশগুলোকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাছাড়া, মুডি'স ও স্ট্যান্ডার্ড

এন্ড পুওর'স গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের সন্তোষজনক অর্থনৈতিক রেটিং দিয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রক্ষেপণও স্থিতিশীল ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের ইঙ্গিত বহন করে। বিশ্বখ্যাত সংস্থাগুলোর এসব পূর্বাভাসই প্রমাণ করে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা।

৫। গত চার দশকের পথচলায় বাংলাদেশের অর্জনের তালিকা খুব ছোট নয়, বরং গর্ব করার মতো অনেক অর্জন রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষিখাতের উৎপাদন, তৈরি পোশাক রপ্তানি ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, যার পেছনে রয়েছে এ দেশের কৃষক, মেহনতি ও শ্রমজীবী মানুষের অবিস্মরণীয় অবদান। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। সত্তর দশকের প্রথম দিকে দেশে চাল উৎপাদন হত এক কোটি টন। জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। উৎপাদিত খাদ্যে ষাট ভাগ চাহিদা মিটত। বাকি খাদ্য আমদানি করতে হত। অথচ বিদেশি মুদ্রার মজুদ ছিল সামান্য। তাই বিদেশিদের কাছে খাদ্যসাহায্যের জন্য নিয়মিত হাত পাততে হত। গত চার দশকে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। কৃষকদের সৃজনশীলতা ও কঠোর পরিশ্রমের কারণে বাংলাদেশ বর্তমানে এক খাদ্য-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্য উৎপাদনে অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। একাত্তরের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে সাড়ে তিনগুণেরও বেশি, বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন কোটি ৫৭ লাখ টন। আর দেশে চাল ভোগের পরিমাণ বছরে প্রায় তিন কোটি টন। গত দু'বছর ধরে বাংলাদেশ চাল আমদানির ইতি টেনেছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে দেশের বর্তমান খাদ্যমজুদ পরিস্থিতিও ভালো রয়েছে। বাংলাদেশ এখন আর 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নয়, বরং ঐ ঝুড়ি এখন খাদ্য ও বিদেশি মুদ্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে। বাংলাদেশে এখন আর দুর্ভিক্ষ হয় না। 'মঙ্গা' শব্দটিও দেশ থেকে নির্বাসিত। অল্প সময়ে এতবড় সাফল্য কৃষকরাই এনেছেন। মুক্তিযুদ্ধের মতোই কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর সংগ্রামে কৃষকরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। তারাই আমাদের প্রকৃত বীর। কৃষি উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি এগিয়েছেন নারীরাও। কৃষকদের সাথে যারা কৃষিখাতের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন, নীতি-পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছেন, কৃষির উন্নয়নে ঋণ দিয়েছেন–তাদের অবদানও কম নয়।

৬। দেশের অর্থনীতির নবযাত্রায় গার্মেন্টস শিল্পের ভূমিকা অসামান্য। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প এভাবে দাঁড়াবে তা দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় কেউ ভেবেছেন বলে মনে হয় না। আমার মনে আছে সত্তরের দশকে কিছু টেইলারিং শপ গড়ে উঠেছিল কমলাপুর এলাকায়। সেখান থেকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম

গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানিকারক দেশ। এই অসামান্য সাফল্যগাথার অগ্রনায়ক ছিলেন দেশ গার্মেন্টসের বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল কাদের খান। বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে এখন বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের ওপরে, একমাত্র চীনের পরেই তার অবস্থান। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাত হচ্ছে এই পোশাকশিল্প। মোট রপ্তানি আয়ের ৭৮ শতাংশই আসছে এ খাত থেকে। প্রায় ৪০ লাখ শ্রমজীবী এ পেশায় নিয়োজিত, যার আশি ভাগই নারী এবং বেশির ভাগ শ্রমিকই এসেছে কৃষক পরিবার থেকে। শ্রমবাজারে এদের অংশগ্রহণ সামাজিক সূচক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। মজুরি অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বেশ খানিকটা কম হলেও এই শ্রমিকরা খুবই দক্ষ, কাজও করে অনেক বেশি। বাংলাদেশ এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তুলনামূলক কম খরচে উন্নত মানের পোশাক তৈরি করে চলেছে। চীনেও পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে। তাই তারা পোশাকশিল্পের মতো শ্রমঘন শিল্প থেকে তাদের বিনিয়োগ হাইটেক ও ভারী শিল্পের দিকে সরিয়ে নিচ্ছে। তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক ক্রেতারাও এখন চীনের পরিবর্তে বাংলাদেশমুখী হচ্ছেন। বাংলাদেশকে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। শুধু রপ্তানির জন্যই নয়, স্থানীয় বাজার চাহিদার কারণেও এ শিল্প দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিকশিত হবে বলে আশা করা যায়। তবে, এর জন্য প্রয়োজন হবে ভূমি ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো। কালবিলম্ব না করে গড়ে তুলতে হবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল যাতে থাকবে জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ। থাকবে পর্যাপ্ত কানেকটিভিটি ও নিরাপত্তা। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির সহিংসতায় আমাদের অগ্রসরমান রপ্তানিখাত বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছে। এ পরিস্থিতির দ্রুত অবসানের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্তভাবে কাম্য। আর সেজন্য সকলকেই একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

৭। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স এখন আমাদের অর্থনীতির অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ যে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে তার মূলে ভূমিকা রাখছে এই রেমিট্যান্স। স্বাধীনতার আগে বিশ্ব শ্রমবাজারে বাঙালি কর্মীর সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। স্বাধীনতা যেন বিশ্বের কর্মদুয়ার খুলে দিয়েছে বাংলাদেশীদের জন্য। বাংলাদেশের মানুষ আজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশান্তরে। বাংলাদেশের একটি গ্রামও বুঝি এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে গ্রামের কিছু মানুষ বিদেশে কাজ করেন না। হালে নারীকর্মীরাও ব্যাপকহারে বিদেশে যাচ্ছেন। বর্তমানে পৃথিবীর দেড় শতাধিক দেশে কাজ করছেন বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লাখ কর্মী। প্রতি বছর প্রায় ৬ লাখ কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হচ্ছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে সপ্তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

এই রেমিট্যান্সের পরিমাণ আমাদের মোট জিডিপি'র ১০ শতাংশের বেশি, রপ্তানি আয়ের অর্ধেকের বেশি এবং প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের প্রায় ১০ গুণ । ২০১২ সালে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ। বর্ণিত সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে ১৪.২ বিলিয়ন ডলার। আর চলতি অর্থবছর শেষে রেমিট্যান্স ১৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। রেমিট্যান্স আকারে যে বিদেশি মুদ্রা আসছে তা কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে। ফলে কৃষিব্যবস্থা আধুনিকায়ন হচ্ছে। উৎপাদন বাড়ছে আশানুরূপভাবে। বিদেশি মুদ্রা রিজার্ভেও বিশেষ অবদান রাখছেন প্রবাসী কর্মীরা। তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের কল্যাণে চলতি বছরের শুরুতেই বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। রিজার্ভ মার্চ মাসের শুরুতেই ১৪ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড ভেঙেছে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের বিপুল পরিমাণ রিজার্ভ সৃষ্টি হওয়াটা যে কোনো বিচারেই বিরাট অর্জন। কোনো দেশের তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো রিজার্ভ থাকলেই তাকে সন্তোষজনক রিজার্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের রিজার্ভ ১৪ বিলিয়ন ডলার, যা দিয়ে দেশের পাঁচ মাসের মতো আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।

৮। আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপেই যে এগুচ্ছে বাংলাদেশ তা সাদা চোখেও ধরা পড়ছে। ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রাজস্ব বাজেট ছিল ২৮০ কোটি টাকা। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলে চলতি অর্থবছরে তা প্রায় এক লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা। স্বাধীনতার পর প্রথম দশকের (১৯৭২-৮১) তুলনায় গত দশকে (২০০২-১১) টাকায় গড় নমিনাল জিডিপি ২৮ গুণ বেড়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে (১৯৭৩-৮০) বাংলাদেশে গড়ে ৩.৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের প্রবৃদ্ধির হার যেখানে ৩ শতাংশ সেখানে ৬ শতাংশেরও বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে বাংলাদেশ। গত তিন অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৪ শতাংশ হারে। চলতি অর্থবছরেও প্রবৃদ্ধি এই হারের চেয়ে বেশিই হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। অবশ্যি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিশ্বের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপরও এই অর্জন অনেকাংশেই নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পেরেছে। দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। চার দশক আগে দারিদ্র্যের হার ছিল ৭০ শতাংশেরও বেশি। ২০১০ সালে দারিদ্র্য ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বর্তমানে তা ২৯ শতাংশের নিচে। আমার ধারণা, ইতোমধ্যেই দারিদ্র্যের হার ২৭ শতাংশে নেমে এসেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি'র অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্যের হার ২০১৫ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। এ ক্ষেত্রে

বাংলাদেশ যে সাফল্য অর্জন করেছে তাতে মনে হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের আগেই এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। বৈষম্যের সূচকও হয় স্থিতিশীল অথবা নিম্নমুখী। তাই সামাজিক উন্নয়নের ধাপকেও সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। সরকারি ও অ-সরকারি নানা উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির হারের রাশ টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে দেড় শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশী নারীরা গড়ে ৬.৩টি সন্তান জন্ম দিতেন, ২০১১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ২.৩। এটা সেই হারের কাছাকাছি, যে পর্যায়ে পৌঁছালে দেশের জনসংখ্যা দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীল থাকে। স্বাধীনতার আগে মাথাপিছু আয় ছিল ১০০ ডলারের মতো, বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৮৫০ ডলার। মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে ৭৭২ ডলার। দুই দশক আগেও যেসব শ্রমিকের দৈনিক আয় একশ টাকার নিচে ছিল, তাদের দৈনিক আয় এখন প্রায় ৪০০ টাকা। সংসারের দৈনিক খরচ মিটিয়ে এখন কিছু না কিছু এদের হাতে থাকে। সেই উদ্বৃত্ত দিয়ে দেশে তৈরি নানা শিল্পপণ্য তারা কিনতে পারছে। এভাবেই দেশের ভেতরেই একটি শক্তিশালী চাহিদাকাঠামোর ভিত্তি তৈরি হয়েছে। আর এ কারণেই আমরা অনেক দেশের চেয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি। এত অল্প সময়ে বিশ্বের অনেক দেশই এমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

৯। আমাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতের বেশকিছু ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০১১ সালে জাতিসংঘের এমডিজি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুমৃত্যুর হার, নারীর ক্ষমতায়ন, এইচআইভি-এইডস প্রতিরোধ–এ ধরনের এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ হয় পুরোপুরি নতুবা আংশিক সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে। শিশু মৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন করেছে। মানবস্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রশ্নে ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় অধ্যায় ধরা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ খাতে জাপানের অগ্রগতিকে। মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সফলতা জাপানের ঐ অগ্রগতির সঙ্গে তুলনীয়। ১৯৭১ সালে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ১৪.৬ শতাংশ। ২০১১ সালে তা ৩.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশে মা-মৃত্যুর হার ২০১১ সালে ২.১৮ শতাংশে নেমে এসেছে। মানুষের গড় আয়ু চার দশকের ব্যবধানে ৫০ থেকে ১৯ বছর বেড়ে ৬৯ বছরে দাঁড়িয়েছে। এই গড় আয়ু এখন প্রতিবেশী ভারতের চেয়ে ৪ বছর বেশি, যদিও ভারতীয়রা মাথাপিছু আয়ের সূচকে দ্বিগুণ ধনী। বাংলাদেশে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা চার দশক আগের তুলনায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। বাংলাদেশের এসব সাফল্যের মূলে রয়েছে ব্যাপক জনসচেতনতা।

সরকারি ও অ-সরকারি উদ্যোগগুলোর মিলিত সাফল্য এটি। এক সময় যে জনগোষ্ঠীর নিত্যসঙ্গী ছিল কুসংস্কার, আধুনিকতার প্রতি ছিল যারা বিরূপ আজ তারাই শিশুদের টিকা দেয়ার জন্য ছুটছেন, খাবার স্যালাইন খাওয়াচ্ছেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন। গত চার দশকে জনগণের শিক্ষার হার দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৫৬ শতাংশে। প্রাথমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষের আনুপাতিক অসাম্য দূরীকরণে বাংলাদেশের সাফল্য বিশাল। প্রাথমিক স্তরে ১৯৯০-এর দশকে ছেলেমেয়ের অনুপাত যেখানে ছিল ৫৫ ঃ ৪৫, মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে নারীশিক্ষার কল্যাণে বর্তমানে এ অনুপাত সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ ঃ ৪৭-এ। গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশ সামাজিক উন্নয়ন সূচকে ৬৫ শতাংশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। জাতিসংঘের ২০১২ সালের প্রতিবেদনে মানবউন্নয়ন সূচকে ১৮৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬। আর্থ-সামাজিক অবস্থার এসব ইতিবাচক সূচকই প্রমাণ করে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে 'বিস্ময়কর অগ্রগতি' হয়েছে।

১০। বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্যের প্রশংসা করে নোবেলবিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছেন, মানবসম্পদ উন্নয়নে ভারতের অবস্থান প্রতিবেশী বাংলাদেশের চেয়ে খারাপ। তিনি একাধিকবার লিখেছেন, 'এটা বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সাফল্য যে, অল্প মাথাপিছু আয়ের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ অতি দ্রুত অনেক কিছু করতে সক্ষম হয়েছে।' ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখেছে, 'বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়, বরং অনেক দেশের জন্য অনুকরণীয় একটি দেশ'। সম্প্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘের 'বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস ২০১৩' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিগত সালে দক্ষিণ এশিয়ায় ধীরগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্র ছিল 'অনুকূল'। প্রবাসী আয় ও ভোক্তা ব্যয় বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিই এই 'অনুকূল' চিত্র তৈরিতে মূল ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করছে জাতিসংঘ। বাংলাদেশের এসব প্রশংসা বা স্বীকৃতির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও কী করে কম আয়ের একটি লড়াকু দেশের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব, সেই উপাখ্যান খুবই চমকপ্রদ। অর্থনীতিতে বিরাট রূপান্তর ঘটেছে। কৃষিনির্ভরতা কমেছে, বেড়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ও সেবাখাতের গুরুত্ব। একেবারেই সংকীর্ণ শিল্পভিত্তি নিয়ে যে দেশটির যাত্রা শুরু হয়েছিল চার দশক আগে, তার সাথে তুলনা করলে বলা যায়, বাংলাদেশের শিল্পবিকাশের ধারায় বৈচিত্র্য এসেছে। ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রখাত বলার মতো একটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে। নতুন শিল্প হিসেবে উঠে এসেছে হালকা প্রকৌশল শিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প,

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, ওষুধ ও রসায়ন, চামড়া ও পাদুকা, সিরামিক, সিমেন্ট, জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত। পাটখাতের পুনর্জীবন ঘটছে। রপ্তানিবাণিজ্যেও এসেছে নানামুখী বৈচিত্র্য। শুধু নানা পণ্য নয়, নানা দেশেও যাচ্ছে সেসব। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশও শিল্পখাতে বৈচিত্র্য আনতে সহায়ক হয়েছে। গত চার দশকে স্ফীত ব্যাংকিংখাতের মাধ্যমে বাংলাদেশ কার্যকর এক অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়েছে, যা একদিকে অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করেছে অন্যদিকে, ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করেছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মাত্র ছয়টি ব্যাংক ছিল। বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি মিলে মোট ব্যাংক রয়েছে ৪৭টি। শিগগিরই আরো ৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের কার্যক্রম শুরু করবে। এসব ব্যাংকের ৮৩০০টির বেশি শাখার সমন্বয়ে বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। শহরের চেয়ে গ্রামেই ব্যাংকের শাখা বেশি। ব্যক্তিখাতের ব্যাংকগুলোও শহরের সমান বা বেশি গ্রামীণ শাখা খুলতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অভাবনীয় পুনর্জাগরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সদ্য প্রচলিত মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা। নিমিষেই অর্থ লেনদেনের এই ব্যবস্থা সারা দেশের ব্যাংকিং-বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর জীবনে এক নয়া আশার আলো প্রদান করে চলেছে। বর্তমানে সবগুলো ব্যাংক শাখায় সাড়ে ৫ কোটির বেশি আমানতকারী ও প্রায় এক কোটি ঋণগ্রহীতা রয়েছে। আর মোট আমানত ও ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৩৯৬ ও ৪৩১৯ বিলিয়ন টাকা।

১১। নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশ 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অনুসরণ করছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির মূল কথাই হচ্ছে অবাধ প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় যে টিকবে, সেই এগিয়ে যাবে। অন্যেরা ছিটকে পড়বে। ক্রেতারা যেখান থেকে সুবিধাজনক দামে পণ্য পাবে সেখান থেকেই তারা ক্রয় করবে। মুক্তবাজার অর্থনীতির সুফল হিসেবে তৈরি পোশাকশিল্প, জনশক্তি, চিংড়ি ও চামড়াজাত পণ্যসহ কুটিরশিল্প থেকে শুরু করে হালে জাহাজ রপ্তানিকারক দেশের মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ। আগে আমদানি ট্যারিফ ছিল খুবই বেশি। ফলে পণ্য আমদানি সেভাবে হত না। ১৯৯০ এর দশকে শুল্ক উদারীকরণ করা হয়। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে আমদানি শুল্কের গড় হার ছিল ৫৭ শতাংশ, ১৯৯৩-৯৪ সালে তা ৩৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। সেই ধারা চলতে চলতে আমদানি শুল্কের গড় হার এখন ১০ শতাংশ। এই বাজার উন্মুক্তকরণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে। ঐ উদ্বৃত্ত ব্যবহারে বিপুল সংখ্যক নতুন উদ্যোক্তাও তৈরি হয়েছেন। খুদে ও মাঝারি উদ্যোগের আশাতীত বিকাশ ঘটেছে। মানুষের মধ্যে

অর্থনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে। কাজের সুযোগ, উপার্জনের পথ পেলে নির্দ্বিধায় কাজে নেমে পড়ছে দেশের মানুষ। একজনের সাফল্য দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন আরেকজন। এভাবেই কর্মসংস্থানের স্রোতধারা ছড়িয়ে পড়ছে দেশব্যাপী। হাঁস-মুরগি, মৎস্যচাষ, দুগ্ধখামার এবং কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প করে সফল হচ্ছেন উদ্যোক্তারা। সে জন্যই বলা যায়, বাংলাদেশের চার দশকের সাফল্যের গল্প আসলে ব্যাপকহারে উদ্যোক্তার উত্থানের গল্প; বিশেষকরে তরুণ উদ্যোক্তাদের অসাধারণ সাফল্যের গল্প। এসব উদ্যোগী ও পরিশ্রমী মানুষকে উপযুক্ত সহযোগিতা করা গেলে সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হবে। খুলে যাবে সম্ভাবনার আরো অনেক দুয়ার। সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশ ইজ অন দ্যা মোভ্। জাতি হিসেবেও আমাদের রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই গানের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে হয়, বাংলাদেশ শুধুমাত্র পত্র-পল্লবে, ফুলে-ফলে সুরভিত এক নয়নাভিরাম দেশ নয় বরং অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ দেশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। আমাদের সম্ভাবনার খাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেশ জুড়ে, এখন প্রয়োজন শুধু পরিচর্যার। আর দরকার নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশ নিয়ে সবার আশাবাদের একটি বড় কারণ এ দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় জনশক্তি। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বড় সুবিধা হল, জনসংখ্যায় কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে যে হারে (১.৫%), কর্মক্ষম জনসংখ্যা বাড়ছে তার প্রায় দ্বিগুণ হারে (২.৮%)। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশই ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে। আগামী দুই থেকে তিন দশকে বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা অর্থাৎ তরুণদের সংখ্যা বয়স্কদের তুলনায় বেশি থাকবে। আর এই বয়সশ্রেণির মানুষই হচ্ছে একটি দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সম্পদ। এই তরুণেরাই দেশের ভাগ্য পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে। এটি একটি সুযোগ, যা একবারই আসে। এরূপ সুযোগ কাজে লাগিয়েছে চীন ও ভারত। চীনের কর্মক্ষম মানুষ উৎপাদনখাতে বেশি কাজে লেগেছে, আর ভারতে কাজে লেগেছে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে। এটিকে বলা হয় 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'। বিশ্বব্যাংকের মতে, এ জনমিতিক লভ্যাংশ কাজে লাগাতে বাংলাদেশকে প্রতিবছর ১৫ লাখ মানুষকে কাজ দিতে হবে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে হলে জনশক্তিকে আরো দক্ষ করতে হবে। বাংলাদেশের তরুণ কর্মক্ষম জনশক্তিই বিদেশে কাজ করে আয় করছে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা। পড়াশোনা শিখে এখন আমাদের তরুণরা শুধুমাত্র চাকরির পেছনে ছুটছে না। বরং নতুন উদ্যোক্তা হবার চেষ্টা করছে। কত ধরনের

কাজকর্ম হচ্ছে, কত রকমের প্রয়াস আর উদ্যোগ। কাজটি ছোট কিংবা বড় যাই হোক যে যার মতো করে তার অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করছে। আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প করে তারা নানা ক্ষেত্রে সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ যে টেকসইভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে তার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে গ্রামীণ অর্থনীতি। গ্রামে এক ধরনের পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। গ্রামে তিন বেলা খাবার দিয়েও ৪০০ টাকার নিচে এখন শ্রমিক পাওয়া যায় না। আগে অর্জিত মজুরি দিয়ে বড়জোর দুই বা আড়াই কেজি চাল কেনা যেত। এখন সেই মজুরি দিয়ে নয়-দশ কেজি চাল কেনা যাচ্ছে। মজুরি বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে গ্রামে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সম্প্রসারণ। গ্রামের মানুষের একটা বিরাট অংশ কৃষির বাইরে গিয়ে শ্রম দিচ্ছেন। তাই কৃষি শ্রমিকের চাহিদা বেড়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে বলেই এমনটা ঘটছে। গ্রামে সবজি, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশুর খামার গড়ে উঠেছে। অনেকেই মাছচাষ করে বেকারত্ব নিরসন করছেন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুলচাষ হচ্ছে। গৃহসজ্জার জিনিসপত্র তৈরি হচ্ছে। ছোট-মাঝারি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা রকম উদ্যোগ বিস্তার লাভ করেছে। রিক্সা-ভ্যান, কৃষি যন্ত্রপাতি ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী মেরামতের কাজও ব্যাপকভাবে ঘটছে। মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতির এই সম্প্রসারণের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করছেন। এর ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের হার বেড়েছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষেরও ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। ক্ষেতশ্রমিক, দিনমজুর, যারা সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে বাড়তি রোজগারে লাগিয়ে দিতেন, এখন তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে। গ্রামের কৃষক এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, গ্রামে বসেই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দৈনন্দিন কাজ সারেন। গ্রামীণ অর্থনীতির এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে শহরের মানুষ গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে উৎসাহিত হবেন।

আমাদের আছে উর্বর ভূমি ও বিশাল জনসংখ্যা। দেশের জনশক্তির ৬০ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ১৯ শতাংশের বেশি। কৃষিমক্ষেত্রে আমাদের সম্ভাবনার খুব কমই আমরা কাজে লাগাতে পেরেছি। বাংলাদেশের কৃষিতে যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে সেটিকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে কৃষিব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারলে

নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেও বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য রপ্তানি করা সম্ভব। বাংলাদেশকে কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নত দেশেও পরিণত করা সম্ভব। ফলের জুস তৈরি, পোলট্রি, ডেইরি, ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালন, মৎস্য, শুটকি, ভোজ্যতেল, পামচাষ, মুক্তাচাষ এসব সম্ভাবনাময় খাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। উৎপাদন আরো বাড়ানোর জন্য দেশের কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিজ্ঞানীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রসার ঘটাতে হবে কৃষিভিত্তিক শিল্পের। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্যও বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ 'রিফাইন্যান্সিং' জানালা খুলে দিয়েছে। নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য নানা সুযোগ আমাদের সৃষ্টি করে যেতে হবে।

শিল্পের কথা উঠলেই আমরা শুধু পোশাকশিল্পের কথা বলি। কিন্তু আরো অনেক শিল্প আছে যা ইতোমধ্যেই সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এগুলোকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। আমাদের ওষুধশিল্প বিশ্ববাজারে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গত এক দশকে এ শিল্প থেকে রপ্তানি আয় বেড়েছে পনের গুণ। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের ওষুধ। ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের ওষুধ তৈরি হচ্ছে এখন বাংলাদেশে। চিকিৎসা প্রযুক্তিতেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিদেশমুখী প্রবণতা কমাতে পারলে দেশের কোটি কোটি ডলার সাশ্রয় হবে। জাহাজ নির্মাণশিল্প ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের সম্ভাবনার বিশাল দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ শিল্পে সক্ষমতার সাথে এগুচ্ছে বাংলাদেশ। অচিরেই বিশ্ববাজারে দৃঢ় অবস্থান সৃষ্টি করবে বলে মনে হচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের নির্মিত মাঝারি ও বড় আকারের জাহাজ ইউরোপ-আমেরিকায় রপ্তানি হয়েছে। 'মেড ইন বাংলাদেশ' লেখা ওই জাহাজগুলো এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্রপথে বিশ্বের বন্দরে বন্দরে। এ শিল্পকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে পারে। পরিবেশ রক্ষা করতে পারলে চামড়াশিল্পেরও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে উন্নত মানের প্রচুর চামড়া পাওয়া যায়। এগুলো রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আয় করা সম্ভব। এছাড়া, টেক্সটাইল, সিরামিক, সিমেন্ট, হালকা প্রকৌশল, কৃষি ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, প্লাস্টিক পণ্য, ইলেকট্রনিক্স, তথ্যপ্রযুক্তিগত পণ্য, বাইসাইকেল, প্রকাশনা, প্যাকেজিং, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য ও মসলা, সবজি, পাটজাত দ্রব্যের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতার পর যেখানে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল মাত্র ৯ ভাগ, তা এখন বেড়ে প্রায় ৩১ ভাগ হয়েছে। শিল্পখাতের এই বিকাশ স্বপ্ন দেখাচ্ছে

২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার। ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩.১৮ বিলিয়ন ডলার। আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭.৬৭ বিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪.৩ বিলিয়ন ডলার, যা ১৯৭৩ সালের তুলনায় ৩০ গুণ বেশি। অন্যদিকে গত অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৫.৪ বিলিয়ন ডলার, ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১৬ গুণ বেশি। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির এক বিশাল রূপান্তর। বাংলাদেশের অর্থনীতির সক্ষমতা নির্ণয়ে রপ্তানি-আমদানির এই বিশাল ভলিউম একটি অকাট্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে।

আমাদের সফট্ওয়্যার শিল্পের বিকাশের ধারাও খুবই আশাপ্রদ। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রসরমান দেশগুলোতে এ খাতে ব্যবসায়িক ব্যয় বাড়ার ফলে সেসব দেশের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে ভাবা হচ্ছে। তরুণ উদ্যোক্তারা এ ক্ষেত্রেও ব্যাপক সাফল্য দেখিয়ে চলেছে। প্রতি বছর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তথ্যপ্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভ করে এ খাতের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হচ্ছে হাজারো তরুণ। এসব তরুণ প্রজন্মের পদচারণায় নানামুখী 'আউটসোর্সিং' তথা বিজনেস প্রসেসিং শিল্পের প্রসার ঘটছে। ফ্রি-ল্যান্সিং-এর ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় রেগুলেটরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। সম-মূলধন উন্নয়ন তহবিল (ইইএফ)-কে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্যে উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

বাংলাদেশকে আমদানিনির্ভর দেশ থেকে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করা সম্ভব। স্বাধীনতার চার দশক পর বাংলাদেশে রপ্তানিখাতে বিশাল রূপান্তর ঘটেছে। ১৯৭২ সালে রপ্তানি আয়ের ৭০ ভাগ ছিল পাটের দখলে। কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কারের ফলে সত্তরের দশকেই পাটের চাহিদা কমে যায়। আশির দশকে ধীরে বিকাশ লাভ করে শ্রমঘন পোশাকখাত। বর্তমানে ৭৮ ভাগ রপ্তানি আয় আসছে পোশাকশিল্প থেকে। রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রচলিত পণ্যের সাথে ব্যাপকভাবে অপ্রচলিত পণ্যের সংখ্যা বাড়ছে। তৈরি পোশাক, চা, তামাক, চামড়া, ওষুধ, জাহাজের পাশাপাশি সিরামিক, সিমেন্ট, আসবাবপত্র, প্লাস্টিক পণ্য, বাইসাইকেল, তথ্যপ্রযুক্তিগত পণ্য, মাছ, চিংড়ি, শুটকি, কাঁকড়া, ফুল, সবজি,

পেয়ারা, টুপি, নকশিকাঁথা, বাঁশ-বেতের তৈরি পণ্য, মৃৎশিল্প রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

বিপুল জনশক্তির এই দেশে দ্রুত শিল্পের বিকাশ ঘটছে। উন্নত বিশ্বে উৎপাদনের জন্য যেখানে জনশক্তির ঘাটতি রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের রয়েছে বিপুল উদ্বৃত্ত। এছাড়াও রয়েছে কাঁচামাল, জ্বালানি সম্পদ এবং উৎপাদনোপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রয়োজন আরো খুদে, মাঝারি ও বড় শিল্প স্থাপন। আর শিল্প স্থাপনে প্রয়োজন বিনিয়োগ। বিশ্বের নামি-দামি কোম্পানিগুলো আমাদের দেশে ব্যবসা করতে চাচ্ছে। অনেক কোম্পানি ব্যবসা করছেও। আমাদের বুঝতে হবে লাভ বা সম্ভাবনা না থাকলে তাদের আসার কথা নয়। কিন্তু শুধু বিদেশি বিনিয়োগনির্ভর হলে একটি দেশের স্থায়ী সমৃদ্ধির অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সেজন্য দেশীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে, তাদের বিনিয়োগের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। স্বদেশী বিনিয়োগের ফলে দেশের মানুষ দেশের প্রতিষ্ঠানে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করবে। তাই বিনিয়োগের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সম্ভব হলে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বড় শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। পিপিপি সেলকে আরো সক্রিয় ও উদ্যোগী হতে হবে। এখানেও বাংলাদেশ ব্যাংক তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে রেখেছে।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর না হলেও যে সম্পদ আছে তা খুব একটা কম নয়। এ দেশের মাটি, পানি ও মানুষ হল বড় সম্পদ। এছাড়া, মাটির নিচে লুকিয়ে আছে তেল, গ্যাস, কয়লার মতো প্রচুর জ্বালানি ও খনিজ। এসবের সঠিক উত্তোলন ও ব্যবহার দেশের উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারে। গ্যাস উন্নয়নে সর্বশেষ প্রযুক্তি গ্রহণ করার নীতি-উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে। কয়লা উত্তোলন করে আমাদের পঞ্চাশ বছরের জ্বালানিচাহিদা মেটানো সম্ভব। তবে ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে সেজন্য লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের জনজীবন ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়গুলো মাথায় রেখে উপযুক্ত নীতি-সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের আরেকটি সম্ভাবনা হল সমুদ্র এলাকা। এখানে আধুনিক সমুদ্রবন্দর গড়া সম্ভব। এখানে তেল-গ্যাস ছাড়াও আছে অন্যান্য খনিজসম্পদ ও অফুরন্ত মৎস্যসম্পদ।

পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল এবং আধুনিক স্থাপনাগুলো পর্যটন শিল্পে অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রেও নদ-নদীতে আধুনিক বিলাসবহুল 'প্রমোদতরী', বান্দরবান-রাঙামাটিতে 'কেবল কার'সহ নানা সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়ছে। অনিবাসী বাংলাদেশীরা (এনআরবি) আসছে। আসছে বিদেশি বিনিয়োগকারী। সবার কথা মনে রেখেই এই শিল্পের দ্রুত বিকাশে আমাদের মনোযোগী হতে হবে।

সরকারের বাইরের উদ্যোগ–যেগুলোকে আমরা এনজিও বলি, সেগুলোরও অনেক অবদান আছে। গ্রামের গরিবদের ভোগে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এনজিও'র ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। বিশ্বে বাংলাদেশকে ক্ষুদ্রঋণের প্রবর্তক হিসেবে স্বীকার করা হয়। বিশ্বব্যাপী আত্মকর্মসংস্থানভিত্তিক দারিদ্র্য নিরসনে সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্রঋণ বিরাট ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার মতো অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বিগত দশকগুলোতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল এবং ব্যাপকভিত্তিক নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কর্মসূচির ফলেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে, সাম্য সহায়ক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ; প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি কার্যক্রমে জাতীয় বাজেটে নিয়মিতভাবে অর্থ বরাদ্দ রাখা; রাজস্ব আহরণে অব্যাহত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ; খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ অর্থনীতি জোরদারকরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়াতে সমর্থন; বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসূচি, দেশের প্রত্যন্ত জনপদে আর্থিক সেবা পৌঁছানোর জন্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা ও মোবাইল ফোন কোম্পানির মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক ব্যয়সাশ্রয়ী নতুন নতুন সৃজনশীল সেবা প্রবর্তন ইত্যাদি কৌশল এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করার জন্য দ্রুতই এজেন্ট ব্যাংকিং-এর গাইডলাইন দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

১২। গত চার দশকে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের যে অর্জন তাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এই সময়ে আরো কতটা অর্জন করা সম্ভব ছিল তা-ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে ফারাক থাকবেই। চার দশকে আমাদের সব আশা পূরণ না হলেও অনেক আশাই পূরণ হয়েছে বলা যায়। আমাদের যে অর্থনৈতিক শক্তি আছে, তার পরিচয় আমরা এরই মধ্যে দিয়েছি। এখন চ্যালেঞ্জ হল, তা ধরে রাখার মতো উপযুক্ত রাজনীতির চর্চা আমরা করতে পারছি কিনা।

চার দশকে বাংলাদেশকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে, এখনো করতে হচ্ছে। এমন চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও এখনো আমাদের সাড়ে চার কোটি মানুষ দারিদ্র্যে এবং আড়াই কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যে ভুগছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমাদের পরিবেশগত সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে। উপকূলীয় ও নদীভাঙন এলাকায় জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জলবায়ু প্রভাবিত উপকূলীয় অঞ্চলে দারিদ্র্য নতুন করে বাসা বেঁধেছে। বিরূপ পরিবেশে টিকতে না পেরে অনেকেই বাধ্য হয়ে স্থানচ্যুত হচ্ছেন। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের স্বকীয় সক্ষমতা তৈরি হয়েছে, তবু বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কালো মেঘের বিস্তারে তা নিতান্তই অপ্রতুল বলে মনে হয়। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। গ্রিন ব্যাংকিংসহ জলবায়ু মোকাবেলার লক্ষ্যে বেশকিছু সৃজনশীল উদ্যোগ বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে। তবে আরো অনেকটা পথ পাড়ি দেবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

বাংলাদেশের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোও এখন চ্যালেঞ্জ। আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠী থেকে বিশাল প্রাপ্তির যে সম্ভাবনা ছিল, তা আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। তবে এ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর সুযোগ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের বিশাল কর্মক্ষম তরুণরাই বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তি উন্নয়নের চাবিকাঠি। দেশ গড়ার যুদ্ধে এই তরুণ প্রজন্মকে কাজে লাগাতে হবে। তারুণ্যকে প্রকৃত অর্থেই সম্পদে পরিণত করার জন্য দরকার তাদের মধ্যে দক্ষতার বীজ বপন করা। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দরকার প্রশিক্ষণ, নয়া উদ্যোক্তা সৃজনসহ নানামাত্রিক বিনিয়োগ। তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দরকার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মতো শ্রমঘন শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটানো।

প্রযুক্তির এই যুগে জ্বালানিখাতে আমাদের আরো বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে হবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানিসহ ভৌত অবকাঠামো এখনো অপর্যাপ্ত। আমাদের দেশে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যেগুলোকে সঠিক উপায়ে কাজে লাগিয়ে স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। আশার কথা হচ্ছে, বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকার এখন সেই পথেই হাঁটছে। ইতোমধ্যে রাশিয়ার সাথে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের কাজও এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস, বর্জ্য থেকে জ্বালানি তৈরির উদ্যোগগুলোকেও সমর্থন দিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে যেসব সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়েছে সেগুলোর ব্যাপ্তি আরো বাড়াতে হবে।

আমরা এখনো রাস্তা-ঘাট, সেতু, বন্দর ও রেলের পর্যাপ্ত উন্নয়ন করতে পারিনি। রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার সাথে সংযুক্ত আশপাশের এলাকা যানজটে বিপর্যস্ত। এসব জায়গায় উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। সম্প্রতি এদিকে সরকার বেশ খানিকটা নজর দিয়েছে। অনেকগুলো ফ্লাইওভার নির্মাণ সম্পন্ন হবার পথে। তবে, এদিকে আরো নজর দিতে হবে। স্বল্পব্যয়ে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে রেল ও জলযানকে আরো উন্নত করা দরকার। দেশের গুরুত্বপূর্ণ এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াতের জন্য দ্রুতগামী রেল ও উন্নত মানের বাস চলাচলের প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে বিশ্বে ৯৪-তম অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে অষ্টম বৃহত্তম দেশ। জনসংখ্যার চাপে চাষ উপযোগী ভূমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে এটি আমাদের জন্য ভয়াবহ অবস্থা ডেকে নিয়ে আসতে পারে। গ্রামেও পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তুলতে হবে। গ্রামের মানুষের জন্য কাজের আরো সুযোগ তৈরি করতে না পারলে শহরের ওপর প্রচণ্ড চাপ বাড়বে। একইসঙ্গে পরিবেশবান্ধব ও সুশাসিত নগর ব্যবস্থাপনায় আমাদের নজর দিতে হবে।

বেকারত্ব এখনও একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা। বেকারত্ব নিরসনে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের মানুষের উপার্জনের অন্যতম উৎস হতে পারে পশু ও মৎস্যসম্পদ। এই দুটি খাত খুব দ্রুত উন্নতি করছে। বেকারত্ব নিরসনে বৃহৎ কাজের বাজার সৃষ্টি করতে হবে। আর কাজের বাজার সৃষ্টির জন্য দরকার বিনিয়োগ। বিদেশের বাজারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির চলমান

সরকারি উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাতকেও সুশাসনের আওতায় রেখে উৎসাহিত করে যেতে হবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ম্যানুফেকচারিং শিল্পে বিনিয়োগ আরো বাড়াতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ বা এফডিআই বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সেজন্য দ্রুতই বিশেষ শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহজে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ার পথ তার নীতি-সংস্কারের মাধ্যমে সুগম করে দিচ্ছে। আমরা চাই দেশীয় বিনিয়োগও বেশি হোক। তাহলে দেশের টাকা দেশেই থাকবে। বিনিয়োগকারীদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনাদের সমস্যা থাকলে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, কিভাবে সহায়তা দরকার তা বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করুন। কেননা, আমরা দেশীয় বিনিয়োগ বাড়াতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রবাসী বাঙালিদেরও স্বদেশে বিনিয়োগ করার নানা সুযোগ আমাদের সৃষ্টি করতে হবে।

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়ায় নতুন উদ্যোক্তাদের সহায়তা দেয়াটাও এখন বড় চ্যালেঞ্জ। নতুন উদ্যোক্তাদের অর্থ, বুদ্ধি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। যারা আগে ব্যাংক থেকে ঋণ পেতেন না, যেমন–প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষি, নতুন উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা তাদের কাছে যেন ব্যাংকঋণ যায় তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক। যারা প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা, যেমন–গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যালস, লেদার, সিরামিক, সিমেন্ট, জাহাজ নির্মাণ খাতে, তারাও যেন প্রয়োজনীয় অর্থ পায় তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকলে তা দূর করতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ইংরেজি ভাষা ও কম্পিউটারজ্ঞানের অভাবে প্রযুক্তিখাতের সম্ভাবনাকে আমরা সেভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। তাই নতুন প্রজন্মকে ইংরেজি ও কম্পিউটারে পারদর্শী করার জন্য দরকার জাতীয় পর্যায়ের উদ্যোগ ও বেসরকারি বিনিয়োগ। শিক্ষাঙ্গনেও প্রযুক্তি প্রসারে আরো মনোযোগী হতে হবে।

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া, আসিয়ান ও জিএমএস-এর দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে গড়ে তুলতে হবে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট। পাশের বড় দেশ ভারতের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ছে। এই ধারা যেন আরো গতি পায় সেদিকে সংশ্লিষ্টজনদের সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে।

অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসনের অভাব। রয়েছে প্রশাসনিক দুর্বলতা ও সঠিক উপায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতা। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে দুর্নীতির কালো ছায়া। এ দুর্নীতি দূর করতে না পারলে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই হবে না। সমাজে প্রকৃত অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এখনো বেশকিছু বিশৃঙ্খলা রয়েছে। দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ না করলে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার আরো উচ্চতর হতে পারত। তাই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলোকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য দরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও কার্যকর সুশাসন।

১৩। বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে বাধাগুলো যেহেতু চিহ্নিত, সেহেতু এগুলোর অপসারণ নিশ্চয়ই দুরূহ নয়। এ বাধাগুলো মোকাবেলার মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে বলে আমি মনে করি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি চলমান বৈশ্বিক মন্দার অভিঘাত মোকাবেলায় যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে এর প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রবৃদ্ধির হারের বিচারে ২০১২-১৩ বছরে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। তবে, গত পাঁচ বছরের গড় প্রবৃদ্ধির বিচারে তার অবস্থান ভারতের পরেই। দারিদ্র্য দূর করাই আমাদের প্রবৃদ্ধির আসল লক্ষ্য। সে কারণেই অন্তর্ভুক্তিমূলক এই উন্নয়নের ধারা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। প্রবৃদ্ধির পরবর্তী ধাপে যেতে হলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের ক্ষেত্রে বাজার উন্নয়ন দরকার। আরো দক্ষ শ্রম রপ্তানি করে প্রবাসী-আয় বাড়াতে হবে। তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে গতিশীল করতে সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র

জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধ কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংক সুপরিকল্পিত নীতিমালা তৈরি করেছে এবং আর্থিক খাতে সেগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সেই কৌশলগত পরিকল্পনারই বড় এক অংশ। এ লক্ষ্যে কৃষি, এসএমই এবং পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে পর্যাপ্ত ও দৃশ্যমান ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু, কৃষক ও অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাংকহিসাব খোলা, মোবাইল ব্যাংকিংসহ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয়সাশ্রয়ী সৃজনশীল ব্যাংকিংসেবা আমরা চালু করেছি। মানবসম্পদ উন্নয়ন, তরুণদের শ্রেণির দক্ষতার উন্নয়ন, দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন, নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারের রাজস্ব ব্যয় বাড়ানো, পরিবেশবান্ধব কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানো, স্থানীয় ও বিদেশি ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তাদের জন্য উপযুক্ত নীতি-পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। একইসঙ্গে বাজার যেখানে অপূর্ণাঙ্গ সেখানে সমাজ যেন এগিয়ে আসে তা মাথায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন, ঐতিহ্য, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নয়নে বড় মাপের সিএসআর কার্যক্রমে মনোনিবেশ করার আহ্বান করেছে। এ আহ্বানে ব্যাংকগুলো ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছে। গত চার বছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর অর্থায়ন সাড়ে সাত গুণ বেড়েছে। এসব কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা গেলে সামাজিক দায়বদ্ধ অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নের মডেল হিসেবে বাংলাদেশ অচিরেই দাঁড়িয়ে যাবে।

১৪। বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী শান্তিপূর্ণ আবাসযোগ্য দেশ হিসেবে গড়ে তোলার আনুষঙ্গিক যথেষ্ট কিছু আমাদের রয়েছে। বিশ্বের নামকরা বিভিন্ন সংস্থা ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশকে আরো কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায় তার জন্য প্রচেষ্টা জোরালোভাবে অব্যাহত রাখতে হবে। বিজয়ের চার দশক পরে আমাদের চাওয়া বাংলাদেশ হোক ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমুন্নত দেশ যেখানে থাকবে না কোনো দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা। আয়ের বৈষম্য যে কোনো দেশের তুলনায় কম থাকবে। গ্রাম ও শহরের পার্থক্য অনেকটাই কমে আসবে, আন্তঃসংযোগ বাড়বে। আমরা চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক দেশের মডেল হতে। এ ধরনের একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি সবসময়, যার সাফল্য নির্ভর করে পুরো জাতির ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর। প্রয়োজন নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির। বাংলাদেশের সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দরকার সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক। আমরা চাই, বিপুল সম্ভাবনাময় আমাদের প্রিয় দেশটি এগিয়ে যাক সফলভাবে। একবিংশ শতাব্দীর অগ্রসরমান বিশ্বে প্রিয় মাতৃভূমি দাঁড়াক

মাথা উঁচু করে। আসুন আমরা সবাই মিলে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এবং দারিদ্র্য দূর করার সংগ্রামে এক হই। আসুন বিগত দিনের ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে এগিয়ে যাবার শপথ নিই, কাজ করি স্বদেশের জন্য। ষোল কোটি বাঙালির বত্রিশ কোটি হাতকে কাজে লাগাই দেশ-জাতির কল্যাণে। এই মাটি ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তে ভেজা পবিত্র ভূমি। আমাদের বীর সেনানীরা দেশ-জাতির মুক্তির জন্য জীবন

দিয়েছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু দেশের মানুষ প্রকৃত অর্থে এখনও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারেননি। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দরকার একটি অর্থনৈতিক বিপ্লব। এ ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে আমাদের তরুণসমাজকে। তরুণ যোদ্ধাদের হাতেই মুক্তি পাবে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা, তাদের ত্যাগের মহিমায় প্রিয় মাতৃভূমি হয়ে উঠবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকর। তারা যে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম সে ইঙ্গিত এরই মধ্যে দিতে সক্ষম হয়েছে। শুভ হোক তাদের পদচারণা। ঘটুক আমাদের সকলের মাঝে দেশপ্রেমের পূর্ণ জাগরণ। কথায় জাগরণ, কাজে জাগরণ, লেখায় জাগরণ, ভাবনায় জাগরণ। সবমিলে জাগ্রত বাংলাদেশ হবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্র দিন দিন প্রসারিত হতে থাকবে। সেটিই একটি জাতির উন্নয়নের প্রধান লক্ষণ। ঠিক যেমনটি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '...যে-জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে, ক্রমশই সে জাতির প্রত্যেক বিভাগের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকরতা চলে যাচ্ছে। যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব দাবি করবার অধিকার পাচ্ছে। এই জন্যেই সেখানে মানুষ ভাবছে কি করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে।' ('বাতায়নিকের পত্র', বরীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৫৮১)।

ন ব্ব ই - এ র ২১ ক বি র ২১ টি ক বি তা

১.
উষ্ণতা

ভীষণ উষ্ণতা জাগে। চোখের চপল বেয়ে টলটলে ঘ্রাণ নিয়ে মৃত্যুর মতোন রূপ নামে। মাথার উপর টাঙানো আকাশ। আমার সীমায় শ্লীল-অশ্লীল কিছুই নেই। শুধু চাঁদের পালান জুড়ে প্রান্তিক নক্ষত্র খোঁজা। কোনোদিন ঘুম ভেঙে জেগে দেখি মাঝরাত শুয়ে আছে আমার শয্যায়, ঠিক যেন বৌয়ের শরীর। ব্রহ্মপুত্র জলে তিন তিন বার দেখেছি দেবীদের স্নান উৎসব, লাজধোয়া অমৃত শরীর। আমার গোপন খোয়া গেছে চতুর গোপনে। আমিও বহরে হাঁটি যোজন যোজন। যাযাবর বিশ আঙ্গুলে খেলে বিংশতি পল-অনুপল। কোথাও হঠাৎ থেমে জীবনের পায়ে আঁকি অমরত্বের সুবর্ণরেখা। কখনো আবার অন্ধকার কামারশালায় জ্যোৎস্না বানাই একা একা– এই মৃত্তিকায়।

২.
আইটন্স অন ইয়ারা (পাহাড় লাগাচ্ছে মাস্‌কারা)

আইটন্স অন ইয়ারা - কমপক্ষে একশত মাইল
শেষ দিকটায় পাহাড় ওখানে দিগন্তে সুরমা লাগাচ্ছে খুব যতনে
পাহাড় লাগাচ্ছে মাস্‌কারা

আলগোছে সারিনা আধাআধি সরে বলল
তোমার পিস্তল বার কর?
....

উঠে দাঁড়াব পরে - আপাতত একটু মদ্যপান করি!
আপাতত - একশত কিলোমিটার গতিলিমিট
দুপাড়ে পাহাড় - সিঁড়ি দিয়ে ল্যাটিন লধু নামছে
Tito Puente - টেইক ফাইভ

এক পা নামলে আরো দুই পা - স্যুটের ক্রিজ না ভেঙে আরো
স্টাইল - আরো আলো ঠিকরাক - তোমাদের বিয়ে ভেঙ্গেছে তো কী হয়েছে মেয়ে ?

সবকিছু শুষে নেওয়া নির্জন মাটি
তার উপরে জীবন যেভাবে মুঠো খুলে দেয়

যেভাবে সারিনা আধাআধি ঘুরে উঠে বলতে পারে তোমার পিস্তল?
কাঁধের উপরে আলতো হাত ছুঁয়ে মাটির উপরে একশত আঙ্গুর বাগান
সারি সারি মানুষ তৈরী করতে পারে

সেভাবে জীবন বানানো যায়
হাতে খুব ভালো তাস পড়লে
সবকিছু ভুলে হেসে ওঠা যায়
... ...

আঙুর বাগানে ইনফরমেশন
খুঁজছি। মাটির উপরে ছুঁচোর মত । বেতনাকাঙ্খায় পাদ্রির মত
সারি সারি আঙুর বাগানে সারির মধ্যে আমি মাটিতে কান পাতি
স্টেথেস্কোপ টিপে ধরে খুঁজে দেখি আমাদের পাহাড় জীবন্ত কিনা

তারা যেভাবে সুরমা লাগাচ্ছে সেভাবে আমি
জীবন্ত আছি আমি আছি হে সারিনা

ল্যাটিন লধু এর মত
একপা একপা নামতে আছি হাতে গেলাস
... ...

যেভাবে ফিরে আসি ।

রাস্তায় রোড-সাইন নাচিতেছে একশত কিলোমিটার ।
ওভারটেকিং লেইন ফাইভ হান্ড্রেড মিটার এ্যাহেড - দূরে কী সুন্দর বাতাস - আর
পাহাড়েরা তো পাহাড়ের মতই
রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে আমার মাথার মধ্যেকার নিউরণগুলা ঝিমাইতেছে

মদ্যপানের ফলাফল - জীবন যাপনের ফলাফল - আমি
হাসিতে চাইলেও আমার মুখ হাসিতেছেনা - রৌদ্রকরোজ্জ্বল

দিনের সাথে নিস্ফলা আমি আমার মধ্যে বসিয়া হাসিতে থাকি ।।

(মেলবোর্ন, ২০০৪)

৩.
ধুলোবালি, পাপ

এতকাল কতভাবে অপচয়ে, অনাদরে রেখেছি নিজেকে
যত্ন করে বেঁচে থাকা কেন আজও হয়নি আমার
এত ঘৃণা, এত রক্ত, তিলে তিলে জমে উঠে
ভেঙেছে আমার এই আগুন লাগা দেহ–
এই দুই হাত দিয়ে কী করেছি, কী যে করি নাই

কত পাপ, কত ধুলো, কত ঘাম
পায়ে পায়ে ঘোরে,
আমাকে অসুস্থ করে, ক্রুদ্ধ করে, শ্বাসরুদ্ধ করে,
চিৎকার করে বলে– থামো

৪.
নিরুদ্দেশে যাব

ঘাটে ভাঙা নৌকা
জোয়ার ভাটায় পলি-কাদা শ্যাওলায়
ডুবান ভাসান
চুপি চুপি বলি তাকে নিরুদ্দেশে যাব

থাকে নিরুত্তর
বিধবা মায়ের থালার কিনারে
নুনের বদলে স্তব্ধ অশ্রু

তারপর সারারাত ইস্টিমারে জরায়ু জগৎ
সকাল উগরে দেয় ক্ষুধা
পরস্পর অচেনা আঙুলে
মুদ্রা বিনিময়

মাঝরাতে শরীরে নিঃশ্বাস ফেলে আগুনের পশু
অদূরে ফ্ল্যাটের জানালায় জানালায় বস্তির দহন-দৃশ্য
মনে ভাঙা নৌকার কঙ্কাল
নিরুদ্দেশে যাব

৫.
বালজাকের চামড়া

দহনের মৌল মিলনে গলে যেতে থাকে মোমের পরমায়ু
আভূমি ছাই করা দেহ তার জন্মমৃত্যুর ইতিহাস
মানুষের সকল আয়ু একখণ্ড বালজাকের চামড়া
সে ক্রমাগত সংকোচন করে নিজের মসৃণ শরীর

চাওয়া নতুবা পাওয়া যা কিছু অভিজ্ঞতা ক্ষরণ
ম্লান অথবা অম্লান যা কিছু জৈবিক বিস্ময়
মাটির গহিন আত্মার টানে অস্তির কৌতূহল
তবু তাকে অক্ষয় বৃক্ষ ভেবে মানুষ শেকড়ে ঢালে জল

তবু যেতে থাকে মানুষ নির্জ্ঞান প্রক্রিয়ার ভেতর
শিহরণে কাঁপে মধুলোভী ঘাস চোখ রাঙানো অধিশাস্তা
সকল তৃষ্ণা আদতে ক্ষরণে সহোদর তবু–
মানুষ বহু অভিজ্ঞতায় পুষ্ট করে তার জাগতিক উদর

৬.
চিঠি

মাননীয় হোস্টল সুপার
মজিদা খাতুন মহিলা বিদ্যালয়
তারিখ: ১২ই আষাঢ়, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

বিষয়: দুই দিনের ঐচ্ছিক ছুটির জন্য আবেদন ।

জনাব

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার মহিলা হোস্টেলের একজন নিয়মিত বন্দি । মৃতপ্রায় দাদীর শেষ ইচ্ছা তিনি আমাকে শেষবারের মতো একবার দেখিতে চান । আমি তাই গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে হোস্টেল ত্যাগ করিতেছি । পথিমধ্যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না ।

অতএব আমাকে গ্রামের বাড়িতে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে আপনার বিশেষ আজ্ঞা হয় ।

নিবেদিকা

আপনার একান্ত অনুগত
বীথি বসুনিয়া
দ্বাদশ শ্রেণী, মানবিক বিভাগ।

পুনশ্চ: মানবিক বিভাগে অধ্যয়নরতা সকলের অনুগত বসুনিয়া বাড়িতে ফিরিয়া দুর্ঘটনাবশত পালকিতে চড়িল। তাহার অকাল মৃত্যুতে হোস্টল কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিল না।

৭.
নিঃসঙ্গের ছদ্মবেশে

মানুষের ছদ্মবেশে থাকি, আদতে রাক্ষস!
একদিন রাক্ষসপুরীতে ছিলাম। কিন্তু রাক্ষসদের সঙ্গে আমার বনিবনা হত না। সবসময় খিটিমিটি লেগে থাকত। ভালোবেসে যে রাক্ষুসী আমার পাশে ছায়াচ্ছন্ন দাঁড়িয়েছিলো, এক সন্ধ্যার অজান্তে তাকে অন্য রাক্ষসেরা ভক্ষণ করে ফেলেছিল। মনের দুঃখে, স্বপক্ষত্যাগী আমি মানুষের ছদ্মবেশে মানবসমাজে চলে এসেছি। আমিও কবিতা লিখি...

এই হচ্ছে মানুষের মধ্যে থেকেও আমার নিঃসঙ্গতার সংগোপন ইতিহাস। এই হচ্ছে মানুষের সমাবেশে থেকেও আমার মানুষ হতে না পারার ইহলৌকিক যন্ত্রণা। কারণ, সৌন্দর্যলুব্ধক এক মোমের মানবীকে ভালোবাসতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি গোত্রান্তরিত রাক্ষস। স্বগোত্রে আমার জন্য এক রাক্ষুসী আত্মাহুতি দিয়েছিল। আর এদিকে আমি মোমের মানবীকে হাত ধরে আবেগে-আবেগে যেই বলেছি, রাক্ষুসী প্রিয়ে, তোমাকেই আজ ভালোবাসি, তুমি আমার পাশে দাঁড়াও; কিন্তু সে ভয় পেয়ে ছিটকে পালায়, আর
রাক্ষসের ভয়ে মানবীরা চিরকাল ভীত বলে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যাই, যথাক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে উঠি। নিঃসঙ্গতা এমন একটি উদাহরণ, সে-কেউ গ্রহণে অনিচ্ছুক... হায়রে এমন নিঃসঙ্গ থাকি।

সকাল থেকেই একটা শালিক কার্নিশে ভিজছে... স্থিরচিত্রে, নিঃসঙ্গের ছদ্মবেশে আমি
এখন ওই ভেজা শালিক পাখি

শালিকের ছদ্মবেশে কবিতা লিখি!

৮.
মালের আড়ৎ

হালখাতা লাল মলাটের হয় কেন?
এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে প্রতিটি বছর আসে;
মৃত্যুও আসবে শুভসূচনায় ।
বৈশাখশুরুতে মিষ্টিমুখ করে ও করায় আড়তদারস্ত্র
মৃত্যুতেও মিষ্টিমুখ করে ও করায় জীবিতস্ত্র
৩নতুন হিসেব শুরু হয় আড়তে আড়তে
শোনা যায়, বই পড়ে জানা যায়
নতুন হিসেব শুরু হয় ওপারেও
ওপারে ভালো-মন্দদের খেলাখেলির পাশাপাশি মাঠ,
মাঝখানে বিশাল দেয়াল,
স্বপ্নে-দেখা-দেয়ালের উপর শূন্য আসনে বসে আছেন
শূন্য, মহাখাল্লি

ভাঙা স্বপ্নে বোঝা গেল না
কাদের খেলার প্রশংসায় তিনি দিচ্ছেন হাততালি ।

৯.
পথ

বলো রাজহংস কোথা ছিলে,
মেলেছো তোমার ডানা আমারই ডানায় ।

আমাদের গ্রীবায় রক্তের কালো ছাপ বলেছিলো,
পাখিরা উড়তে গেলে,
শিকারির তীর এসে ওদের থামিয়েছিল ।
রূপকথা সাথে করে এনেছো, বলছো,
পরীরও পাহারাদার আছে ।

তবু জীবন আমার
ষাঁড়ের সম্মুখে ধরা রঙিন কাপড়,
এসেছো যখন চলো, হেঁটে পার হই রাজপথ ।
অবাক, দেখুন ওরা হেঁটে চলা
আমাদের সাবলীল অতি ।

১০.
পথ

কেমন আছো পথ, পালক সন্ধানে!

প্রতিটি প্রকৃত পালক ও পালকের প্রস্থ আজ
বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে গিয়েছো ।
কেবল বহুল প্রচারিত পথে পথে
এইসব পালক শূন্য ঘটনা যথাবিহিত প্রকল্পনায়
প্রতীক্ষিত সাঁতারের ফাঁকে ফাঁকে
সমর্থ নদী হবার মতো ভেসে থাকে ।

তাহারা কেবল বহুদিকে ছড়ানো ধাতব বাহিত চাকু
ও নদীর ওপরে চর।
আর এইসব ফল আজ কিরূপে ধার্য
বৃক্ষবিনা পাতার মর্মরে।

১১.
বৃত্তাবদ্ধ

অঙ্কে ছিলাম না কাঁচা। ছোটবেলায় একশতে নিরানব্বই পেয়ে মাস্টারমশাইয়ের প্রিয় হয়ে উঠি। পাড়া-প্রতিবেশীদের চোখে ঘোর অমানিশা। বীজগণিত পাটিগণিত ছিল নখদর্পণে। আর জ্যামিতি? সে তো কেবল বৃত্তের মধ্যে স্বপ্নের জাল বোনা।

স্কুল পেরিয়ে কলেজের বারান্দায় পা রাখতেই অঙ্করা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, আমি তাদের ধরে রাখি দশ বছরের টিউশনি জীবনে। আমার ছাত্রদের মুখস্থ করাই সূত্র। সূত্রে ফেলে দিলে অঙ্কের রাস্তা সোজা। এভাবে বৃত্তের মধ্যে, সূত্রের রাস্তায় চলতে চলতে আমিও বৃত্তাবদ্ধ হয়ে যাই।

দীর্ঘদিন আকাশ দেখি না। আকাশের নীল রং কখনো কালো হয় কি না জানি না। দিন শেষে রাত এলে বৃত্ত ও সূত্রের পাঠশালায় নিজেকে নিমগ্ন রাখি। হিসেব মেলে না।

১২.
নয়া এশিয়ার ডাক

যে সত্য বলিনি আমি
যে সত্য বলেনি কখনো কেউ
সেই সত্য বলি—

শোনো— কানের নেকাব খুলে শোনো
চোখের তারকা বন্ধ করে কান পেতে শোনো
আমার অস্তিত্ব বিলীন করে নিজের কথা শোনো— নিজের ভাষায়
আমি কেউ নই, তোমার কথা তোমার ভাষায় বলছি আমি
শোনো— আরো মন খুলে, আরো হৃদয় দরজা খুলে শোনো
পরমপুরুষের মিলবে সাক্ষাত— অসাক্ষাতেই শোনো
তার কথা শোনো— শুনতে শুনতে শান দাও প্রতিভার পাপে
এই যে এই বিচ্ছেদ, লাল নীল বাতি, হলুদ পোশাকায়িত ইষ্টিকুটুম ডাক
কোকিলার প্রাণে বাসা বানাবার ইচ্ছেমতি উড়া
গোবাল হৃদয়ের আকাশের কান্না ধোয়া পদতল পা রেখেছে পথে
প্রেম বলো কাকে— সে তো কামের তুলিতে আঁকা কুড়েঘর
ভবিতব্য পুত্র কন্যা সুখ
এতো সত্য নয়— এতো আশ্রয়ের কচুপাতা জল
কয়লার আগুনে সেঁকা নামহীন হযরত
পুকুরপাড়ের প্রতিবেশিনীর কাপড় পাল্টাবার কালে কোমলাঙ্গের
ইশারা ইঙ্গিত
টোপ ফেলে বসা শিকারির চোখ
ঘাসবন দেখবার লোভ
ঠাকুর ডোবানোর অবৈধ খায়েস
খায়েসের খোয়াড়ে বসে কোন সত্য বলতে চেয়েছি বলো—
যে সত্য বলেনি কখনো কেউ
সেই সত্য বলি
বলি— উপমার আড়ালে নয়
ছোটোখাটো বস্ত্রের ভাঁজ খুলে বলি
সরাসরি বলি
বলতে বলতে আরো বেশি বিপবী হই
বিস্তারিত হই
শ্রেণীর চোদনে তুমিও তো তড়পাও
ক্ষোভ ঢালো খরিদকৃত ক্ষণিক সহবাসে
আত্মরতির উছিলায় যারে তারে করো উপভোগ
স্ত্রীতে করো চুনকাম করা চিত্রনায়িকা
অফিসের তাড়াতে বাস ধরো, ট্যাক্সি চাপো

ফাইলে ফলাও ব্যক্তিগত ফল
ফ্ল্যাটবাড়ির লোভে জমাও ছোটোখাটো অর্থের পাহাড়
শহরতলীতে জমি কেনো
বাচ্চাকে ভালো স্কুলে পড়তে দিতে প্রাণ যায়
আইঢাই করে মধ্যবিত্ত হৃদয়
বউয়ের গয়নার তাড়া গেলো না তো
কাপড় তোলার কালেও শোনো কম কামানোর তীব্র তিরস্কার
ফ্রিজটা এলো, ওভেনটা তো এলো না এখনো
পার্সোনাল পিসি নিয়ে ওরা ঘুরে
তোমার হাতে তো সাধারণ মোবাইল
ক'মিনিটেই কেঁদে উঠে পকেট— ময়লা মানিব্যাগ
ক্যাশকার্ডে টাকা তোলো
একাউন্টে এত কী করে জমাও— ঘুষ খাও, দুর্নীতি করে
শ্রম বেচো
নাকি শ্রম চুরি করে খাও
শোষণ সাম্রাজ্যে তুমিও তো তেমন কেউকেটা নও
পাছার উপরে তোমারও পিঁপড়ের আনাগোনা
ডলারে হিসাব কষো
ইউরোর আঙ্গিনায় যেয়ে সুরত পাল্টাও
ভিক্ষাবৃত্তি ভালো কোনো কর্ম নয়
বিপব ফেরাবার উছিলায় ভিক্ষাবৃত্তি করো
বিক্রি করো দরিদ্রতা, অনাহার, রোগ, শোক অশিক্ষার আত্লামি
বন্ধু; বাংলাদেশ এখনো দাঁড়ানো
পূর্ববাংলা এখনও পরাজিত নয়
আত্মরক্ষায় এখনও তাঁরা আকাশ সমান
কালো পোশাক পরে ঘুরো
প্রজাপতির মতো উড়ো
যার তার বুকে ফুটাও রক্তগোলাপ
আহা—
অশ্রুতে ভরে যাচ্ছে ব্যর্থ বাংলাদেশ
কালো প্রজাপতি, তোমার তর্জনীতে দ্বিধায় নড়াচড়া
জলপাই পোশাকের তলে তুমিও মানুষ
সিসার জ্যাকেটের নিচে আছে তোমারও কোমল হৃদয়

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর পর
পতাকার মতো আঁচল উড়ায় যেইসব শোকেস শোপিচ
ওরা তোমাদের কেউ নয়
তোমার প্রমোশন আটকে আছে
বাধ্যতামূলক নিয়েছো অবসর
খাড়া আছে হাওয়াই মেঘের জেনারেল
মার্চ করো, গুলি করো, ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত করো বুক
দ্বিধার পাহাড় চূড়া থেকে নেমে আসো
ওহে জেনারেল, তোমার পাশে এনজিও শকুন
অমরিকান প্রেতের রক্তমাখা হাত
ড্রাকুলার দাঁত
ইন্ডিয়ান আপেল ঢুকে যাচ্ছে তোমার পায়ুপথে
সাগরেও ঢুকছে বার্মিজ লিঙ্গ
জরায়ু কোথায় তোমার
পাকিস্তানি বাসমতি চালে পেট ভরে
প্রটোকল ভেঙে খেতে পারো
ভোটের বাক্সের কাছে তুমিও তো অসহায়
খেলনা কারবাইন বইতে বইতে ওরাও তো ক্লান্ত
ক'টা কামান আছে তোমার
ক'টা এফ্সিক্সটিন
নৌবহর তো অচল অস্ত্রে বোঝাই
ক'ব্যাগ বুলেটের পরেই তুমিও তো অসহায়
কবুতর স্কোয়াড আছে তোমার— কিংবা হাতির
সরাইলগুলোকেও তো দিলে না ট্রেনিং
আনসারের পোশাক পরিয়েছো আর্মিকে
ব্রাভো সাবাস
শান্তিবাহিনীরা এখনো তৎপর
সাগরমাতার পাশে ঐ যে গেরিলা বাহিনী
ওরা কারা
হিমালয়শৃঙ্গের মতো দাঁড়াচ্ছে গোবালে
ভুটানে বোমা মেরেই লুকায় কোন সে মহাজন
জাহানাবাদ জেলখানায় মুহূর্তেই শাসন কায়েম করে কারা
পাকিস্তানে খুবই গোপনে সংঘটিত হয় কোন সে বাহিনী
চীনের চরণে আবারও গোপনে লিফলেট বিলি করে

কোন সে মানুষ

ভারতের ঝাড়খ কাদের দখলে
মধ্যপ্রদেশ কিংবা তেলেঙ্গানা কিংবা মহারাষ্ট্র
কার কথা কয়— তোমার— তোমাদের
ধীরে, বন্ধু ধীরে
আকাশে কাফ্রি মেঘ— বৃষ্টি ঝরানোর এসে গেলো বেলা
অ কোষে পিঁপড়ের কামড়
প্যান্ট খুলো, সার্ট খুলো, খুলো আন্ডারওয়্যার
বাংলাদেশে লজ্জা কী
নাসরীন বলে এক বোন ছিলো আমাদের
দাউদ বলে এক ভাই
কমরেড হুমায়ুন আজাদকে তো তোমরা মেরেই ফেললে
'কোন পক্ষে যাচ্ছে' আহা, রুদ্র মুহম্মদ
আকাশে কেমন আছো তুমি
ওখানেও অ কোষে পিঁপড়েরা কামড়ায়
মাসে মাসে ধর্ষিতার রক্ত ঝরে
মোড়ে মোড়ে বুফিল্মের দোকান সাজানো
লং ড্রাইভে যেয়ে কাউকে কি মাঠে ফেলে আসা যায়
ইউরোপিয়ান হুইস্কিতে ডুবে হলুদ শয়তান কি চিৎকার করে
আর্ট ফর আর্ট সেক
আরব্য শরাবে মশগুল পাখিরা কি বলে—
খুলে দিলাম জান্নাতুল ফেরদাউস
আত্মঘাতী হও, ইশকের শানে মিলবে কিনার
গ্রিকের উপমা ব্যবহার করে কবি, করে কি গর্ব বোধ:
ল্যাটিনের ম্যাজিক রিয়ালিজমে পাছা খুলে দেয় দৌড়
পেটের খায়েসে পেট কেটে করে কি জন্ম নিয়ন্ত্রণ
মোগাদিসুর মরতবায় উলসিত হয়
পুরুষ ধরতে সৌখিন সেক্সিরা, গুলশান, ইস্টার্ন পাজা কিংবা
বসুন্ধরা সিটিতে আসে
একরাত শ্রম দিলে একমাস কবিতা করার অর্থকড়ি মেলে
চেইন খুলে কেউ কি শাহবাগ আসে
যত্রতত্র করানো যায় কি জরায়ু খালাস
ঐ যে, ঐ মডার্ন বানর

ইডিপাস কমপেক্সে ভোগা জর্জ বুশ
আমাদের পেট খালাস করতে দিচ্ছে না
বিছছিরি লাগছে গ্রে বিবাহের সামনে
ওর লিঙ্গ উঁচু করে দাঁড়ানোতে
কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা তর্জনীকে নিয়ে
ও বেশ ভাগবাটোয়ারা করে খাচ্ছে পৃথিবীটাকে
বুড়ো আঙুলটাকে চেপে ধরা দরকার
আফগানের পিকনিক পার্টি শেষ
চোরাগোপ্তা আক্রমণ করছে চেঙ্গিসের চেলারা
কাজী নজরুলকে বলো তো একটা কবিতা লিখে পাঠাতে
ইকবাল কি খুব বেশি ঘুমে
ইরাকে আটকে গেছে ওর পা
উলসিত আমাদের হৃদয়
হিজবুলার গেরিলারা দেখিয়েছে খুব— সাহস রাখোরে ভাই
এখনও তো পরাজিত নই— ইয়াহুদি ব্রেন তো, মাঝে মাঝে ভয় লাগে
কার্ল মার্কসকে জাগাও তো, হ্যাঁ, এঙ্গেলসকেও জাগিও
স্যুসুর লাকা ফুকো রোড লোবোস্কি চমস্কির থাপ্পড় খাওয়াটা
বেশ জরুরি হয়ে পড়েছে
পাভলভকেও পাঠিও
বাতিল ফ্রয়েডটা এখনও জ্বালাচ্ছে খুব
রাসেলটাকে আমরাই লাথি মেরে বঙ্গোপসাগরে ফেলতে পেরেছি
বিশ্ববিপবের ঝটিকা কেন্দ্রে আমাদের অবস্থান
ভালো লাগছে তোমার, ভাই রুদ্র— ভালো লাগছে
লেঅরকা কিংবা নেরুদার সাথে কথা বলো
এই ফাঁকে কোমরটা গামছাতে বেঁধে নেই
চাষবাস খুব জরুরি
বিআর এগারোর ক্ষেতে পানি নেই
ফারাক্কার বাঁধটা ভাঙবো ভাবছি
সুষম বণ্টনের প্রস্তুতি নিচ্ছি
কিছু কিছু এলাকা মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করবো
ঐসব এলাকায় পুলিশের প্রেম নিষিদ্ধ করে দেবো
ওখানেই কবিতার সাথে সহবাসে কাটাবো চন্দ্রভরা রাত
চাঁদে চাঁদে মিলবে চাঁদ

আহা— হোলি খেলাময় বাসরশয্যা হবে অষ্টপ্রহর
বর্ম পরো
আর হ্যাঁ, মাও, মানে আমাদের মাও সে তুঙ
ওকে একটা গেরিলা বাহিনী দ্রুত সংগঠিত করে পাঠাতে বলো
ভারতবর্ষটার জেনারেল শাসক হওয়াটা আবার আমার জরুরি
হয়ে পড়েছে
প্রলেতারিয়েত প্রজাকুলের দিকে তাকাতে পারছি না
মধ্যবিত্তের উর্দির নিচে ক্ষোভ ঘৃণা ফ্রাস্ট্রেসন
ঘুমানোর আগে নয়া এশিয়ার মানচিত্রটা
মধ্যরেখামুছা মানচিত্রটা
নিয়ে আসছি
খুব বেশি ডেকো না তো
সময়মতো এসে যাবো ঠিকই
মেঘের উপর ভাসছে যে হুইল চেয়ার, সেটা তো আমার আমাদের ।

১৩.
চুন-পর্ব

চুন, দ্রুত লাফিয়েছে ভাণ্ডের বলয়
থেকে । চক্রপাকে ঘুরে গিয়ে
মনিবের গৃহে শোভা পাওয়া তার ধর্ম-জ্ঞান,
অথবা হাড়ের বৃদ্ধিগুণ ধরে রাখা ক্রিয়াকলাপের
কিছু ভাষা জানা আছে রসায়নে;

লাফিয়ে পড়েছে চুন অরণ্য শয্যায়,
পত্রালিতে সঞ্চারিল এত তেজ!
প্রকৃত খাদ্যের ভাণ্ড ভেবে বহু লাফঝাঁপ ।
পাতা খাদ্য প্রস্তুতিতে ডুবে গিয়েছিল খুব, নিজ প্রয়োজনে ।

বাকি দৃশ্য : মনিবের ভোজপর্বে চুন

প্রতিবার পত্রালির সহযোগে নেমে যায় খাদ্য কোলাহলে,

খাদ্যলোভে এত ভাণ্ড ত্যাগ নিস্প্রয়োজন;
গৃহপ্রাচীরের সাথে হেতু পায় তার মিশ্রক্রিয়াকলাপের
ভাষা—
অথবা হাড়ের বৃদ্ধিগুণে পরিমিত চুন ব্যবহার
খুব প্রয়োজন নাকি?

উপরে নিন্দিত সবভাষা মনিবের; মনিবের
যাবতীয় পুরুষের শাখা-ব্যবসায়, বৃদ্ধিতে, সজ্জায়
চুনের কঠিন ও সজল ব্যবহারে
দিনে দিনে বাড়িয়েছে নব-ঐশী-ধারা বল ।

উৎস : রফিকউলাহ খান সম্পাদিত “বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা”

১৪.
আড়াল

তোমাকেই ভালোবাসি

এই অপরাধে ছোট হতে হতে
মিশে গেছি মাটির সাথে...

কখনো বাতাস যদি ধুলা করে
উড়িয়ে তোমার গায়ে নিয়ে ফেলে
সেই ভয়ে, জলের জঠরে
মিলেমিশে কাদা হয়ে থাকি সারাক্ষণ...

আমি তো মীন রাশি নই

তবুও মাছের স্বভাব, জল ছাড়া বাঁচি কই!
জলের পরতে-পরতে জালের ফাঁদ;
প্রেমহীন জেলেদের হাতে শুঁটকী হওয়ার সাধ
ছিলো না কখনো, তবুও চিৎ রোদে সটান শুকাই
নিরবধি নরম কাদা...

কোনো একদিন তোমার মাটির ঘরে
লেপনের কাজে তুলে নাও যদি
জলের কসম, জলে আর ভিজবো না আমি...

এইভাবে প্রলেপে প্রলেপে
মাটির মিহিন ভাঁজে মিশে যাবো দিনে দিনে
তোমারই হাতে, তোমারই ঘরে
কোনোদিন জানবে না তুমি...

১৫.
কুকিলের বাসায় উকিল

কুকিল সাহেব, কুকিল সাহেব,
বাসায় নিকি?
আমি আসছি উকিল, আমি নিজের কথা কইতে নারি
পরের কথা কই
আপনে আমার সই ।

তাই তো ডিয়ার, আমিও কাকার– মানেটি কাকের
বাসায় থাকি । কিন্তু আবার
এইটা আমার নিজেরও বাসা–
যেহেতু এইটা ভাড়াও বাসা–
সেহেতু আপনে ভিতরে আসেন–
নিকটে বসেন–
মনের কথা কই;
ক্যাসেট ছাড়েন ওই ।

শোনেন কুকিল, সিরিয়াসলি শোনেন আপনে
বালের ক্যাসেট বন্ধ করেন
কবিতা লইয়া ভাবেন কিছু?
কারোটাই তো কিছু হয় না
ভরসা এখন কই?

আপনে একটা মানুষ এবং উকিলও আছেন
কবিতা লইয়া বইসা থাকলে কামটি হবে?
ভরসা এখন ফরোসা হইছে, পরের জিনিস আগে আইছে–
এক্সওয়াইজেড কখগ খাইছে–
চলেন আমরা মুখ ফিরায়ে আগের কথাই কই–

বাট, আগে, রবিবারটি রবিব্যুরে গিফট করিয়া লইইই ।

১৮/০৫/২০০৪ – ৩০/১২/২০০৯

১৬.

হালখাতা

যখন এ লোকালয় ইট পোড়া শেখেনি; তারও আগে আমাদের এই অনুন্নত গ্রামদেশে হালখাতা হতো; ঋতুভেদে বহুবিধ কোলাহল তুলে । ফলে হালখাতা মানে একটা সরল খুশির সমারোহ; সামান্য শিশু থেকে বিজ্ঞ প্রৌঢ়ের কাছেও... যৌথ প্রয়োজনে পৃথক দেনা-পাওনা মেটায় নিরপেক্ষ গ্রাম সহোদর । অবিচ্ছিন্ন শিশুকুলের নানা প্রকার প্রীতি-উল্লাস দেখে পঞ্জিকা হেসে ওঠে শেষে ।

হালখাতা আজও হয় গ্রামে-গঞ্জে মহাজনের দোকানে দোকানে । কেবল কৃষককুল টিপসহিতে হালের দাম জলের দামে দিয়ে, বাড়ি ফিরে হাতের কালি ধোয় বিষণ্ন মুখে...

১৭.

ইচ্ছে ডানার গেরুয়া বসন

দশ আঙুল গড়িয়ে পড়ে যায়
পড়ে যাচ্ছে
থক থক সবুজ রক্ত ।

জল পড়ে
পাতা মরে
সারি সারি পাতার লাশ
দাহ উৎসবে মত্ত শ্মশানপাড়া ।

কে করবে মুখাগ্নি?
আগুন শলাকা নিয়ে কাঁপছে হরিশ্চন্দ্র
এমন কাঁপুনিই তো কেঁপেছিল সে রূহিদাসের
দাহকালে ।

এ কোন দাহকাল!
বৃক্ষদের চিৎকারের স্কেলে কর্পোরেট ম্যানেজার
টুকে নিচ্ছে শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধি সূচক ।

১৮.

বীর্যব্যাংক

কেউ একজন তোর গর্ভমুে ঢেলে গেছে বিষ
ফুলে ফেঁপে উঠছিস, ঋতুবন্ধ আনাড়ি কিশোরী
তোর গর্ভে ঢুকে গেছে ফুসলিয়ে একটা শিরীষ
তার ডালপালা নিয়ে ফুঁসে ওঠে বাহক শরীর
গর্ভপাত, জ্বর, ফের বর্জ্য, ধাতু সবুজ জঙ্ঘায়

বহুবলভের বলমে ফুটপাতে বধির শর্বরী

মালবাহী যান, বীর্যপাত্র ভেঙে কোথায় ছড়াবি?
ঘর নেই তোর, তুই শুধু রন্ধ্র, আনন্দ-গহ্বর
নিশিকন্যা, দিনে প্রস্তর নিক্ষেপ রাত্রিতে আবীর
ক্লেদ ও কলুষ জমে, পুরুষের বিষে স্ফীতোদর

তোর গর্ভকান্না শুনবে না কেউ, তুই ভ্রাম্যমাণ বীর্যব্যাংক
তোর দিকে তাক করা সামাজিক অস্ত্র, ধর্মযন্ত্র
পাদ্রি ও পুরুত আর ধর্ষকামী পুরুষের অগ্নিবাহী ট্যাংক!

১৯.
গোড়ান বাজার

কিছু ধুলা খাই, কলার হলুদ ছোলায় পিছলা খাই
রাস্তার দুধারে নানারকম সবজি সাজিয়ে বসে আছে
চাকুয়ালা ব্যবসায়ী; রেস্টুরেন্টের সিঙ্গারার আলুতে
মিশে যায় পাজেরোর দ্রুতগতি চাকায় প্রাণ পাওয়া
কণা কণা বালির বহর
মাছের সাজিতে সমপরিমান মাছির আওয়াজ নেই
আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে ফরমালিন শেখায় এডাপ্টটেশন ।
নিম্নবর্গের মেয়েরা জড়তাহীন
রাস্তায় উড়ায় সুখ, স্বপ্ন, বাসনার সাদা সাদা পেজা পেজা তুলা
হারিয়ে যাওয়া তাছলিমা
অচেনা মুখের আদলে নানাভাবে ফুটে থাকে
তার দেহের ভাজ; ভঙ্গিমা–
অন্যের শরীরে রূপ পায় ।
জনাধিক্যে ধাক্কা খায় কাঁধ
ছিড়ে যায় একমুখিনতার রশি
তাছলিমাই ফের ফিরে আসে
রক্তে তার শরীরের আস্বাদন ফুরায় না

সখি লো, খাইয়্যা বুকের হাড়
হইলি পাষাণ পাহাড়
তোকে ছুঁই না, ছোয়ার বাসনায়
হারাইছি রাস্তা গোলকধাঁধায়...
এই গোড়ান বাজার, বাজারের সকল নিয়ম
নীতিসুদ্ধ ধারণ করে মেলে ধরে আছে তার বুক
ভোগের ধর্ম মেনে ঘেরাটোপের মানুষ
পাখির ডানায়, বৃক্ষে, পত্র-পলবে
অনাবাদী মাঠে রোপন করছে অসুখ ।

২০.
বৃষ্টি

যে গান শুরু হলো মেঘ থেকে, আজ এই সন্ধ্যা মুছে যাক
তার অজস্র ফোঁটায় ।

আর এখন শহরে বৃষ্টি হচ্ছে ।
কোথাও বৃষ্টি হলে সারা পৃথিবীর সব ভিজে যায়;
মৃত সৈনিকের কবর থেকে মহড়াফেরত সেপাইয়ের হেলমেট
প্রেমিকার রুমাল থেকে প্রেমিকের ছন্নছাড়া দিন
কিছুই থাকে না বাকি, প্রাণান্ত চেষ্টায় যে জলাশয় কোনদিন

ভেজাতে পারে না তার তীরবর্তী ঘাস, ঝোপঝাড়
সে-সবও ভিজে যায় বৃষ্টির অনায়াস ভূমিকায়

দ্যাখো, ভেজা পথ পায়ে আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মুছে যাচ্ছে
গোধূলিপীড়িত একটি মানুষ ।

হয়তো তার অভ্যন্তর বৃষ্টিতে ভেজেনি এখনো ।
এ-রকম গানের ভেতর নিঃসঙ্গ, টলোমলো, অপসৃত হতে পারে কেউ!

সারা পৃথিবী এখন ভিজে যাচ্ছে ভারাক্রান্ত মেঘের বার্তায়
তবু গোধূলিলাঞ্ছিত কেউ এই গান উপেক্ষা করে চলে যায়
নিজস্ব ডেরায় ।

২১.
‘আমি’ না ‘তুমি’

যে ফুল, তার ফল হওয়ার প্রলোভনকে
নস্যাত করতে পেরেছে–
সে-ই হতে পেরেছে ফুল;
যেমন, লালরক্ত গোলাপ তার ফল হওয়ার প্রলোভনকে নস্যাৎ করেছে!

আবার
যে ফল, তার ফুলের মহিমাকে
ম্লান করতে পেরেছে–
সে-ই হতে পেরেছে ফল;
যেমন, কালোরক্ত জাম তার ফুলের মহিমাকে ম্লান করেছে!

...এভাবে ‘আমি’ থাকলে ‘তুমি’ বাঁচো না
‘তুমি’ থাকলে ‘আমি’–

তাহলে, কে বাঁচবে–
‘আমি’ না ‘তুমি’...?

মাসুদুল হক

.....

সমুদ্রের স্বপ্ন

আমাদের ছোটখাটো হিংসার সরু খালে
ঝিনুক, শামুক, পুঁটি
আর চিংড়ি-চালের
কতো ক্ষোভ আছে মিশে!

শিং, কই, মাগুরের কাঁটা
স্নায়ুহীন মস্তিষ্কে বসিয়ে কেউ কেউ
কাদায় লাফায় অন্তঃস্রোতের মানসাঙ্কে

আর কেউ রাঘব বোয়ালের হা-নিয়ে
গিলে খেতে চায় ভাবনার সময়
কেউ কেউ উড়ুক্কু মাছের মতো
লাফিয়ে ফের আসে এইখানে
আমাদের এই ছোটোখাটো হিংসার সরু খালে

নোনাজল নেই এইখানে
মিষ্টি জলের অর্বাচীন এই আমরা
জলজের মুখোশে– হিংসার সরু খালে
সমুদ্রের স্বপ্ন নিয়ে আছি বেঁচে ।

তাতে কিছু যায় আসে না ।